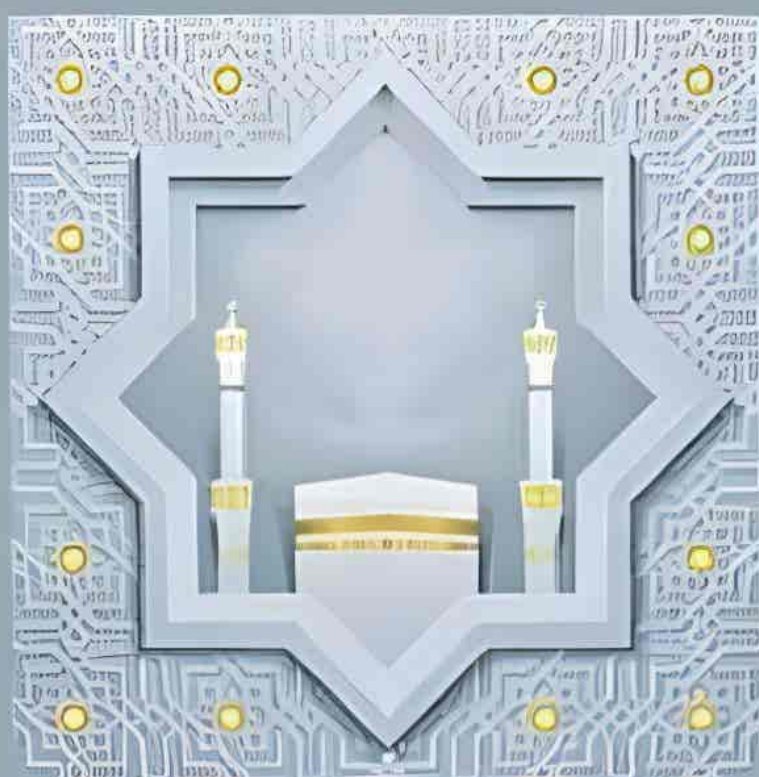


সহীহ হাদীসের আলোকে
হানাফীদের নামায



মাওলানা মুফতী তারেকুজ্জামান



দারুল কুরআন

সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামায

শেখুল ইসলাম
PDF

রচনায়

মাওলানা মুফতী তারেকুজ্জামান

শাইখুল হাদীস, হামিউস সুন্নাহ কাসেমুল উলূম, নোয়াখালী
সাবেক মুফতী ও মুহাদ্দিস, শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা।

https://t.me/islaMic_fdf



দারুল কুরআন

https://t.me/islaMic_fdf

ইসলামিক বিভিন্ন
ধরনের পিডিএফ
পেতে জয়েন হোন

https://t.me/islaMic_fdf

https://t.me/islaMic_fdf

সহীহ হাদীসের আলোকে
হানাফীদের নামায

রচনা
মুফতী তারেকুজ্জামান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবুল হাশেম
দারুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং
মুহাররম, ১৪৪০ হি.

[সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

বর্ণবিন্যাস
আজাদ কম্পিউটার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল- আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : চারশত চল্লিশ টাকা

https://t.me/islaMic_fdf

শাইখুল আরব ওয়াল আযম মাও. হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর
অন্যতম খলীফা, উপমহাদেশের সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব, হাটহাজারী
মাদরাসার মহাপরিচালক, শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফী
দামাত বারাকাতুহুম এর

অভিমত ও দুআ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد

যেদিন থেকে হকের যাত্রা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই
বাতিলের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছে। যেখানে হকের
আওয়ায সেখানেই বাতিলের অশুভ আনাগোনা লক্ষ্য করা
গিয়েছে। যুগযুগ ধরে হক-বাতিলের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব এভাবে
ধারাবাহিক চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারি থাকবে।

হক সর্বদা একই লেবাসে একই ধারায় থেকেছে যদরুন
তাদেরকে চিনতে কষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে বাতিল এসেছে বিভিন্ন
সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে; কখনো শত্রু সেজে কখনো বন্ধু
বেশে কখনো প্রকাশ্যে আর কখনো অপ্রকাশ্যে, যদরুন
তাদেরকে চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু
স্বয়ং নিজেই এ দীন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন তাই তিনি
হক্কানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে ইসলামের লেবাসধারী বাতিল
সম্প্রদায়ের মুখোশ সবার সামনে উন্মোচন করে দেন।

বর্তমান সময়ে ইসলামের লেবাসধারী ভ্রান্ত দলগুলোর মধ্যে
থেকে ‘আহলে হাদীস’ নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টি
উল্লেখযোগ্য। এরা বুখারী, মুসলিমের সহীহ হাদীস মানার মিষ্টি
বুলি আওড়িয়ে সাধারণ মানুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্তির
বেড়াজালে আবদ্ধ করছে। সময়ের সাথে সাথে এদের সীমালঙ্ঘন
ও বেয়াদবি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাদের মতালম্বী ছাড়া অন্য
সকল মুসলমানকে না-হকভাবে গোমরাহ ও জাহান্নামী বলে

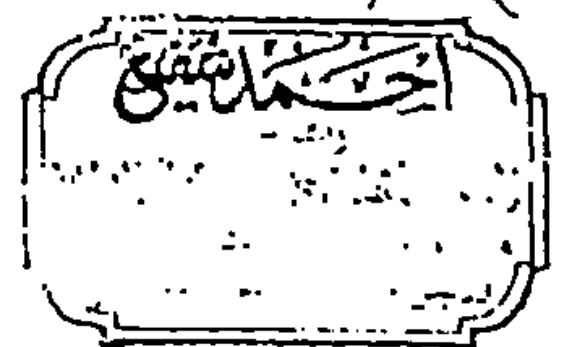
অপপ্রচার করছে। আমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের মতালম্বী বেশী হওয়ায় তারা হানাফী মাযহাবকে ভ্রান্ত এবং এর অনুসারীদেরকে মুশরিক ও গোমরাহ বলে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি হানাফী মাযহাবের অনেক আমলকে ভিত্তিহীন ও হাদীস বহির্ভূত বলে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ হানাফী মাযহাবের সবগুলো আমল ও মাসআলা কুরআন-সুন্নাহ ও মযবুত দলীল দ্বারা প্রমানিত, যার প্রামাণ্যতা নিয়ে দীর্ঘ তের শতাব্দি পর্যন্ত কোনো বিতর্ক বা অভিযোগ ছিলো না। বিষয়টি সম্বন্ধে আম জনসাধারণ অজ্ঞ হওয়ায় এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় দলীলভিত্তিক একটি বইয়ের দরকার ছিল, যা তাদের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো দূর করে হানাফী মাযহাবের আমলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আলহামদুলিল্লাহ! বিষয়টি নিয়ে আমার আযীয, তরুণ গবেষক ও আলেম মাও. তারেকুজ্জামান দীর্ঘ তিন বছর যাবত গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে ‘সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামায’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটি দলীলভিত্তিক ও উদ্ধৃতিনির্ভর হওয়ায় সাধারণ লোকদের পাশাপাশি অনুসন্ধানী আলেম উলামা ও তালেবে ইলমদেরও ফায়েদা হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন, আমীন!

আহমদ সফি

২০২২ ২/৭ ২০২২



উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দীন,
দারুল উলূম হাটহাজারীর স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস আল্লামা জুনাইদ
বাবুনগরী হাফিযাহুলাহ-এর

অভিমত ও দুআ

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ!

ইসলামে ঈমানের পর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায। একজন মুসলমানের মুসলমানিত্বের সবচে বড় পরিচয় হলো নামায। শরীয়তে নামাযের অত্যাধিক গুরুত্ব থাকায় এর শাখাগত বিভিন্ন বিধিবিধানও অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। আর সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সেসব বিধিবিধানগুলো যথাযথভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। যার ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরাম নামাযের বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফিকহের কিতাবগুলো মূলত কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। শরীয়তের সব ধরনের দলীলাদি সামনে রেখেই ফিকহের সংকলন হয়েছে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব কিতাবগুলোতে শুধু মাসআলার বর্ণনা থাকে, এর মূল উৎস হাদীস বা আসারের উল্লেখ থাকে না। এর মূল কারণ ছিলো, সাধারণ মানুষের শুধু সহজ-সরল মাসআলার দরকার হয়, তাদের বিস্তারিত দলীল ও প্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। তারা ফুকাহায়ে কিরামকে দীনের ক্ষেত্রে আস্থাশীল ও নির্ভরযোগ্য মনে করায় পূর্বে এর তেমন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি।

কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক বের হয়েছে, যারা প্রতিটি কথায় শুধু সহীহ হাদীস খোঁজে; যদিও তাদের অধিকাংশই শরীয়তের মাসআলা নির্ণয়ের মূলনীতি কী সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তারা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় যে, নামাযের এ পদ্ধতি ভুল, এ মাসআলা ভুয়া ইত্যাদি। বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বেশী হওয়ায় তাদের অধিকাংশ বিদ্বেষ ও আক্রমণ হানাফী মাযহাবের উপর। বিভিন্ন লিফলেট ও বয়ানে তারা আমাদের নামাযের পদ্ধতি নিয়ে ব্যঙ্গ করে. উপহাস করে এবং এসব পদ্ধতিকে ভুয়া বলে দাবি করে। অথচ হানাফী মাযহাবের নিয়মে পঠিত নামাযের পদ্ধতি অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ কুরআন, হাদীস ও আসারের

আলোকে গবেষণা করে বের করেছেন। এর একটিও ভুয়া ও বানোয়াট নয়; যেমনটি দাবি করছে এক শ্রেণীর মানুষ। মাযহাবের মূল গ্রন্থাদিতে এসবের দলীল ও প্রমাণাদি সব বিদ্যমান আছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাই প্রয়োজন ছিলো, সুন্দরভাবে সেসব দলীলগুলোকে প্রকাশ করে আমাদের নামাযের পদ্ধতির সত্যতা প্রমাণ করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী লোকদেরকে দাঁতভাঙ্গা উপযুক্ত জবাব দেয়া।

আল হামদুলিল্লাহ! শুনে অনেক খুশী হলাম যে, আমার আযীয ও তরুণ আলেমে দীন মাওলানা তারেকুজ্জামান “সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামায” নামে একটি বই লিখেছেন। এতে মযবুত ও সুদৃঢ় প্রমাণের আলোকে হানাফী মাযহাবের নামাযের মাসআলাগুলোকে সুবিন্যস্তাকারে ফুটিয়ে তুলার হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাথে হাদীসের রেফারেন্স এবং নিখুঁতভাবে তার শুদ্ধতা যাচাই করে প্রতিটি হাদীসের মানও নির্ণয় করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে বইটি যুগের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মিটাতে সক্ষম হবে। আমি আশা করি, বইটি পড়ে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তিগুলো কেটে যাবে এবং সাথেসাথে আলেমদের জন্যও এটা উপকারী বলে সাব্যস্ত হবে। আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এ বই, তার লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এদ্বারা মুসলিম সমাজের প্রভূত কল্যাণ দান করুন।

জুনাইদ বাবুনগরী

৪২২৫৮- জুনাইদ
বাবুনগরী
৭/৭/১৪

সূচীপত্র

দু'টি কথা ও কিছু ব্যথা	০৯
ভূমিকা	১৯

প্রথম অধ্যায়

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীদের পরিচয়	২৩
লা-মাযহাবী দলের উত্থানের প্রেক্ষাপট	২৬
সত্যিকার আহলে হাদীস কারা?	২৯
লা-মাযহাবীদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা	৩২
ব্রিটিশদের সাথে লা-মাযহাবীদের সখ্যতা ও সম্পর্ক	৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ লিফলেটটির কপি	৪১
উত্তরদান পূর্বক ভূমিকা	৪৮
০১ম পাঠ: গোসলের ফরয সংক্রান্ত	৫৪
০২য় পাঠ: তায়াম্মুমের ফরয সংক্রান্ত	৬৩
০৩য় পাঠ: অযুর ফরযের সংখ্যা সংক্রান্ত	৭০
০৪র্থ পাঠ: গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত	৭১
০৫ম পাঠ: আযানের উত্তরের বাক্য সংক্রান্ত	৮৩
০৬ষ্ঠ পাঠ: 'আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' এর জবাব সংক্রান্ত	৮৬
০৭ম পাঠ: নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা সংক্রান্ত	৯২
০৮ম পাঠ: আযান, ইকামাতের শব্দসংখ্যা সংক্রান্ত	৯৯
০৯ম পাঠ: আযান পরবর্তী দুআ সংক্রান্ত	১১৯
১০ম পাঠ: যোহর ও আসরের সময় সংক্রান্ত	১২৫
১১তম পাঠ: জায়নামাযে দাঁড়ানোর দুআ সংক্রান্ত	১৩৮
১২তম পাঠ: উচ্চারণ করে নামাযের নিয়ত করা সংক্রান্ত	১৪২
১৩তম পাঠ: নামাযে হাত বাঁধার স্থান নির্ণয় সংক্রান্ত	১৪৩
১৪তম পাঠ: 'সুবহানাকা আল্লাহুমা.....' সানা পড়া সংক্রান্ত	১৫৬
১৫তম পাঠ: ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া সংক্রান্ত	১৭৩
১৬তম পাঠ: এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত	২২১
১৭তম পাঠ: দু'সিজদার মাঝে দুআর আবশ্যকীয়তা সংক্রান্ত	২২৫
১৮তম পাঠ: তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও দু'হাত উত্তোলন সংক্রান্ত	২৩২
১৯তম পাঠ: জামাতের সময় পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো সংক্রান্ত	২৭৭

২০তম পাঠ: সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখা সংক্রান্ত	২৮৪
২১তম পাঠ: সিজদা শেষে না বসে মাটিতে ভর না দিয়ে সরাসরি দাঁড়ানো সংক্রান্ত	২৯৫
২২তম পাঠ: নামাযের প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে না বসে দাঁড়ানো সংক্রান্ত	৩১৩
২৩তম পাঠ: সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা সংক্রান্ত	৩১৪
২৪তম পাঠ: তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা সংক্রান্ত	৩৩১
২৫তম পাঠ: দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা সংক্রান্ত	৩৩৭
২৬তম পাঠ: তিন রাকআত বিতর নামাযে দুই বৈঠক করা সংক্রান্ত	৩৪৫
২৭তম পাঠ: বিতরের নামাযে ‘আল্লাহুমা ইন্ন্য নাস্তাইনুকা.....’ দুআ কুনূতটি পড়া সংক্রান্ত	৩৫৫
২৮তম পাঠ: নামায শেষে ইমামের মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসা সংক্রান্ত	৩৬৫
২৯তম পাঠ: নামাযের মধ্যে বিভিন্ন দিকে আড়চোখে তাকানো সংক্রান্ত	৩৭১
৩০তম পাঠ: ফরয নামায বাদ সম্মিলিত মুনাজাত করা সংক্রান্ত	৩৭৮
৩১তম পাঠ: নামাযে ইমামের ভুল হলে ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা ও হাততালি দেয়া সংক্রান্ত	৩৮৮
৩২তম পাঠ: নামাযে দুইবার সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সাহ্ সিজদা করা সংক্রান্ত	৩৯১
৩৩তম পাঠ: জুমআর খুতবা চলাকালীন মসজিদে এলে নামায না পড়া সংক্রান্ত	৩৯৭
৩৪তম পাঠ: জুমআর নামাযে তিন খুতবা দেয়া সংক্রান্ত	৪০৭
৩৫তম পাঠ: জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সংক্রান্ত	৪১০
৩৬তম পাঠ: তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা সংক্রান্ত	৪১৮
৩৭তম পাঠ: তারাবীহ নামায তাড়াতাড়ি পড়া, কুরআন খতম করা ও বিশেষ দুআ পড়া সংক্রান্ত	৪২৭
৩৮তম পাঠ: রমযানে রোযার নিয়ত ও ইফতারের দুআ সংক্রান্ত	৪৩৩
৩৯তম পাঠ: ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দেয়া সংক্রান্ত	৪৩৭
৪০তম পাঠ: আধা সা’ গম দিয়ে সাদকাতুল ফিতর দেয়া সংক্রান্ত	৪৪৯
৪১তম পাঠ: প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে লম্বা টানে তাকবীর বলে দাঁড়ানো সংক্রান্ত	৪৬৫
৪২তম পাঠ: দু’জন মিলে জামাত করাকালীন অন্য কেউ এলে ইমামের করণীয় সংক্রান্ত	৪৬৯

দু'টি কথা ও কিছু ব্যথা

২০১২ সাল। তখন আমি বাংলাদেশের স্বনামধন্য নবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়া, ঢাকা'-এর ইফতা ও গবেষণা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। একদিন বসুন্ধরা মাদরাসা থেকে মিশকাত পড়ুয়া একজন ছাত্রভাই এসে আমার হাতে একটি লিফলেট দিয়ে বললো দেখুন, আহলে হাদীসরা এগুলো প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের কী বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলার অপচেষ্টা করছে! লিফলেটটি দেখে আমি হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মিথ্যা অপবাদ, ভুল উদ্ধৃতি, বানোয়াট দাবি ও বাংলা লেখার অবস্থা দেখে মনে হলো না যে, এটা ন্যায়-নীতিবান বিজ্ঞ কোনো আলেমের লেখা। ভাবলাম হয়তো এ নিরেট কোনো মূর্খ, যে দু' চারটি হাদীস শুনেই মুহাদ্দিস হওয়ার দুঃসাহস দেখায় কিংবা জ্ঞানপাপী পুরাদস্তুর শয়তান, যে সত্য জেনেও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির হীনলক্ষ্যে মিথ্যার পথে পা বাড়ায়।

ইচ্ছা ছিলো না এরকম মিথ্যাপূর্ণ লিফলেটের জবাব লিখার। একে তো অল্প কিছুদিন পরেই ছিলো প্রথম সাময়িকী পরীক্ষা, যদ্বরূন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফতোয়া, তামরীনের কাজের তাগিদ ছিলো একটু বেশীই। তদুপরি লিফলেটটি এত ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর ছিলো যে, এর জন্য সময় ব্যয় করার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বৃথাই সময় নষ্ট হবে বলে ভাবছিলাম।

তাই যখন আমি এ কাজের প্রতি স্বীয় অনাগ্রহের কথা বললাম তখন বসুন্ধরার সে ছাত্রভাই বললেন, ভাই দেখেন, আসলে বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কেননা, এ লিফলেটের মূললক্ষ্য আলেম ও সচেতন সমাজ নয়; বরং এদ্বারা সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য। আমি ভেবে দেখলাম কথা যথার্থ। কারণ, লিফলেটে কুরআন, সহীহ হাদীস, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা দেয়া আছে, যা একজন সাধারণ মুসলামানকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও এ বিশাল কাজ শেষপর্যন্ত স্বীয় কাঁধে তুলে নিলাম। যদিও আমি এর উপযোগী ছিলাম না, মনও এর জন্য প্রস্তুত ছিলো না। বলা যায়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই এ দায়িত্ব নিতে হলো।

বড় কষ্ট লাগে যখন ভাবি আমাদের কী করণীয় ছিলো আর কী করছি? মুসলিম উম্মাহ আজ শতাব্দিভক্ত। একের পর একটি, দলের পর দল, ফেরকার পর ফেরকা দিনদিন ভারী হচ্ছে এ ফেরকাবন্দি। বাড়ছেই শুধু এ দলাদলি ও নিত্যনতুন ফন্দি। ‘আমরা হক ওরা বাতিল’ শ্লোগান ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে। সময়ের জোর দাবি ছিলো, মুসলিম উম্মাহর এক পতাকাতলে অবস্থান ও সমগ্র কুফুরী ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে এক শ্লোগান। আজ যখন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইসলামবিরোধী আওয়ায, মুসলিম নিধনে সব তাগুতের একই মনোভাব, গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, গুম, বহিষ্কারাদেশ, অত্যাচার ও যুলুমের স্টীমরোলার যখন শুধু মুসলমানদেরই উপর তখন ইসলামের লেবাসধারী উগ্রপন্থি একটি দল সাধারণ মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে অবিচ্ছিন্নধারায় চলে আসা আমল ও পদ্ধতিগুলোর বিরুদ্ধে এভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, আপনাদের এ পদ্ধতি ভুল ও হাদীস বহির্ভূত। আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল। যেখানে একজন সত্যিকার মুসলিম ও সচেতন মুমিন হিসেবে সকলের দায়িত্ব ছিলো সব মুসলিমকে এক ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করা সেখানে জাতিকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার অপচেষ্টা করা কীসের ইঙ্গিত বহন করে?

আমরা মনেপ্রাণে কখনো এটা চাই না যে, কথিত আহলে হাদীসদের অবতরণকৃত বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাই বা এর পিছনে আমাদের সময়গুলো নষ্ট করি। কেননা, যে আমল ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন তরীকায় ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, গবেষণার নামে হাদীস না বুঝে সেসব পদ্ধতি ও আমল বাতিল বলার দুঃসাহস দেখানো প্রকারান্তরে ইসলাম এবং পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুসলিম উম্মাহকে বাতিল ও ভ্রান্ত বলারই অপপ্রয়াস, যা বিবেকবান মাত্রই মানতে পারে না।

এটা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয় যে, এ সম্বন্ধে কলমও ধরতে মন চায় না; যেহেতু আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন এ ভিন্ন অন্য কোনো খিদমত তথা মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্য, ঐতিহ্য, ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। আবার এ ব্যাপারে চুপ থাকারও অবকাশ খুঁজে পাই না; কারণ, এতে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস, দীন ও আমল বরবাদ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই এ বিষয়ে কিছু লেখার উৎসাহ ফিরে পাই।

আমি এ কথাগুলো এজন্যই লেখলাম যে, আলেম সমাজ যেনো এটাকে তাঁদের মূল কাজ ও পরম লক্ষ্য বলে মনে না করেন। অনেক আলেম ও লেখককে দেখেছি যারা এর পিছনে পূর্ণ মেহনত ও শ্রম, পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ; এমনকি প্রায় পুরাটা জীবনই এসব মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় এবং তার জবাব ও খণ্ডন নিয়েই সময় পার করেছেন। অথচ সমাজে এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর ও ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড রয়েছে, কিন্তু তার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা খুব কমই হয়েছে। তাই আমি মনে করি, খুব বেশী প্রয়োজন না হলে এসব বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে পুরা মেধা ও শ্রমকে মুসলিম উম্মাহর বৃহৎ স্বার্থে ব্যয় করা উচিত। এ সবকিছু আমি শিখেছি ইলমী জগতের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এর শেষ জীবনের উপলব্ধি থেকে।

মুফতী আযম শফী রহ. বলেন, আমি একদিন ফজরের কিছু পূর্বে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এর কামরায় প্রবেশ করে শুনতে পেলাম তিনি বারবার এ বাক্য আবৃত্তি করছেন:

يا للأسف قد ضيعت حياتي كلها

অর্থাৎ হায় আসসোস! আমার পুরা জীবন বরবাদ করে দিলাম!

মুফতী শফী রহ. বলেন, আমি যখন দেখলাম, তিনি এ বাক্যটি বারবার আবৃত্তি করছেন তখন বললাম, হে শায়েখ, আপনি তো পুরা জীবন কুরআন-হাদীস পাঠদানেই ব্যয় করলেন। এটা যদি জীবন বরবাদের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন, যাঁরা এর পিছনে সময় ব্যয় করে যাচ্ছে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, ভাই, ইসলাম আজ সমগ্র বিশ্বে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে আর আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব মৌলিক আক্রমণকে প্রতিহত করার পরিবর্তে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রতি সমর্থন, আস্থা স্থাপন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদী উলামায়ে কিরামের সমালোচনা ও খণ্ডন নিয়ে ব্যস্ত আছি! তাহলে তুমিই বলো ভাই, এটা জীবন বরবাদের কারণ ছাড়া আর কী হতে পারে? ^(১)

১ আদ-দেওবন্দিয়া : পৃ. নং ২২ (দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, করাচী), মুকাদ্দামাতু নযীর আহমাদ কাশ্মীরি আলাল লুমহাত ইলা মা-ফী আনওয়ারিল বারী মিনায যুলমাত : ১/৫, অহদাতুল উম্মাহ : পৃ. নং ১৩

শাহ কাশ্মীরি রহ. এর জীবন সায়াহের এ উপলদ্ধিটুকু সত্যিই চিন্তা ও চেতনার ছিলো। ছিলো তা নির্মম বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ। আফসোস, পরবর্তীরা এর পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারলো না!

শাহ কাশ্মীরি রহ. এর এ উপলদ্ধি ও মন্তব্য দেখে কথিত আহলে হাদীসরা উল্লাসিত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এতে খুশী হওয়ার কিছু নেই। নাউযুবিল্লাহ! শাহ কাশ্মীরি রহ. এর এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁর অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছি; নতুবা তিনি পরবর্তীতে অবশ্যই এ মাযহাব ত্যাগ করে কোনো হক পথ অনুসরণ করতেন। মূলত তাঁর এ মন্তব্য ছিলো চরম হতাশা ও আফসোসের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, তাঁর মতে ইসলামের এ ক্রান্তিলগ্নে দলমত নির্বিশেষে সকল মুমিন ও মুসলিমের; বিশেষত বিজ্ঞ আলেম সমাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিলো, তাগুত ও কুফুরী শক্তির ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ও গৃহিত সকল ষড়যন্ত্র ও সয়লাবের বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, কিন্তু হয়েছে তার বিপরীত।

এটাও অবশ্য ইয়াহুদী-নাসারাদের ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। তারা কুকৌশলে মুসলমানদের মধ্যে আরো বেশী অনৈক্য ও অমিল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সর্বাত্মকভাবে তাদের সাহায্য করেছে। এরা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার হীন উদ্দেশ্যে জোরেশোরে প্রচার-প্রসার শুরু করলো, তোমাদের নামায সঠিক হয় না, তোমাদের ফিতরা আদায় হয় না, তোমাদের ঈমান শুদ্ধ হয় না; এভাবে প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে লাগলো। তখন বাধ্য হয়েই উলামায়ে কিরাম, যাদের মূল দায়িত্ব ছিলো কুফুরী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ মোকাবেলা করা- তাঁরাই সাধারণ মুসলমানদের ঈমান ও দীন রক্ষার তাগিদে ইসলামের লেবাসধারী এসব শিয়া, কাদিয়ানী, আহলে হাদীসদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন এবং জীবনের একটি অংশ বা সিংহভাগ এর পিছনেই ব্যয় করে ফেললেন। অথচ এসব আমল ও বিষয়াদি দীর্ঘ বারো, তেরো শতাব্দি পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছিলো। যেহেতু সবই কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, যার পিছনে নতুন করে সময় ব্যয় করার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না। শাহ কাশ্মীরি রহ. মূলত এটিই বুঝাতে চেয়েছেন এবং এ জন্য স্বীয় হতাশা ও আফসোস তুলে ধরেছেন।

শাহ কাশ্মীরি রহ. এর এ উপলদ্ধি ছিলো প্রায় শত বছর পূর্বের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ একবিংশ শতাব্দিতে ইসলাম আজ সে তুলনায় অনেক বেশী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামের লেবাসধারী এসকল ফেরকা ও দলের উপদ্রবও বেড়ে গেছে বহুগুণে। পরিস্থিতি এখন বড় বেশী নায়ুক। ইচ্ছা না থাকলেও এসব ফেরকা ও দলের মোকাবেলা করতে হচ্ছে শুধু সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের ঈমান ও দীন রক্ষার তাগিদে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

আমি এসব আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি হাত জোড় করে অনুরোধ করি, আপনারা ইসলামের নামে কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করুন। সকল শ্রম ও মেধা তাগুতের বিরুদ্ধে ব্যয় করুন। সাধারণ মানুষের মাঝে আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না। কী লাভ এতে? এসব আমল ও পদ্ধতি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরেই চলে আসছে। এগুলো সবই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আপনারা নিজেরাও তা জানেন। আপনাদের মান্যবর বড় ইমামদ্বয় ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনে কায়্যিম জাওযিয়া রহ.ও তা স্বীকার করেছেন। যথাস্থানে তার উদ্ধৃতি ও প্রমাণ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। তাই মুসলিম উম্মাহর বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এ সংঘাতের পথ পরিহার করে ঐক্যের পথে আসুন। মিলেমিশে আমরা সবাই তাগুতের বিরুদ্ধে কাজ করি এবং সকল মুসলিমকে সে পথে আহ্বান করি।

আমার ইচ্ছা ছিলো না এ বই প্রকাশিত হোক। অনেকে বলা সত্ত্বেও এর মূল পাণ্ডুলিপি বা ফটোকপি কাউকে দেইনি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখলাম এ ধরনের লিফলেটের খুব বেশী ছড়াছড়ি, যদ্বারা মানুষের অবস্থা নাজেহাল হয়ে পড়ছে তখন অনেকেই এটা প্রকাশ করার জন্য খুব অনুরোধ করলো। যাতে এ থেকে সাধারণ মুসলমানরা উপকৃত হতে পারে এবং সচেতন সমাজও এর দ্বারা লাভবান হতে পারে। তবুও বিভিন্ন কারণে এতে পুরোপুরি মনোযোগ নিবেশ করতে পারছিলাম না। অবশেষে ইফতা বিভাগের ৩য় বর্ষে অধ্যয়নকালীন শেষদিকে ‘দারুল কুরআন’ মাকতাবার সত্ত্বাধিকারী মুহতারাম মুহাম্মাদ আবুল হাশেম ভাইয়ের বারবার তাগাদায় এবং বন্ধুমহলের অনেকের উৎসাহে ছুটি ও অবসর সময়গুলো কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে এ কাজ শুরু করি।

লিফলেটের জবাব সম্বলিত এর একটি সাধারণ খসড়া পূর্বেই তৈরী করা ছিলো। তাই এতে নতুনভাবে কাজ করতে গিয়ে চিন্তা করলাম মূল খসড়ায়

হাদীসের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মান নির্ণয়সহ ব্যাপক পরিবর্তন, পরিমার্জনের পাশাপাশি বইয়ের শুরুতে আহলে হাদীস কী ও কারা, এদের উত্থান, এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযুক্ত করলে সাধারণ মানুষ এদের সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে এবং তাদের অপপ্রচার ও ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে।

মাআযাল্লাহ! আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা মুসলমানরা একে অন্যের বিরুদ্ধে এভাবে লেখালেখি করে আত্মকলহে জড়িয়ে থাকবো। কেউ ভুল করলে আমরা তো ভুল করতে পারি না। কেউ আমাদের গালি দিলে আমরা তো তাকে গালি দিতে পারি না। আমরা সবাই মিলে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে একমত হয়ে পারম্পারিক ভেদাভেদ ভুলেই তো কাজ করতে চাই। কিন্তু ওরা তো তা চায় না। আল্লাহর কসম! এ ধরনের লিফলেটের অপপ্রচারের কারণে যদি সাধারণ মুসলিমদের মাঝে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা না থাকতো তাহলে এ জাতীয় মতানৈক্যপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হয়তো কলম ধরতাম না। প্রয়োজনীয় কাজ তো আমাদের অনেক পড়ে আছে। আল্লাহর কাছে এ দুআই করি, যেনো তিনি আমাদের সবাইকে এক প্লাটফর্মে জমা হয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য কাজ করার তাওফীক দান করেন।

সবশেষে একটি কথা বলে এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি। মূলত আহলে হাদীসদের এ ফেতনারোধে দেশের বিজ্ঞ আলেম সমাজের যেমন কিছু দায়িত্ব আছে, ঠিক তেমনি সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদেরও কিছু পালনীয় কর্তব্য আছে, উভয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব ও যিম্মাদারী আদায় করলে এ ফেতনা অনেকটাই স্থিমিত হয়ে পড়বে বলে আশা করা যায়।

সুতরাং উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব হলো- মসজিদে, বয়ানে, ওয়ায-মাহফিলসহ বিভিন্ন মজলিসে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করে সাধারণ মানুষকে এ ফেতনা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়া। তবে এ আলোচনা এতো বেশী করা যাবে না, যদ্বরূন মানুষ কৌতুহলী হয়ে এর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তাদের পাতা ফাদে নিজেই ফেসে না যায়। বিশেষত তাদের সামনে এ পার্থক্য পরিষ্কার করে তুলে ধরা যে, কথিত এ আহলে হাদীসদের উত্থান এক দেড়শ বছর পূর্বের, যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাযুগের ব্যবধান প্রায় বারো-তেরোশ বছরের। বিধায় তাদের প্রমাণাদি,

বুঝা ও মতাদর্শ কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের বুঝা ও কর্মপন্থা থেকে অনেক দূরে হবে। আর এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমরা যে পথ ও মত অনুসরণ করে আসছি, তা সাহাবা ও তাবেরীয়ন যুগ থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চলে আসছে। আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে লক্ষ-কোটি আওলিয়া, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং অসংখ্য উম্মাত এ মত ও পথেই চলেছেন। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তিত বা ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর এ কথাও বলে দেয়া যে, কথিত এ আহলে হাদীসরা যদি সাধারণ মানুষকে বলে যে, তোমাদের নামায, রোযা, ইবাদাত সব ভুল, আমরাই একমাত্র সঠিকভাবে ইবাদাত করি তাই আমাদের পথে আসো তখন সাধারণ মানুষের উচিত এ কথা বলে দেয়া যে, ভাই, আপনি যদি আলেম হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কোনো আলেমের কাছে চলুন এবং আপনারা পরস্পরে আলোচনা করে প্রমাণ করুন যে, আপনার দাবি সঠিক। আর যদি আপনি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সাথে এ বিষয়ে আমার কোনো কথা নেই। কেননা, আমি যেমন কুরআন-হাদীস বুঝি না তেমনি আপনিও তা বোঝেন না। সুতরাং এরকম না বুঝা একটি বিষয়ে আমাদের নাক না গলানো উচিত।

আর সাধারণ মানুষের দায়িত্ব হলো, আহলে হাদীসদের অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডায় কান না দিয়ে নিজের পথে চলা। তারপরও যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয় তাহলে কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট তা উত্থাপন করে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করে নিবে। এভাবে সবাই স্ব স্ব দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করলে এ ফেতনা অচিরেই তার কার্যকারিতা হারাবে ইনশাআল্লাহ।

অনেক সাধারণ মানুষ আহলে হাদীস কর্তৃক হারামাইন তথা মক্কা-মদীনার নামাযের পদ্ধতি প্রচারে বেশী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ভাবে যে, মক্কা-মদীনা তো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, বিধায় এ স্থানদ্বয়ের আমল ও কর্মপন্থাই সঠিক হবে। কেননা, এখান থেকেই ইসলাম প্রচার-প্রসার হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাসিক মদীনার কিছু প্রশ্নোত্তর লিখতে গিয়ে প্রায় এমনই একটি প্রশ্ন পেয়েছিলাম।

মূলত ইসলামী ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায়ই এ জাতীয় ভাবনার সৃষ্টি হয়। ভালোভাবে যারা ইসলামী ইতিহাস পড়েছেন তারা ভালো করেই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং প্রথম যামানার সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম গত হওয়ার পর সাহাবাযুগের শেষভাগে এসে ইলম

চর্চা ও আমল শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; বরং তা মক্কা, মদীনা ও আরবের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিশেষত ইরাকের কূফা নগরী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে গড়া একান্ত বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ছোঁয়া ও শিক্ষা পেয়ে সে নগরী একপর্যায়ে ইলমী কাননের জীবন্ত উপত্যকা হয়ে উঠেছিলো এবং ইলমের বীজ রোপনের এ উর্বরক্ষেত্র দেখে সত্তরজন বদরী সাহাবীসহ প্রায় পনেরো শতাধিক সাহাবী এখানে আগমন করে এ নগরীকে ইলম ও আমলের সুবাসে সুবাসিত করে তোলেন। আর চতুর্থ খলীফা আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মদীনা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে তিনি ইলম ও আমলে ভরা এ কূফা নগরীকেই বেছে নেন। পরবর্তীতে এখানে ইলমের চর্চা এতো বেশী হয় যে, তা ইসলামী দুনিয়ার অন্যান্য তামাম শহরকে পিছে ফেলে দিয়েছিলো। প্রত্যেক অলিতে গলিতে শুধু 'হাদাসানা' ও 'ক্বালা রাসূলুল্লাহ' এর চর্চা ও আলোচনা শোনা যেতো। কোথাও এক মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনার জন্য বসে গেছেন তো তার সামনে নতজানু হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বসে গেছে। কোথাও এক ফকীহ হাদীসের ব্যাখ্যা ও শরীয়াহ'র বিধিবিধান আলোচনা শুরু করেছেন তো তাঁর চারপাশ ঘিরে অগণিত ছাত্র বসে গেছে। পুরা শহর সর্বদা ইলমী আলোচনায় সরগরম থাকতো। ইলমপিপাসু ছাত্রদের পদভারে কূফার যমীন গমগম করতো।

ইমাম বুখারী রহ. এর একটি কথা থেকেই এর অনুমান করা যায়। তিনি বলেন:

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات وأقمت

بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. (১)

অর্থাৎ ইলম ও হাদীস অন্বেষণে আমি সিরিয়া, মিসর ও আরব উপদ্বীপে দু'বার এবং বসরায় চারবার গিয়েছি। মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেছি ছয় বছর। আর মুহাদ্দিসদের সাথে কূফা ও বাগদাদ নগরীতে যে আমি কতোবার গিয়েছি তার কোনো ইয়াত্তা নেই!

১ ফাতহুল বারী (হাদইয়ুস সারী) : ১/৪৭৮ শাইখ বিন বায কর্তৃক তাহকীককৃত (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

মোটকথা পরবর্তীতে কূফা ও বাগদাদ নগরী হয়ে উঠেছিলো ইলম ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। এরপর বসরা, দামেশক, বুখারা, সমরকন্দ, নিশাপুর, রায় ও কায়রোসহ বিভিন্ন অনারবী শহরগুলো হয়ে উঠলো কুরআন-হাদীস ও ফিকহ চর্চার মৃগোয়াক্ষেত্র। এভাবেই ইলম চর্চার প্রাণকেন্দ্র মদীনা থেকে কূফা, বাগদাদ হয়ে বসরা, দামেশক, কায়রো, কডোভাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। আরবের ইলম অনারবরাই বেশী গ্রহণ করেছে।

পাঠক, আপনি শুনে অবাক হবেন যে, ইসলামী ইতিহাসে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বসহ বড় বড় মনিষীগণের প্রায় সবাই অনারবই ছিলেন। হাদীসজগতে ইমাম আহমাদ রহ., বুখারী রহ., মুসলিম রহ., তিরমিযী রহ., আবু দাউদ রহ., নাসায়ী রহ., ইবনে মাজাহ রহ., তাহাবী, রহ.-সহ প্রায় সিংহভাগ মুহাদ্দিসগণ, এভাবে ফিকহের জগতে ইমাম মালেক রহ. ও শাফেয়ী রহ. ছাড়া প্রায় বাকী সব ফকীহ তথা ইমাম আবু হানীফা রহ., হাসান বসরী রহ., সুফইয়ান সাওরী রহ., আওয়ায়ী রহ., আহমাদ রহ.-সহ সকল ফকীহ, এভাবে তাফসীর জগতে ইমাম ইবনে কাসীর রহ., রায়ী রহ., যামাখশরী রহ., তাবারী রহ., বাইযাবী রহ.-সহ জগদ্বিখ্যাত প্রায় সকল মুফাসসিরীন এরা কেউ আরাবী ছিলেন না, সবাই ছিলেন অনারবী। সাহাবা ও তাবীয়ীন যুগ পরবর্তী হাতে গোনা কয়েক জন ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর তেমন কাউকে আরবগর্ভ মুসলিম উম্মাহর খেদমতের জন্য জন্ম দিতে পারেনি। তাই যারা বর্তমান মক্কা-মদীনার এ নামাযের পদ্ধতি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন আমি মনে করি, তাদের জন্য এ ইতিহাসটুকু জানার প্রয়োজন ছিলো।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত যে, মক্কা-মদীনায় বর্তমান নামাযের পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নধারায় চলে আসা পদ্ধতি হিসেবে চালু নয়; বরং এখানে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা জড়িত।

বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে যখন তুর্কী ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা পতনের দ্বারপাশে তখন ইয়াহুদী-নাসারাদের মদদপুষ্ট দিকভ্রান্ত একটি বিদ্রোহী দল আরবকে তুর্কী খেলাফতের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে আন্দোলন শুরু করে এবং পরবর্তীতে কুফুরী শক্তির সাহায্যে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

একপর্যায়ে ব্রিটিশ ও তাগুতের সাহায্য নিয়ে আরবকে খেলাফত থেকে বের করে নেয়। আর এ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সাউদের নামে আরবের নতুন নামকরণ করা হয় সাউদী আরব অর্থাৎ সাউদ কর্তৃক মুক্ত আরব। আর তখন থেকেই এ বর্তমান সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম বাদশাহ সাউদ মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন ইসলামী স্থাপনা ও কাজে সংস্কারের নামে আমূল পরিবর্তন শুরু করে। সে সংস্কার পরিকল্পনারই একটি হলো, মক্কা-মদীনায় স্বীয় মতালম্বী ও অনুগত ইমাম নিয়োগদান। কাবা শরীফে প্রায় সহস্র বছর ধরে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে চার ইমামের ভিন্ন ভিন্ন ইমামতিতে নামায পড়ার ব্যবস্থা ছিলো, কিন্তু সাউদ বাদশাহ তা বন্ধ করে স্বীয় মতপন্থী সালাফী ইমাম নিয়োগদান করে এবং সে ধারা আজও বিদ্যমান।

এ কথিত আহলে হাদীসদের ইনসাফহীনতার নগ্ন একটি দৃষ্টান্ত হলো, মক্কা-মদীনার নামাযের পদ্ধতি প্রচার করে মানুষকে স্বীয় মতাদর্শের প্রতি আস্থান করলেও তথায় তারা বীহঁর নামায যে বিশ রাকআত পড়া হয় তা কিন্তু সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। অথচ বর্তমান নামাযের এ পদ্ধতি মক্কা-মদীনায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালু হয়েছে সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে। পক্ষান্তরে বিশ রাকআত তারা বীহঁর নামায নিরবচ্ছিন্নধারায় আজ চৌদ্দ শতাধিক বছর যাবত চালু রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তারা চুপ থাকে। কতো বড় জঘণ্য চাতুরতা!

আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেনো তিনি তাদের হেদায়াত দান করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে ইসলামবিরোধী সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন এবং এ বইটিকে সবার জন্য উপকারী করেন।

নিবেদান্তে

বান্দা তারেকুজ্জামান

২৭/০৩/২০১৪ ইং

ভূমিকা

الحمد لله الذى هدانا إلى الإسلام. لولا هدانا ما اهتدينا. ثم جعلنا من الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة الذين يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم "ما أنا عليه وأصحابي" ولم ينقذنا في إحدى من اثنين وسبعين فرقة ضالة بفضله الكريم وعطفه العميم. والصلاة والسلام على حبيبه المجتبي ونبيه المصطفى سيد المرسلين محمد الأمين الذى بعث إلى كافة الجن والإنس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويرشداهم من الباطل إلى الحق المبين وعلى أله الطيبين وأصحابه المرضيين عنهم أجمعين.

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার, যার দয়া ও অনুগ্রহ সর্বাত্মকভাবে সার্বক্ষণিক আমাদের বেষ্টন করে আছে। যার অশেষ মেহেরবানী আমাদেরকে সঠিক ও সরল পথ বাতলিয়েছে। অসংখ্য বাতিল পথ ও মত থেকে রক্ষা করে সঠিক পথের অনুসারী একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। যে পথের অভিযাত্রী ছিলেন সকল সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ লক্ষ-কোটি মুহাদিসীন, ফুকাহা ও মুফাসসিরীন। অসংখ্য রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের উপর, যাকে এ নশ্বর ধরাতে প্রেরণ করা হয়েছিলো বিশ্বমানবতার দূত হিসেবে, মিথ্যা ও অন্ধকারের দেয়াল ভেঙে সত্য ও আলোর পথ দেখাবার রাহবার রূপে। ‘গারে হেরা’ থেকে উৎসারিত সে আলোর বন্যায় ভেসে গেলো সকল অন্ধকার ও অমানিশা, দূর হলো মুক্তিপাগল মানুষের সব নিরাশা ও হতাশা। সত্য-ন্যায়ের জ্যোতির্মান সে ঝাণ্ডা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে পরবর্তীতে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ যুগ যুগ ধরে হকপন্থী একমাত্র দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের যোগ্য অনুসারীরাই বহন করে আসছে। যেখানে বাতিলের আনাগোনা বা তৎপরতা পাওয়া গেছে সেখানেই

হকের পতাকাবাহী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নির্ভিক উলামায়ে কিরাম গর্জে উঠেছেন। থামিয়ে দিয়েছেন তাদের আশ্ফালন।

পৃথিবীতে যখন থেকেই হকের যাত্রা তখন থেকেই বাতিলের অতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র শুরু। হক থেকেছে সর্বদা একই লেবাসে, একই নিয়মে, কিন্তু বাতিল এসেছে বিভিন্ন লেবাসে, রকমারী ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে। যেভাবে আসলে মানুষ সহজে ধোকা পড়বে, তাদের বাতিল মতাদর্শের প্রতি খুব সহজেই আকৃষ্ট হবে, সেভাবেই বাতিলপন্থীরা ইসলামের নাম দিয়ে স্বীয় মতাদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরেছে।

আল্লাহর দীন, তিনি নিজেই এর রক্ষাকারী। কেউ তা পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারবে না, পারবে না কেউ তার আলোকে স্লেহন করতে। সহীহ দীন, হক দল কিয়ামত পর্যন্তই থাকবে। মাঝ থেকে বিলীন হয়ে যাবে নবউদ্ভাবিত সব বাতিল দল ও ভ্রান্ত মতবাদ।

ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কতো মত ও দল, মতাদর্শ ও ফেরকার উত্থান হয়েছে! কিন্তু হক দল ও সঠিক মত ছাড়া একটাও স্থায়ী হয়নি। হারিয়ে গেছে কালের আবর্তে। এক একটি যুগের সন্ধিক্ষণে বিলীন হয়েছে এক একটি বাতিল মতবাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুনাফিকদের উৎপাত, সাহাবা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুম এর যুগে রাফেযী, খারেজীদের আবির্ভাব, এরপর জাহমিয়া, মুরজিয়া, কাদরিয়া, মুতায়িলা, কারামিয়া, ইসমাইলিয়া, সাবায়ীসহ ইসলামের নামে অসংখ্য দল ও ফেরকার উদ্ভব ঘটে। এরা ভেবেছিলো সত্যিকার হকপন্থী ইসলামী দলগুলোর মতো তাদের মতাদর্শও স্থায়ী হবে। কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলো, বাতিলকে কিছুক্ষণ অবকাশ দেন এরপর তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেন যে, ইতিহাসের পাতায় শুধু তার নামটাই বাকী থাকে, অন্যকিছুর অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বযুগে বখতেনাসর, ফেরআউন, কারুন, শাদাদ, নমরুদসহ আদ, সামূদ, সাদূম জাতির মর্মান্তিক পরিণতি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আবু জাহেল, আবু লাহাব, উতবা, শাইবাসহ বিভিন্ন কাফেরদের করুণ ইতিহাস আল্লাহর সে চিরাচরিত নিয়মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাস্তবে হয়েছেও তাই। আজ আমরা খারেজী, রাফেযী, মুতায়িলাদের শুধু নামই জানি,

তাদের কোনো অস্তিত্বের কথা জানি না; বরং অনেক এমন লোকও আছে, যারা তাদের নাম পর্যন্ত জানে না।

এ কথার সাথে সাথে এ বিষয়টিও ভুলে গেলে চলবে না যে, যতদিন হক থাকবে ততদিন বাতিলও থাকবে। পার্থক্য হলো, বাতিল বারবার রঙ পাল্টিয়ে, নাম পরিবর্তন করে নতুন ধাচে আবির্ভূত হবে আর হক এক নিয়মে এক রঙে যেভাবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে চলে আসছে সেভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এতে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আসবে না।

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশ করেছি, যে শতাব্দিতে ইসলাম চতুর্মুখী আক্রমণের শিকার। একদিকে যেমন ইয়াহুদী-নাসারা তথা সম্মিলিত কুফরী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে ঠিক তেমনি নামধারী কিছু মুসলিম অজ্ঞতাবশত বা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে ইসলামের চরম ক্ষতি করে যাচ্ছে। মুতায়িলা, জাহমিয়া, মুরজিয়ারা আজ না থাকলেও ভিন্ন নামে ইসলামের লেবাসধারী নবউদ্ভাবিত কিছু ভ্রান্ত দল আজ তাদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত মিশনই পূর্ণ করার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু আল্লাহ একমাত্র তাঁর দীনকেই পূর্ণ করেছেন এবং স্বয়ং তিনি নিজে এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে কাদিয়ানী, মওদূদী, বেরলভী, দেওয়ানবাগী, আটরশী এবং মাইজভাণ্ডারীসহ বিভিন্ন বাতিলপন্থীদের ছাপিয়ে আহলে হাদীস নামধারী লামাযহাবী সম্প্রদায়ের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অযাচিত কর্মপন্থা অনেক আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইদানিং সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি, মিথ্যা, ভুল ও ভুয়া উদ্ধৃতিতে ভরপুর বিভিন্ন লিফলেট মসজিদে মসজিদে, সাধারণ সমাবেশে ও জনসমাজে বিতরণ করা হচ্ছে। এতে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আমলগুলোকে মিথ্যা ও ভুল দলীলের উদ্ধৃতি দিয়ে ভুয়া ও প্রমাণহীন বলা হচ্ছে, যা পড়ে সাধারণ মানুষ দ্বিধা-দ্বন্ধে ও সংশয়ে পতিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে কোনো প্রতিপক্ষ ব্যতীরেকেই মুনাযারা (বিতর্ক অনুষ্ঠান) ও বহাসের আহ্বান ও হানাফীদের বিপরীত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে থাকে। পরবর্তীতে যখন বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম তা জানতে পেরে মুনাযারার ব্যবস্থা ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তখন তারা বিভিন্ন ওয়র আপত্তি তুলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা তাদের কুতৎপরতা অব্যহত রেখেছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আলেম সমাজের কর্মতৎপরতায়, সচেতন মানুষদের সজাগতায় আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের ভয়ংকর নীরব মুখোশ ও ফেতনা সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্য অনেকটাই জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। ব্যাপকভাবে এখন জনসাধারণের মাঝে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছে তা হলো, এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কারা? কবে এদের উত্থান? আর এদের উদ্দেশ্যটাই বা কী? এ জাতীয় আরো অনেক প্রশ্ন।

বক্ষ্যমান এ বইটি মূলত লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত একটি বিভ্রান্তিকর লিফলেটের জবাবে লেখা হলেও পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের লা-মাযহাবী সম্প্রদায়কে জানা ও চেনার কৌতুহল উপলব্ধি করে এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য বইয়ের শুরুতে সংযোজন করার কথা ভাবলাম। যেমন আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের পরিচয়, এদের উত্থান, সত্যিকার আহলে হাদীস কারা, এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা, ব্রিটিশদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের দাস্তানসহ ইত্যাকার বিষয়।

এ বইটিতে দু'টি অধ্যায় থাকবে। প্রথম অধ্যায়ে লা-মাযহাবীদের পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিয়াল্লিশটি শিরোনামে লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক হানাফীদের আমল ও মাসআলার উপর অভিযোগ ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ অভিযোগগুলোর যথারীতি খণ্ডন ও স্বপক্ষে মযবুত দলীলাদি উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। শেষে একটি উপসংহার থাকবে, যাতে লা-মাযহাবীদের প্রতি কতিপয় অখণ্ডনীয় প্রশ্ন ও সত্যসন্ধানী সাধারণ লা-মাযহাবী ভাইদের হকের পথে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান থাকবে। আল্লাহই সকল ভালো কাজের তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী।

প্রথম অধ্যায়:

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীদের পরিচয়

সমগ্র বিশ্বে এ আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে না পূর্বে কখনো ছিলো আর না এখন আছে। শুধুমাত্র হিন্দুস্থানই এমন একটি দেশ, যেখানে কোথাও কোথাও এ দলটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এটাও অবশ্য ব্রিটিশ শাসনামলে, নচেৎ এর পূর্বে এ সম্প্রদায়টির নাম ও নিশানা হিন্দুস্থানসহ পৃথিবীর কোথাও ছিলো না। হিন্দুস্থান তথা ভারত উপমহাদেশে যখন ইসলাম এসেছে তখন থেকে নিয়ে ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত এর সকল অধিবাসী হানাফী ছিলো, কেউ লা মাযহাবী ছিলো না।

স্বয়ং লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের মুজাদ্দিদ ও শীর্ষ আলেম নওয়াব সিদ্দীক খান পর্যন্ত এ রূঢ় সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ তরজমানে অহহাবিয়াতে লিখেছেন:

خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے اس وقت سے آج تک (انگریز کی آمد تک) یہ لوگ مذہب حنفی پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل اور قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے۔^(۱)

অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা এই যে, যখন থেকে এখানে ইসলাম এসেছে তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত (অর্থাৎ ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত) এর অধিবাসীরা হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং এখনো আছে এবং এখানে এই মাযহাবেরই আলেম, বিদ্বান, বিচারক ও মুফতীর ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে।

এ দলটি এতই বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি সম্প্রদায় যে, এদের মূলনাম আজও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। প্রথমদিকে এ দলটির কোনো নামই ছিলো না। পরবর্তীতে নিজেদেরকে এরা আহলে হাদীস, মুহাম্মাদী ও মুওয়াহহিদী বললেও সমাজে এরা গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ও ওহাবী নামে পরিচিতি পায়।

کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آرہا ہیں جس سے لوگ بالکل نا آشنا ہیں۔ پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آتے۔ بلکہ ان کا ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحدی کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لامذہب لیا جاتا ہے۔^(۲)

এ নবউদ্ভাবিত দলটির প্রতিষ্ঠাতার নাম মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত: ১২৭৬ হি.), যিনি শহীদ সাইয়েদ আহমাদ রহ. এর মুজাহিদ্দীন দল থেকে বহিস্কৃত ছিলেন।

سوبانی مبانی اس فرقہ نوا حداثہ (غیر مقلدین) کا عبدالحق بنارسى ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے اور حضرت امیر المؤمنین (سید احمد شہیدؒ) نے ایسی ہی حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا اور علمائے حریمین شریفین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا مگر کسی طرح وہاں سے بچ نکلا۔ (۵)

৩ তাম্বীহুয যাল্লীন : পৃ. নং ৩১, আহলে হাদীস আওর ইংরেজ : পৃ. নং ১৯

অর্থাৎ এই নবআবিষ্কৃত দল তথা গাইরে মুকাল্লিদীনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী, যিনি কিছুদিন যাবত বেনারসে অবস্থান করছিলেন (এবং চার মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদ অস্বীকার করে নতুন একটি ফেরকার সূত্রপাত করছিলেন।) হযরত আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. তার এ ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে দল থেকে বহিস্কার করে দেন এবং হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা ও মদীনার উলামায়ে কিরাম (তার জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য) তাকে হত্যা করার ফতোয়া প্রদান করেন। কিন্তু (এ যাত্রায়) সে কোনোরকমে তথা থেকে পলায়ন করে বাঁচে।

মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী ১২৪৬ হিজরীতে শহীদ সাইয়েদ আহমাদ রহ. এর দল থেকে বহিস্কৃত হয়ে ভারতবর্ষে প্রথম লা-মাযহাবী ফেরকার সূচনা ও ভিত রচনা করেন। এজন্য বর্তমান আহলে হাদীস নামধারী এ লা-মাযহাবী দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও ভিত্তিস্থাপনকারী বলে তিনি স্বীয় মতাদর্শের অনুসারীদের নিকট স্বীকৃতি পান। তিনি বেনারসে বসেই তার মিশনের কার্যক্রম শুরু করেন এবং সেখানেই সর্বপ্রথম ‘জামিয়া সালাফিয়া বেনারস’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজো বিদ্যমান।

অবশ্য আব্দুল হক বেনারসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ দলটিকে সাংগাঠনিক ও সংঘবদ্ধরূপে একটি অগ্রসরমুখী বড় মিশন হিসেবে তুলে ধরেন শাইখুল কুল ফিল কুল বা একচ্ছত্র মহান ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত মাওলানা সাইয়েদ নযীর হুসাইন দেহলবী। তিনি রচনা, লেখনী, বক্তৃতা ও অসামান্য মেহনত করে এ নবজন্মা দলটিকে একটি পূর্ণ দলরূপে দাঁড় করিয়ে এর মতাদর্শ জনগণের নিকট তুলে ধরেন। এরপর এর প্রচার বাড়তে থাকে এবং সুবিধাশ্রমীরা এ নতুন মতের ছায়ায় নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নেয়। আর এভাবেই ব্রিটিশামলে জন্ম নেয়া এ দলটি সব ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মিশন এগিয়ে নিয়ে যায়।

লা-মাযহাবী দলের উত্থানের প্রেক্ষাপট

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে এদের কোনো নাম-নিশানাও পাওয়া যায় না। অথও ভারতে এ দলটির উত্থান ব্রিটিশ সরকারের কৃপা ও নেক নজরেরই বিষফল। ব্রিটিশশক্তি যখন উমিচাঁদ, রায়বল্লভ, মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এ উপমহাদেশে তাদের অভিশপ্ত পা রাখলো তখন নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব স্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রথমত তারা মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের বীজ রোপন করার পায়তারা করলো। কুটকৌশল ও শয়তানী বুদ্ধিতে দক্ষ বলে পরিচিত এ ব্রিটিশশক্তি 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' অর্থাৎ প্রজা ও সাধারণ মানুষের মাঝে লড়াই ও মতানৈক্য সৃষ্টি করো এবং নিজেরা আরামে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করো- মূলনীতি প্রয়োগ করলো। অথও ভারতের একমাত্র ব্রিটিশবিরোধী বৃহৎ শক্তি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে অনৈক্য-অমিল ও পারস্পারিক গণ্ডগোল সৃষ্টি করার হীন লক্ষ্যে প্রথম আঘাত হানলো মাযহাবের উপর। কারণ, ব্রিটিশ সরকার ভালোভাবেই জানতো যে, নির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করলে ইচ্ছামতো কুরআন হাদীসের ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যা প্রচার করা যাবে না। এজন্য প্রথমে মানুষদের মাযহাবী স্বাধীনতা প্রদান করা হবে এবং মাযহাব মানার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়ে সবাইকে সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস দেখে চলার আহ্বান করা হবে। যেহেতু নির্দিষ্ট মাযহাব না মেনে নিজে নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার শ্লোগানের ছদ্মাবরণে রয়েছে স্বীয় মর্জি মোতাবেক যেকোনো অপব্যাখ্যা করার অবাধ সুযোগ। এতে নিজেদেরও সুবিধা হবে আর সত্যিকার ইসলামেরও মারাত্মক ক্ষতি হবে। মূলত ব্রিটিশদের এ অশুভ চিন্তা ও ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ লা-মাযহাবী দলের উত্থান। পরবর্তীতে মাযহাব না মানা এ ফেতনার উদরেই হাদীস না মানার ফেতনা, শেষনবী না মানার তথা কাদিয়ানী ফেতনা, বিজ্ঞান ও আধুনিকতাপ্রবণ ফেতনাসহ বিভিন্ন ফেতনা ও দলের জন্ম হয়।^(১)

মাযহাবগত স্বাধীনতার অর্থ হলো, নির্দিষ্ট মাযহাব মানার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না; বরং স্বীয় বুঝমতে কুরআন-হাদীসের যে ব্যাখ্যা বুঝবে সেটাই বলবে, পূর্বসূরীদের কৃত ব্যাখ্যা দেখা বা জানার কোনোই প্রয়োজন নেই।

কুরআন-হাদীসের শব্দের অর্থ নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করলে তাকে কেউ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, এ অর্থ আপনি কোথা থেকে পেলেন? কারণ, এটা মাযহাবী স্বাধীনতায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল!

মূলত এভাবেই মাযহাবী স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কুচক্রী একটি দল ইসলামের ঐক্যকে বিনষ্ট করে ব্রিটিশ সরকারের অভিষ্ট হীন উদ্দেশ্য পূরণ করে তাদের নেকদৃষ্টি অর্জন করেছে। এ স্বাধীনতা যে ব্রিটিশদেরই দেয়া, তার প্রমাণ বিভিন্নস্থানে লা-মাযহাবীদেরই শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বীকৃতি থেকে বুঝা যায়।

লা-মাযহাবী দলের অন্যতম মুখপাত্র নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আগমনের সুফল ও মাযহাবগত স্বাধীনতা প্রদানের প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

کتب تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امن و آسائش و آزادی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی کسی حکومت میں بھی نہ تھی اور وجہ اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں سمجھی گئی کہ گورنمنٹ نے آزادی کامل ہر مذہب والے کو دی۔^(۱)

অর্থাৎ ইতিহাস দেখলে জানা যায় যে, এ ব্রিটিশ শাসনামলে সর্বস্তরের জনগণের যে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা (পূর্বের) কোনো শাসনামলেই ছিলো না। আর এর কারণ এটা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝা যায় না যে, ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেক মাযহাব ও গোষ্ঠিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

অন্য একস্থানে তিনি লা-মাযহাবীদের প্রতি ইংরেজদের কৃপার কথা উল্লেখ করে বলেন:

اور یہ لوگ (غیر مقلدین) اپنے دین میں وہی آزادی برتتے ہیں جس کا اشتہار بار بار انگریزی سرکار سے جاری ہوا۔^(۲)

১ তরজমানে অহহাবিয়া : পৃ. নং ১৬

২ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ২২

অর্থাৎ আর এ লোকসকল (লা-মাযহাবীগণ) স্বীয় দীন ও মতাদর্শের ব্যাপারে ঐ স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে, যার ঘোষণা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বারবার করা হয়েছে।

আরেক জায়গায় তিনি নিজেদের ইংরেজপ্রীতি ও মাযহাববিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ লিখেছেন:

اور (مقلدین) چاہتے ہیں کہ وہی تعصب مذہبی و تقلید شخصی اور ضد و جہالت آبائی جو ان میں چلی آتی ہے قائم رہے اور جو آسائش رعایا ہند کو بوجہ ازادگی مذہب گورنمنٹ نے عطا کی وہ اٹھ جائے۔^(۳)

অর্থাৎ আর মাযহাবের অনুসরণকারীগণ চায় যে, ঐ মাযহাবগত কঠোরতা এবং নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণপ্রবণতা এবং পৈতৃক মূর্থতা ও গোঁড়ামী, যা তাদের মাঝে পূর্ব থেকেই চলে আসছে তা বহাল থাকুক এবং মাযহাবগত স্বাধীনতা থাকায় ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত যে শান্তি ও নিরাপত্তা ভারতবর্ষের জনগণ পেয়েছে তা বিলুপ্ত হয়ে যাক।

উপরোক্ত বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায়, যেনো লা-মাযহাবীগণ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত মাযহাবগত স্বাধীনতার কুৎসিত গর্ভে জন্ম নেয়া একটি বিষফোঁড়া, যারা ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে বড় একটি মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে। আর ইসলাম নামক গাছের উপর রক্ত বর্ষণ এবং গোলাবর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বাতিলদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ব্রিটিশ সরকারের নিকট যেনো এ বার্তাই প্রেরণ করতে চাইছিলো যে, আমরা তো তোমাদের দেয়া মাযহাবগত স্বাধীনতার কারণেই অস্তিত্বে এসেছি বিধায় আমরা সদাসর্বদা তোমাদের খেদমতে অনুগত থাকবো। এটা শুধু ধারণা বা অনুমানই নয়; বরং বাস্তবিকই তা ঐতিহাসিক এক সত্য, যা সত্যপিয়াসু ইতিহাসপটু যাদের অজানা থাকার কথা নয়।

সত্যিকার আহলে হাদীস কারা?

যারা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীসহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাব পড়েছেন এবং উলূমে হাদীস সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন তারা ভালো করেই জানেন যে, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের কাজ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় দু'টি দলের জন্য দু'টি আলাদা আলাদা উপাধী নির্ধারণ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীন কিরামের দায়িত্ব যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করা অর্থাৎ হাদীসটি যে শব্দে বর্ণনা পরস্পরায় চলে আসছে তা ইয়াদ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে বা কিতাবের পাতায় লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা তাই তাঁদেরকে আসহাবুল হাদীস বা আহলুল হাদীস অর্থাৎ হাদীস বর্ণনা ও সংরক্ষণকারী বলা হয়। আর ফুকাহায়ে কিরামের কাজ হলো, হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং হাদীসের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কোনো কিছু সাংঘর্ষিক মনে হলে তার উত্তম ও সঠিক সমন্বয় সাধন এবং সমাধান করা।

ইমাম তিরমিযী রহ. সত্যিই বলেছেন!

وهم أعلم بمعاني الحديث. (১)

অর্থাৎ ফুকাহায়ে কিরামই তো হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অধিক অবগত।

এজন্য তাঁদেরকে আসহাবুর রায় অর্থাৎ গবেষক ও আইন বিশারদ বলা হয়। তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য হলো, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের যুগ অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অসাধারণ মেধা, বিস্ময়কর প্রতিভা ও খোদাপ্রদত্ত সে ইলম ও জ্ঞানের দুয়ার বহু আগেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অবিশ্বাস্য শোনা গেলেও সত্যিকার ইতিহাস তো এটাই বলে যে, এক এক আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দিসের সনদসহ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলো। ইমাম বুখারী রহ. এর ছয় লক্ষ, ইমাম মুসলিম রহ. এর তিন লক্ষ, ইমাম আবু দাউদ রহ. এর পাঁচ লক্ষ, ইমাম আবু যুরআ রাযী রহ. এর সাত লক্ষ এবং ইমাম আহমাদ রহ. এর দশ লক্ষ হাদীস ইয়াদ ছিলো। অথচ পরবর্তীতে সনদসহ শুধু বুখারী শরীফের সাত-আট হাজার হাদীস মুখস্তকারী মুহাদ্দিস খুঁজে পাওয়াও

১ জামে তিরমিযী : ১/১৯৩- باب ماجاء فى غسل الميت (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

দুস্কর। আর বর্তমান যুগের কথা তো বলাই বাহুল্য। মোটকথা সনদসহ হাদীস মুখস্ত করার যুগ অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

পূর্বেই এ আলোচনা গত হয়েছে যে, লা-মাযহাবী এ সম্প্রদায়টি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে এবং প্রতিপক্ষরাও তাদের বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করতঃ নিজেদের নাম ‘আহলে হাদীস’ বরাদ্দ করাতে সক্ষম হয়। কারণ, তারা ভালো করেই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, মুসলিম উম্মাহর কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত এ উপাধি নিজেদের দলের নামে ব্যবহার করতে পারলে সাধারণ মুসলমানদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করা যাবে। তারা ‘আহলে হাদীস’ উপাধিটির মূল অর্থ গোপন করে নিজেদের দলের সবার নাম আহলে হাদীস বলে প্রচার করলো। অথচ সাধারণ একজন আহলে হাদীস কেন, তাদের বড় বড় আলেমদেরও এক হাজার হাদীস মুখস্ত আছে কিনা সন্দেহ! আর সনদসহ হয়তো একশ হাদীসও মুখস্ত নেই। সুতরাং এ আহলে হাদীস নামটি পুরোটাই ধোকা ও প্রতারণার খোলস।

আসল আহলে হাদীস তো তাঁরাই যারা হাদীসের সনদ ও মতন (হাদীস বর্ণনাকারীদের সূত্রপরম্পরা ও মূল ভাষ্য) ইয়াদ করে এর সংরক্ষণ ও হেফাযত করেছেন এবং এর অনুকরণ-অনুসরণে নিজেদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছে।

বিশ্ববরণ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. (২)

অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র হাদীস শ্রবণ, লিখন বা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিদেরকে আহলে হাদীস মনে করি না; বরং আহলে হাদীস বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝি, যারা হাদীস ইয়াদ, পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী।

২ মাজমুআতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ৪/৯৫ তাহকীক : আমের আল জাযযার ও আনওয়ার আল বায (দারুল অফা, বৈরুত)

হাফেয মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল অযীর বিন আলী হাদবী রহ. বলেন:

من المعلوم أن أهل الحديث اسم لمن عني به وانقطع في طلبه. (১)

অর্থাৎ এটা একটি জ্ঞাত বিষয় যে, আহলে হাদীস বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যাঁরা এর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে খিদমাত করেছেন এবং এর অন্বেষণে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এ দুটি বর্ণনা থেকে প্রকৃত আহলে হাদীসের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং নিজেদেরকে শুধু আহলে হাদীস বললেই সত্যিকার আহলে হাদীস হওয়া যায় না। প্রকৃত আহলে হাদীস হতে হলে তো প্রচুর হাদীস ইয়াদ করতে হবে, এর সনদ ও ব্যাখ্যা জানা থাকতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে এর অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অথচ বর্তমান আহলে হাদীস নামধারী এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের মাঝে এসকল গুণের একটিও পাওয়া যায় না।

আসল আহলে হাদীস হতে হলে দরকার পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও অসীম কুরবানীর। লা-মাযহাবী দলে যোগদান করলেই আহলে হাদীস হওয়া যায় না। আহলে হাদীস তো উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে বিশেষ একটি দলের নাম। তাহলে লা-মাযহাবী দলের সবার নাম আহলে হাদীস হয় কী করে? অথচ এদের অধিকাংশ লোকই এমন, যাঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীস শব্দ দুটি আরবীতে পর্যন্ত লিখতে পারবে না। তাই এদের নাম আহলে হাদীস রাখাটা একেবারেই বেমানান ও অসামঞ্জস্যশীল।

এজন্য আমাদের বড়দের কেউ কেউ এদেরকে আহলে হাদীস না বলে আহলে হদস (অপবিত্র) বলে থাকেন। আমি বলি, এদের নাম আহলে হাদীস থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, ‘হাদীস’ শব্দটির দুটি অর্থ আছে। এক: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, কর্ম ও সম্মতি। দুই: নব্য ও নতুন। এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায় যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, কর্ম ও সম্মতির অনুসারী তথা হাদীসে রাসূলের প্রকৃত ধারক বাহক নয় তাই এরা দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আহলে হাদীস, যার অর্থ নব উদ্ভাবিত। সত্যিই নামের সঙ্গে বাস্তবতার চমৎকার মিল! তেরোশ হিজরীতে উদ্ভিত দলটির নাম এ হিসেবে যুৎসই ও সঠিকই হয়েছে। আল্লাহ এদের চক্রান্ত ও ধোকাবাজি থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন!

লা-মাযহাবীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, হকের মোকাবেলায় বাতিল সবসময় নতুন নামে, নতুন কৌশলে বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই অনেক সময়ই বাতিলদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থেকে যায়। তবুও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের অস্বাভাবিক ও চক্রান্তমূলক সব কর্মকাণ্ডে তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়।

এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের উত্থান যেহেতু ইংরেজ শাসনামালে তাই তাদের এ উত্থানের সাথে ইংরেজ সরকারের কোনো গোপন আঁতাত থাকাটাই স্বাভাবিক। আর বাস্তবে ঘটেছেও তাই। তাদের বিভিন্ন জিহাদবিরোধী কর্মকাণ্ড, ইংরেজদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং নিজেদের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের বক্তব্য ও লিখনী থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, লা-মাযহাবী দলের উত্থান এবং আবির্ভাব একমাত্র ইংরেজদের ইসলামবিরোধী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যই হয়েছে। এছাড়াও মুসলমানদের সহীহ আকীদা, দীন ও মাযহাবের মধ্যে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে তাদেরকে সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করাটাও তাদের টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত।

এ ব্যাপারে লা-মাযহাবী দলের অন্যতম প্রধান আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন:

یہ آزادی ہماری مذہب جدید سے عین مراد قانون انگلشیہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں
فرماں رواں بھوپال کو ہمیشہ آزادی مذہب میں کوشش رہی جو خاص منشاً گورنمنٹ
انڈیا کا ہے۔ (۲)

অর্থাৎ আমাদের নবউদ্ভাবিত মাযহাবে (তাকলীদের ব্যাপারে) স্বাধীনতা তো ব্রিটিশ সরকারের আইনের চাহিদা মোতাবেকই। তিনি আরো বলেন, ভারতের অনুগত রাষ্ট্র নেপালের তো মাযহাবী স্বাধীনতার ব্যাপারে সর্বদাই চেষ্টা ছিলো, যা ভারত সরকারের একান্ত বিশেষ চাহিদা।

এভাবে লা-মাযহাবী দলের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র অকীলে আহলে হাদীস মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী তো আরো ধাপ অগ্রসর হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে ইসলামী খেলাফতের চেয়েও উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

মাও. ফযল হুসাইন বিহারী তার আল হায়াত বা'দাল মামাত গ্রন্থে মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীর জীবনের জঘন্যতম এ উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار رعایا برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔^(۱)

অর্থাৎ এ আহলে হাদীস দলটি ব্রিটিশ সরকারের কল্যাণপ্রত্যাশী, চুক্তি রক্ষাকারী এবং অনুগত প্রজা হওয়ার অত্যন্ত পরিষ্কার এবং শক্তিশালী প্রমাণ হলো, এরা (লা-মাযহাবীগণ) ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার চেয়ে উত্তম মনে করে।

আহলে হাদীসের একটি দলের নাম 'গুরাবা আহলে হাদীস'। এদের প্রধান নেতা মুহাম্মাদ মোবারক বলেন, এ গুরাবা আহলে হাদীসের ভিত্তি স্থাপন করাই হয়েছে মূলত মুহাদ্দিসীনে কিরামের সাথে মতানৈক্য করার জন্য। শুধু এটাই নয়; বরং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবিদিত নেতা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. এর বিরুদ্ধাচরণ করে ইংরেজদের খুশী করাও ছিলো এর বিশেষ উদ্দেশ্য।^(২)

মৌলভী হুসাইন আহমাদ বাটালবী তো ইংরেজদের খুশী করা এবং তাদের অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের আশায় জিহাদ করার বিপক্ষে 'আল ইকতিসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ' নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এতে তিনি জিহাদের মতো ইসলামের মহান ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী একটি বিধানকে মানসুখ বা রহিত ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। অথচ এর বিপরীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদকে ঈমানের মূল আখ্যা দিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন:

১ আল হায়াত বা'দাল মামাত : পৃ. নং ৯৩

২ উলামায়ে আহনাফ আওর তাহরীকে মুজাহদীন : পৃ. নং ৪৮

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ; الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُكْفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ. وَالْجِهَادُ مَا ضِيَ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٌ وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ. وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ. (৩)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় হলো ঈমানের মূল। এক: কালেমা পাঠকারীকে হত্যা ও কষ্ট দেয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা; কোনো গোনাহের কারনে তাকে কাফের বলবে না এবং কোনো আমলের কারনে তাকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করবে না। দুই: জিহাদ, যা আমার নবুওয়াতের সময় থেকে নিয়ে আমার শেষ উম্মত (অর্থাৎ ঈসা আ.) দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ জিহাদের বিধানকে না কোনো যালিমের যুলুম বাতিল করতে পারবে আর না কোনো ইনসাফগারের ন্যায়পরায়ণতা রহিত করতে পারবে। তিন: তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।

এভাবেই এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টি ইংরেজদের খুশী করতে গিয়ে কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করতে একটুও থামকে দাঁড়ায়নি। এরাই নাকি হাদীসের অনুসারী!

হুসাইন আহমাদ বাটালবীর বিশিষ্ট শিষ্য মৌলভী আলতাফ বলেন:

انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے۔ (৪)

অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকার আমাদের (লা-মাযহাবীদের) মতো মুসলামানদের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টি ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষায় এতোটাই নিষ্ঠাবান ছিলো যে, নিজের ঈমান-দীন ও ইসলাম বিকিয়ে হলেও তাদের বিপক্ষে যেতে প্রস্তুত ছিলো না। এ উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে

৩ আবু দাউদ : ২/৩২৪-৩২৫ হাদীস নং ২৫৩৪ (দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত)

৪ আল হায়াত বা'দাল মামাত : পৃ. নং ৯৩

গেলো এবং ইসলাম ও মুসলামানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রান্ত একে একে প্রকাশ পেতে থাকলো তখন হিন্দুস্থানের প্রায় সকল উলামায়ে কিরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দিলেন এবং এ ফতোয়ানামায় বড় বড় প্রায় সকল উলামায়ে কিরামই দস্তখত করেন। আর এ ফতোয়ার কারণেই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলামানদের মাঝে জযবা ও স্পৃহার এক তুফান বয়ে গেলো এবং সবার ঈমানী জোশ জেগে উঠলো। আর এ ভিত্তিতেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ নামে ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলন হয় এবং এরপর এ চেতনার বিস্ফোরণেই একসময় ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এ আযীমুশ শান ফতোয়ায় দস্তখত দিতে কিছু স্বার্থান্বেষী, দুনিয়ালোভী মৌলভী অস্বীকৃতি জানিয়ে এর বিরোধিতা করে বসে। এসকল গাদ্দার, সুবিধাভোগী ও দুনিয়াদার মৌলভীদের শীর্ষে রয়েছে লা-মাযহাবীদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম নযীর হুসাইন।^১

মোটকথা লা-মাযহাবী এ দলটির একমাত্র সাধনা ও লক্ষ্য ছিলো, কী করে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বদা খুশী রাখা যায়। এর জন্য এরা নিজেদের দীন-ঈমান বিসর্জন, কুরআন-হাদীসের ভুল ও অপব্যাখ্যা এবং শরীয়তের স্পষ্ট বিধানসমূহের বিরোধিতাসহ সব ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত ছিলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে হলে আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। তাই খুব সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তাদের ব্রিটিশসখ্যতা ও বন্ধুত্বের কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এতে তাদের মুখোশ কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হবে বলে আশা করি।

১ আহলে হাদীস আওর ইংরেজ: পৃ. নং ২৭

ব্রিটিশদের সাথে লা-মাযহাবীদের

সখ্যতা ও সম্পর্ক

প্রথমে আমরা আলোচনায় আনবো লা-মাযহাবীদের কেন্দ্রীয় এবং অন্যতম প্রধান ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের দাস্তান। লা-মাযহাবীগণ যাকে ইমামুস সুন্নাহ, মুজাদ্দিদে হিন্দ ও খাতামুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত করেছে এবং কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে তার মর্যাদা ও সম্মান শাইখুল কুল ফিল কুল বলে পরিচিত মৌলভী নযীর হুসাইন দেহলবীর চাইতেও বেশী ছিলো।^(২)

এই নওয়াব সিদ্দীক খান ইংরেজদের সুদৃষ্টি ও কৃপা লাভের আশায় অনেক জঘন্য ও খারাপ পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি ১৮৫৭-এর আযাদী আন্দোলনের মুজাহিদদেরকে যালেম, নির্বোধ, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী, মূর্খ, ইসলামবিমূখ, কবীরা গোনাহে জড়িত এবং চুক্তি ভঙ্গকারী বলে বিভিন্ন শব্দে গালি-গালাজ করেছেন। একপর্যায়ে তিনি এদেরকে দুনিয়া-আখেরাতের মহান্ফতিহাস্ত এবং ঈমান থেকে দূরবর্তী বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ তরজমানে অহহাবিয়্যাতে লিখেছেন:

اور حاکموں کی اطاعت اور رئیسوں کا انقیاد ان کی ملت میں (غیر مقلدین کے

مذہب میں) سب واجبوں سے بڑا واجب ہے۔^(৩)

অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের আনুগত্য এবং ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করা এদের মতে (অর্থাৎ লা-মাযহাবীদের মতানুসারে) সকল আবশ্যকীয় দায়িত্বের তুলনায় বড় দায়িত্ব।

নাউযুবিল্লাহ! এর চেয়ে দীনের উপর বড় আঘাত আর কী হতে পারে? যার নিকট যালেম, কাফের এবং তৎকালীন সময়ে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য করা সবচেয়ে বড় ফরয এবং অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তার ব্যাপারে আমরা আর কী বলবো? বিবেকসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি এদের কুমতলব ও অসৎ উদ্দেশ্য সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে। প্রকারান্তরে নওয়াব

২ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ৪৩

৩ তরজমানে অহহাবিয়্যা : পৃ. নং ২৯

সিদ্দীক এটাই বলতে চেয়েছেন যে, তাওহীদ, রেসালাত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আর কী বড় ফরয; বরং এর চেয়েও বড় ফরয দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ইংরেজ সরকারের আনুগত্য করা! যে ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের আনুগত্যকে বড় কর্তব্য ও ফরয মনে করবে না সে সবচে বড় ফরযের অস্বীকার করায় ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে! আরও সহজে বলা যায়, যে ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের গোলামী মেনে নিবে সে সবচে বড় মূমিন এবং যে ইংরেজ সরকারের গোলামী মানবে না সে সবচে বড় কাফের এবং বেঈমান! হায় আফসোস!! কী জঘন্যতম মন্তব্য!!!

তিনি জিহাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন:

پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امر میں کہ حکومت برٹش مٹ جائے اور یہ امن وامان جو آج حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کا نام لیکر اٹھا دیا جائے سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔^(۱)

অর্থাৎ সুতরাং নিজের মাযহাবের হুকুম সম্বন্ধে অজ্ঞ ঐসকল (হানারফী) লোকদের একটু এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়া এবং আজ যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে তা জিহাদের নামে অরাজকতার অন্তরালে উঠিয়ে দেয়াটা চরম বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

তিনি হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম ঘোষণা দিয়ে আরো লিখেছেন:

اور کسی کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہیں کرنا چاہئے۔^(۲)

অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম (ইসলামী দেশ)।

একথা কারো অজানা নয় যে, দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য যেসকল শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে থেকে অন্যতম প্রধান একটি শর্ত হলো, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার

১ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ৭

২ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ৪৮

দায়িত্বভার মুসলিম খলীফার হাতে থাকবে এবং দেশে ইসলামী বিধি-বিধান প্রকাশ্যভাবে জারি থাকবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইংরেজ শাসনামলে এ শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া তো দূরে থাক; বরং মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সাধারণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার, যা সাধারণত বিশ্বের প্রায় সবদেশেই থাকে তাও ছিলো না। শুধু তাই নয়; বরং ব্রিটিশ সরকার আলেম উলামা ও মুসলমানদের উপর অত্যাচারের যে স্টীমরোলার চালিয়েছিলো, তা চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের বর্বরতাকেও একপর্যায়ে হার মানিয়েছিলো। সুতরাং এরকম অবস্থায় হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম বলার দুঃসাহস দেখানোর উদ্দেশ্য ইংরেজদের খুশী করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কারণ, হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম বলার অর্থ হলো এদেশে জিহাদ করার কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু জিহাদ তো করতে হয় কুফরী রাষ্ট্রের সাথে, দারুল ইসলামে আবার জিহাদ কার সাথে? তাই সাধারণ মুসলমানরা এ কথা শুনে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবে যে, এ দেশ দারুল ইসলাম হলে তো জিহাদ করা যাবে না। এতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরই লাভ। আর লা-মাযহাবীগণ তো এটাই চেয়েছিলো।

ফযল হুসাইন বিহারী লিখেছেন:

ہندوستان کو ہمیشہ میاں صاحب دارالامان فرماتے تھے، دارالحرب کبھی نہ کہا۔^(۳)

অর্থাৎ মিয়া সাহেব (লা-মাযহাবীদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম নযীর হুসাইন দেহলবী) সর্বদাই হিন্দুস্তানকে দারুল আমান বা নিরাপত্তার দেশ বলতেন। কখনো তিনি একে দারুল হরব বা যুদ্ধকবলিত কুফরী রাষ্ট্র বলেননি।

আমার মনে হয়, মিয়া সাহেবের কথা পুরোপুরি সঠিক না হলেও এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিকই আছে। কেননা, ইংরেজ শাসনামলে হিন্দুস্তান তো তাদের জন্যই আতংক ও নিরাপত্তাহীনতার দেশ ছিলো, যারা মুসলমান ও ইংরেজবিরোধী। লা-মাযহাবীগণ যেহেতু ইংরেজদের গোলামী করে তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলো তাই তাদের জন্য এদেশ ছিলো নিরাপত্তা ও শান্তির আবাস।

হুসাইন আহমাদ বাটালবীর সমর্থন ও অনুসরণে সিদ্দীক হাসান খান লিখেছেন:

৩ আল হায়াত বা'দাল মামাত : পৃ. নং ১৩৪, ফিরকায়ে আহলে হাদীসে পাক ও হিন্দ : পৃ. নং ৭৪

جهاد جنگ مذہبی بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہندیا بمقابلہ اس حاکم کے کہ جس نے
ازادی مذہبی دے رکھی ہے از روئے شریعت اسلام عموماً خلاف و ممنوع ہے، اور وہ لوگ
جو بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہندیا کسی اس بادشاہ کے جس نے ازادی مذہب دی ہے، ہتھیار
اٹھاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں کل ایسے لوگ باغی ہیں اور مستحق سزا کے مثل
باغیوں کے شمار ہوتے ہیں۔^(۱)

অর্থাৎ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বা মাযহাবগত স্বাধীনতার সুযোগ
প্রদানকারী কোনো বিচারক ও শাসকের বিরুদ্ধে ধর্মীয়ভাবে যুদ্ধ- জিহাদ করা
সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও নিষিদ্ধ। আর এসকল লোক, যারা ভারতের ব্রিটিশ
সরকারের বিরুদ্ধে বা মাযহাবী স্বাধীনতা প্রদান করেছে এমন কোনো শাসনকর্তার
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং ধর্মীয় জিহাদ করতে চায় এরা সবাই রাষ্ট্রদ্রোহী
এবং বিদ্রোহীদের শান্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

কতবড় দালানী ও পক্ষপাতিত্ব! যেখানে ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বের বড় বড়
শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের মতে ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষ ছিলো দারুল
হরব বা কুফুরী সরকারশাসিত দেশ এবং এ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে
ইসলামবিদ্বেষী এ সরকারকে উৎখাত করা সবার উপর ফরয দায়িত্ব। সেখানে
ব্রিটিশবিরোধী মুজাহিদদেরকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিদ্রোহী! আবার এ
বিদ্রোহের ফলে তাদেরকে নাকি শান্তিও পেতে হবে। হ্যাঁ, বাস্তবেই তারা পার্থিব
শান্তি পেয়েছেন। হাজার হাজার আলেম ও কারীকে শহীদ করা হয়েছে। লক্ষ-
লক্ষ মুসলমান ঘরহারা, সম্পদহারা হয়েছেন। কিন্তু এসবের বিনিময়ে একদল
জান্নাত খরীদ করেছে আর অন্য একটি দল ব্রিটিশদের কৃপা ও নিরাপত্তা নিয়ে
জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করেছে।

লা-মাযহাবী এ দলটির ইংরেজ ও ব্রিটিশপ্রীতির এরকম আরো অনেক কথা
আছে, যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। সারাটা জীবন
ইংরেজদের গোলামী এবং সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন করার মধ্য
দিয়েই এরা সময় কাটিয়েছে। মূলত এরা এদের কাজে ও লক্ষ্যপূরণে

১ তরজমানে অহহাবিয়া : পৃ. নং ১২০, আহলে হাদীস আওর ইংরেজ : পৃ. নং ৫৮-৫৯

অনেকটাই সফল। কারণ, এদের প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিলো মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে ফেলা এবং ইংরেজদের গোলামী করে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজেদের নয়া উদ্ভাবিত দলটিকে প্রতিষ্ঠিত একটি রূপ দেয়া, যাতে তাদের মতাদর্শ জনগণের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া যায়।

আজ ইংরেজরাও নেই এবং নেই সে ইংরেজবিরোধী মর্দে মুজাহিদ উলামায়ে কিরামও। কিন্তু রয়ে গেছে ইংরেজদের রোপিত সে লা-মাযহাবী ফেতনার চারাগাছটি, যার বিষফলে এখনো প্রতিনিয়ত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমাদের আকাবির এক হাতে তলোয়ার নিয়ে যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাঠে জিহাদ করেছেন তেমনি অন্য হাতে কলম নিয়ে এসকল ফেতনার দাতভাগা জবাবও দিয়েছেন। এখন ইংরেজরা না থাকলেও লা-মাযহাবীদের দাপট ও তর্জন-গর্জন সমন্তরালভাবেই চলছে। তাই আমরাও আসছি দু'হাতে কলম নিয়ে, বাতিল বিনাশের শপথ নিয়ে; দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সহিত, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আমরা আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত বিয়াল্লিশটি মাসআলা সম্বলিত একটি লিফলেটের জবাব ও খণ্ডন নিয়ে আলোচনা করবো। লিফলেটটিতে এমন সব ভাষা ও উদ্ধৃতির উল্লেখ এসেছে, গবেষণা ও বাস্তবতার নিরিখে যার কোনো ধরনের জবাব দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবুও এতে যেহেতু কুরআন ও সহীহ হাদীস বলে বারবার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টির সমূহ আশংকা থাকায় বাধ্য হয়েই এর জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। জবাব দেয়ার পূর্বে পূর্ণ লিফলেটটি এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি, যেনো বিষয়বস্তুর সাথে জবাবের সামঞ্জস্যতা সহজেই বুঝে আসে। আল্লাহই সাহায্যকারী ও তাওফীকদাতা।

পূর্ণাঙ্গ লিফলেটটির কপি

(উল্লেখ্য যে, লিফলেটে ভাষাগত ও বানানগত যেসব ভুল রয়েছে তা সংশোধন না করে তার হুবহু কপিই এখানে তুলে ধরা হলো)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

* যারা হাদীস শুনে ও মানে তারা জান্নাতি আর যারা হাদীস শুনে কিন্তু মানে না, আমল করে না তারা জাহান্নামি।

* ইসলামের মূল বিষয় হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস, যে হাদীস মানবো তা হলো সহীহ হাদিস।

* রাসূল (সা) বলেন, “সালু কামা রায়াতুমুনী উসাল্লি” তোমরা সালাত আদায় কর, যেমন ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো। বোখা: ১/৮৮

* রাসূল (সা) বলেছেন, যারা আমাদের মত করে নামাজ পড়ে তারা মোসলমান, আল্লাহ ও রাসূল তার দায়িত্ব নিয়েছেন। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ১ম খণ্ড ৩৮৪ নং হাদিস। আর যারা ভ্যারাইটিস নিয়মে নামাজ পরে রাসূলের (সা) পদ্ধতি বাদে তাদের দায়িত্ব কেউ নিবে না। তাই রাসূল (সা) এর নামাজের কিছু নিয়ম সহীহ হাদিস থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। ওমাতাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

১। গোসলে তিন ফরয আমরা জানি তা ভুয়া। উত্তম রূপে রাসুল (সা) এর পদ্ধতিতে গোসল করতে হবে। সূরা মায়েরা ৬ নং আয়াতে তিন ফরজ বলা নাই।

২। তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি সেটিও ভুয়া। তায়াম্মুমের ফরজ হল ২টি দেখুন সূরা মায়েরা ৬ নং আয়াত।

৩। ওযুর ফরজ ৪টি সঠিক। দেখুন সূরা মায়েরা ৬ নং আয়াতে।

৪। ওযুর সময় গর্দান মাসেহ করা ভুয়া। কোন দলিল নেই বরং তা বিদআত। রাসুল (সা) অযু করার সময় গর্দান মাসেহ করেননি।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ১ম খণ্ড ১১৮ পৃঃ ১৮৫ নং হাদীস।

৫। আযানের উত্তরে আসহাদুআল্লা মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এর জবাবে শুধু (সা) বলা ভুয়া। মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলতে হবে। তবে হাইয়া আলা ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার উত্তরে লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলতে হবে। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ৫৮৫, ৫৮৬ নং হাদীস।

৬। ফজরের আযানের সময় খাইরুম মিনান নাওম এর জবাবে সাদাকতা বারাকতা বলা ভুয়া। সঠিক দলিল নাই (মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলতে হবে)।

৭। গোসল ও অযু করার আগে মুখে মুখে নিয়ত পাঠ করা ভুয়া। এটা Made in Bangladesh মক্কা ও মদিনায় Made হয়নি। শুধু বিসমিল্লাহ বলে ওযু ও গোসল শুরু করতে হবে। দেখুনঃ তিরমিঃ মিনা প্রঃ ২৫ নং হাদীস।

৮। আযানের শব্দগুলো দুবার এবং একামতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে। অসংখ্য সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মক্কা ও মদিনায় এখনো তা বিদ্যমান। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ৪৩ পৃঃ ৫৮০ নং হাদীস।

৯। আযানের দোয়ার শেষে অতিরিক্ত শব্দ ওয়ারযুকনা সাফাআতাহ বলা ভুয়া এবং তা বেদআত। এটা Made in Bangladesh মক্কা ও মদিনায় Made হয়নি। দোয়ায় ওআত্তা পর্যন্ত শেষ।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ ৫৮৭ নং হাদীস।

১০। নামাযের সময় সম্পর্কে যোহর এবং আসরের নামায ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরীতে আদায় করা হয়, তা একেবারেই ভুয়া। যোহরের নামাজ সূর্য হেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতে হবে এবং আসরের নামাজ বস্তুর ছায়া তার সমান পরিমাণ হয়ে গেলেই আসরের নামাজ পড়তে হবে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২ম খণ্ড ৫১৭-৫১৮ নং হাদীস।

১১। জায়নামাজে দাড়িয়ে ইন্নি ওজাহাতু বলা ভুয়া। এটা একটি কোরআনের সূরা আনআমের ৮১ নং আয়াত। রাসুল (সা) বা তার কোন সাহাবী এরকম আয়াত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১২। নাওয়াইতুআন বলে নামাযের নিয়্যাত করা ভুয়া। এটা Made in Bangladesh মক্কা ও মদিনায় Made হয়নি। সুতরাং তা বলা বিদাঅত। অনেক সহীহ হাদীস দাড়া প্রমাণিত যে রাসুল্লাহ (সা) তাকবীর বলে নামাজ শুরু করতেন। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১০১ পৃঃ ৭০২ নং হাদীস।

১৩। নামাজের সময় নাভিতে হাত বাধা আবু দাউদে ২টি হাদীস আছে, হাদীস দুটিকে আবু দাউদ সহীহ নয় বলেছেন এবং তিরমিযি রসুলের হাদীস নয় বলেছেন। বুকে হাত বাধতে হবে অনেক হাদিস দারা প্রমাণিত।

দেখুনঃ তিরমিঃ মিনা প্রঃ ১২৬ পৃঃ ২৩৯ নং হাদীস।

১৪। তাকবির দিয়ে আমরা যে ছানা পড়ি তা ইমাম তিরমিযি দুর্বল বলেছেন, ইমাম আহম্মদ সহীহ নয় বলেছেন। আসল ছানা হলো আল্লাহুমা বায়িদবায়নী.....পড়তে হবে যা অসংখ্য সহীহ হাদীস দারা প্রমাণিত।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১০৩ পৃঃ ৭০৮ নং হাদীস।

১৫। ইমামের পিছনে মোক্তাদীগণ ছানার পর সূরা ফাতেহা পাঠ করে না। তাদের ভ্রান্ত ধারণা। সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে সূরা হিজরে ৮৭ নং আয়াতে বলা আছে, রাসুল (সা) এর শত শত সহীহ হাদিস দারা প্রমাণিত।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ ৭২০ নং হাদীস।

১৬। এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতেহা পাঠ এবং অন্যান্য সূরা পাঠ কারীকে তারাহুরা করে নামাজ পড়া কারীকে রাসুল (সা) নামাজ চোর বলেছেন। দুই সিজদার মাঝে দোয়া পরতে হবে। পর পর দুটা সেজদা দেওয়া যাবে না।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ ৭৮১ নং হাদীস।

১৭। দুই সিজদার মাঝে থেমে দোয়া পড়তে হবে। পর পর দুটি সিজদা দেওয়া যাবে না। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ ৭৮১ নং হাদীস।

১৮। প্রত্যেক রাকাতে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে হাজার হাজার সহীহ হাদিস দারা প্রমাণিত। একবার হাত উঠাতে হবে আর হবে না বলে তিরমিযি আবু দাউদ ও নাসাইতে হাদিসটি বর্ণিত আছে, তা তিনারা হাদীসটি সহীহ নয় বলেছেন। রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১০০ পৃঃ ৭০১ নং হাদীস।

১৯। নামাজে পায়ে পা মিলিয়ে নামাজ পড়া রাসুল (সা) ও তার সাহাবীদের সুনাত যা হাজার হাজার সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত। বর্তমান বাংলাদেশে যে নিয়ম চালু আছে তা ভুয়া। কোন জাল হাদীসেও নাই ফাকে ফাকে দারাতে হবে। পায়ে পা মিলাতে হবে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ৯৫ পৃঃ ৯৮৯ নং হাদীস।

২০। সিজদা যাওয়ার সময় আগে হাটু পরে হাত যাবে এই মর্মে হাদিসটি ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্য ইমামগণ যঈফ বা দুর্বল বলেছেন। সিজদা যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাটু যাবে অসংখ্য সহীহ হাদীসে আছে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৩০ পৃঃ ৫২০ নং অনুচ্ছেদ।

২১। সিজদা শেষে মাটিতে ভর না দিয়ে তিরের মত দাড়াতে হবে, মর্মে যে হাদীসটি আছে তা মওযু এ মর্মে সকল হাদিসই যঈফ, শেখ আলবানী বলেছেন। মাটিতে ভরদিয়ে দাড়াতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ১৪২ পৃঃ ৭৮৬ নং হাদীস।

২২। নামাযে প্রথম ও ৩য় রাকাতে না বসে তিরের মত দাড়ানো পদ্ধতিটি একেবারেই ভুয়া। কোন জাল হাদীসেও নাই। ১ম ও ৩য় রাকাতে দারাবার পূর্বে বসতে হবে তারপর মাটিতে ভরদিয়ে দারাতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীসে আছে। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ ৭৮৫ নং হাদীস।

২৩। সুরা ফাতিহা শেষে নিরবে আমীন বলার পক্ষে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা মুহাদিসগণের নিকট যঈফ এবং অনেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, ইমাম তিরমিযি ও ইমাম দারাকুথনি একই মন্তব্য করেছেন। সুরা ফাতিহা শেষে শব্দ করে আমীন বলতে হবে হাজার হাজার সহীহ হাদিস বিদ্যমান। যা এখনো মক্কা ও মদিনায় প্রচলন আছে। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ১২০ পৃঃ ৫০২ নং অনুচ্ছেদ।

২৪। বৈঠকে বসে সাহাদাত আঙ্গুল উঠানো এবং নামানো ভুয়া পদ্ধতি। কোন জাল হাদিস দারাও প্রমানিত নয়। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে তাহাদে সাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে হবে।

তিরমিযি মিনা প্রঃ ১৩৯ পৃঃ ২৭৫-২৭৬ নং হাদীস।

২৫। বেতের নামাজে উল্টা তাকবির দেয়া ভুয়া পদ্ধতি। কোন সহীহ সুত্রে প্রমানিত নয়। উল্টা তাকবির দিতে হবে না।

২৬। বেতের নামাজে দুই বৈঠক দেয়া ভুয়া পদ্ধতি নবী ও সাহাবীদের আমল নয়। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে ১,৩,৫,৭ রাকাত রাসুল (সা) এক বৈঠকে পরতেন। তিরমিযি, মিনা প্রকাঃ ১৯৫ পৃঃ ৪৩১ নং হাদীস।

২৭। বেতের নামাজে যে দোয়া কুনুত পরা হয় আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাইনুকা পড়া হয় তা মুরসাল বা যঈফ। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে, আল্লাহুমাহ দিনি ফিমান হাদাইতা বলতে হবে। বোখাঃ মিনা প্রকাঃ ১৫৭ পৃঃ ৭৫৩ নং হাদীস।

২৮। নামাজ শেষে ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে বসতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৫২ পৃঃ ৮০৫ নং হাদীস।

২৯। নামাজের সময় চোখের নজর বিভিন্ন স্থানে দিই তা ভুয়া। সব সময় নামাজে চোখের নজর সিজদার স্থানে থাকবে সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত।

মিশকাত আলিম ক্লাস ৩৯৫ পৃঃ ৯৩১ নং হাদীস।

৩০। ফরজ নামাজ শেষে সম্মিলিত মোনাজাত করা একেবারেই ভুয়া। নবী ও তার সাহাবীদের সুনাত নয় বরং তা বেদাআত। সুরা বাকারার ৪৫ ও ১৫৩ নং আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। হাজার হাজার হাদিস আছে নামাজের মধ্যে দোয়া বাহিরে নয়। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪৮ পৃঃ ৭৯৪ নং হাদীস।

৩১। সমাজে প্রচলন আছে নামাজে ভুল হলে তাকবীর দেওয়া হয়, তা ভুয়া পদ্ধতি। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে নামাজে ভুল হলে পুরুষরা সোবহানাল্লাহ এবং মেয়েরা হাত তালী দিবে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৩৩৩ পৃঃ ১১৩০ নং হাদীস।

৩২। সমাজে প্রচলন আছে যে ইমামের ভুল হলে শুধু একদিকে সালাম ফিরিয়ে একটা সিজদা দিয়ে দরুদ দোয়া মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরায়ে তা ভুয়া পদ্ধতি। নামাজে ভুল হলে বৈঠকের সব দোয়া পরে দুটি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪৫ পৃঃ ৭৯১ নং হাদীস।

৩৩। খুৎবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে নামাজ না পরে বসে। এটা ভুল পদ্ধতি। অনেক সহীহ হাদীস আছে খুৎবা চলাকালীন সময়ে কেউ আসলে দুরাকাত নামাজ পরে বসতে হবে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৯০ পৃঃ ৮৮৩-৮৮৪ নং হাদীস।

৩৪। জুমআর তিনটা খুৎবা দেওয়া হয় তার কোন প্রমান হাদিসে নাই। অনেক সহীহ হাদিসে আছে জুমআর খুৎবা দুটা দিতে হবে।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৯০ পৃঃ ৮৮১ নং হাদীস।

৩৫। সমাজের হুজুরেরা জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করে না দলিল ছাড়া। জানাজার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৪০০ পৃঃ ১২৫৪ নং হাদীস।

৩৬। তারাবীর নামাজ বিশ রাকাত মর্মে হাদিসটি ভুয়া। রাসুল (সা) এবং তার সাহাবী থেকে প্রমানিত নয়। তারাবীর নামাজ ৮ রাকাত তা অসংখ্য সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত। বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৩০৯ পৃঃ ১০৮১ নং হাদীস।

৩৭। তারাবীর নামাজ তারাতারী পড়া এবং খতম তারাবী পড়া কোন দলীল নাই। চার রাকাত পর পর যে দোয়াটি পড়া হয় তাও ভুয়া। পৃথিবীর কোন জাল জঈফ এবং মওজু হাদিসে খুজে পাওয়া যায় না। সহীহ হাদীস তো দূরের কথা। ফরজ নামাজ শেষে যে দোয়াগুলো পড়া হয় তাই পড়তে হবে।

৩৮। রমযান মাসে রোযার নিয়ত ও ইফতারের দোয়া পড়া হয় তাও ভুয়া। কোন সহীহ সুত্রে প্রমানিত নয়। শুধু বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করতে হবে। খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে।

৩৯। ঈদাইনের নামাজ সমাজে ৬ তাকবিরে পড়া হয়। এটিও ভুয়া পদ্ধতি। কোন সহীহ হাদিস বা জঈফ কোন মারফু হাদীস নাই। কয়েকটি আছার বর্ণিত হয়েছে তা সবগুলি জঈফ। ১৫২ টি সহীহ হাদিস আছে ঈদাইনের নামাজে ১২ তাকবীর দিতে হবে।

তিরমিযিঃ মিনাঃ প্রঃ ২১৭ পৃঃ ৫০৩ নং হাদীস।

৪০। বাংলাদেশে অর্ধছা ফেৎরা এবং টাকা দিয়ে ফিৎরা দেয়ার যে নিয়ম আছে তা একেবারেই ভুয়া। দুইটি অপরাধ করা হয়। হাজার হাজার সহীহ হাদীস আছে এক “ছা” ফিৎরা দিতে হবে এবং প্রধান খাদ্য যেটা তাই দিতে হবে টাকা নয়। বোখাঃ তাওঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ ১৫০৬, ১৫১০ নং হাদীস।

৪১। ১ম ও ৩য় রাকাতে লম্বা টান তাকবির দিয়ে যে ইমাম উঠে তাও ভুয়া। যে ভাবে অন্যান্য তাকবীর দেওয়া হয় সে ভাবেই ১ম ও ৩য় রাকাতে তাকবীর দিয়ে দাড়াতে হবে টান দিয়ে নয়।

বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৭৮৫ নং হাদীস। তিরঃ মিঃ প্রঃ ১৪১ পৃঃ ২৭৯ নং হাদীস।

৪২। দুজন মিলে জামাতে নামাজ পড়ার সময় আর একজন আসলে ইমাম একধাপ সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়মটা একেবারেই ভুয়া। রাসুল (সা) সহ দুজনে নামাজ পড়ার সময় এক সাহাবী নামাজের কাতারে এলে তাদের পিছনে সরিয়ে দিলেন।

এরকম হাজার হাজার ভুয়া মাসলা আছে যা বাংলাদেশের হুজুরদের কাছে প্রতিষ্ঠিত তার কোন প্রমাণ নাই। “ইসলাম আপনার কাছে কি চায়” কিতাবটিতে ১১৫টি বিষয় আলোচনা করা আছে এবং ৩৫টি মাসলায় অনেক রেফারেন্স সহকারে আলোচনা করেছি। আসুন আমরা রাসুল (সা) এর মরে যাওয়া সুন্নাতকে পূর্ণজীবিত করে এবং তা আমল করে এহকালের সফলতা ও পরকালের মুক্তি অর্জন করি। উপরের সঠিক মাসলাগুলো সাধারণ মোসলমান আমল করলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। যে ব্যক্তি উপরের বিষয়গুলো কোরআন ও হাদীসের সাথে মিল করে, নিজে আমল করে মোসলমান ভাইদের মাঝে প্রচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার যা যা দিবেন। (উপরের মাসলাগুলির বিস্তারিত সমাধান পাবেন ইসলাম আপনার কাছে কি চায় নামক গ্রন্থটিতে)

* মোহাঃ আবেদ আলী, ঈশ্বরপুর, রংপুর।

মোবাইল নং ০১৭১৯৪৬৯১৯৪, ০১৯১৯৮৯১৭৫৪

উত্তরদানপূর্ব ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রেরিত রাসুলের মাধ্যমে দীন ও শরীয়তের পূর্ণতা দান করেছেন। এতে না কোনো কিছু সংযোজন হবে আর না কোনো কিছু বিয়োজন ঘটবে। শরীয়তের বিধান সাধারণত দু'ধরনের। এক: মৌলিক তথা কোনো বিষয়ের উপর সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরোপিত বিধান। যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয হওয়া এবং ব্যাভিচার, মদ্যপান, চুরি হারাম হওয়া ইত্যাদি। দুই: শাখাগত তথা শরীয়তের কোনো বিধান বাস্তবায়ন ও কার্যকর জাতীয় বিধান। যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত শাখাগত আনুষঙ্গিক বিধানাবলী।

প্রথম প্রকারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ও মতানৈক্যমুক্ত হলেও দ্বিতীয় প্রকারটির অনেক স্থানেই সাধারণ কিছু মতভেদ ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ জাতীয় ইখতিলাফ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও যৎসামান্য পাওয়ার প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায়।

যেমন বনু কুরাইযার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে সাহাবীদের একাংশ বললেন, এখনই আসরের নামায পড়ে নেয়া উচিত। কেননা, যথাসময়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য একাংশ সাহাবা বললেন, না; বরং আমরা বনু কুরাইযা পৌঁছেই আসরের নামায পড়বো। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। এতে নামায কাযা হয় হোক। এরপর তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্ব স্ব ইজতিহাদ অনুসারে আমল করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি কোনো দলকেই ভৎসনা করলেন না।^(১)

এর কারণ হলো তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ বাস্তবায়নে ইজতিহাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রথম দলের ইজতিহাদ

১ সহীহ বুখারী : ২/৫৯১ হা. নং ৩৯৭২ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত নির্দেশের উদ্দেশ্য দ্রুততার সাথে বনু কুরাইযাতে পৌছা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য এটা হতে পারে না যে, নামাযের সময় হয়ে গেলেও নামায পড়া যাবে না। যেহেতু এটা কুরআনী বিধান লংঘন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাম্য হতে পারে না। তাই পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে নামায পড়ে নেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হবে না। আর দ্বিতীয় দলের ইজতিহাদ ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু জেনে বুঝেই উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন বিধায় কোনো প্রকারের ব্যাখ্যা না করে সরাসরি হুবহু তা পালন করাই হবে উক্ত নির্দেশের সঠিক বাস্তবায়ন।

শরীয়তে ইজতিহাদকারীকে তিরস্কারযোগ্য বা ভ্রান্ত বলা হয়নি; বরং সঠিক ইজতিহাদকারীর জন্য দু'টি প্রতিদান এবং অনিচ্ছাকৃত ভুল ইজতিহাদকারীর জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।^(১) এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজতিহাদকারী দু'দল সাহাবার মধ্য থেকে কোনো দলকেই ভরসনা করেননি।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পরবর্তী সাহাবাযুগ তারপর পর্যায়ক্রমে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনযুগে শাখাগত বিভিন্ন মাসআলায় মতানৈক্য ও ইখতিলাফের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ইমামগণ সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষের বৃহৎ দীনি কল্যাণ ও শরীয়তের উপর সহজে চলার পথ সুগম করতে বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ কাজের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ইমামকুল শিরোমনি ইমাম আবু হানীফা রহ.। তিনি স্বয়ং নিজে যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও আলাদাভাবে চারশ ফকীহদের সমন্বয়ে একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করেন। এদের মধ্যে চল্লিশজন ছিলেন বিশেষভাবে নির্বাচিত। আর এ চল্লিশজনের মধ্যে দশজন ছিলেন প্রথমসারির মুজতাহিদ ফকীহ, যাদের একেক জন হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, যুক্তিবিদ্যা, অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় ইমাম ছিলেন। এঁদের কাজ ছিলো, সাহাবাযুগ থেকে চলে আসা ইখতিলাফী মাসাইল এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য

সম্ভব্যপ্রায় বিভিন্ন মাসআলা কুরআন, হাদীস, তাআমুলে সাহাবা, ইজমা, কিয়াস ও ইস্তিহসানের কষ্টি পাথরে যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত একটি ফিকহী সংকলন তৈরী করা। যাতে সাধারণ মানুষ ইখতিলাফের বিস্তীর্ণ মাঠের গোলকধাঁধায় আটকে না পড়ে সহজে শরীয়াহ মতে চলতে পারে। প্রথম প্রথম এ ধারা বিভিন্ন ফকীহ চালু করলেও পরবর্তীতে এসে মাত্র চারজন ফকীহর ফিকহী সংকলনই অবশিষ্ট ও বহাল তবীয়তে চলতে থাকে। এ চারজন ফকীহ হলেন, ইমাম আবু হানীফ রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.। এদের মাযহাবের নাম যথাক্রমে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। এছাড়া বাকী সব ইমামদের ফিকহী সংকলন ও মাযহাব কিছুকাল পর্যন্ত চলে কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। আর উক্ত মাকবুল চারটি মাযহাব শতাব্দি, সহস্রাব্দি পার করে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

এরপর হঠাৎ করে একটি নতুন দলের উদয় হলে; বরং বলা যায় দীর্ঘ তেরোশ বছর যাবত ঘুমিয়ে ছিলো তারপর শয়তানের ধাক্কায় ঘুম থেকে জেগে উঠলো। দেখলো, মানুষ স্বাচ্ছন্দে দীনের উপর চলছে। তেমন কোনো হট্টগোল বা মতবিরোধ নেই। প্রত্যেকে স্ব স্ব মাযহাব অনুসারে আমল করে যাচ্ছে। ভাবলো, এটা হতে দেয়া যায় না; একটা হট্টগোল বাধাতেই হবে। শ্লোগান উঠলো- কুরআন-হাদীসের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো। সহীহ হাদীস মানতে হবে আর সবকিছু ছাড়তে হবে। সাহাবী-ফকীহ মানি না, ইজমা-কিয়াস বুঝি না। তারা নিজেদের নাম দিলো আহলে হাদীস। বাস্তবিকই আহলে হাদীস বটে! ('হাদীস' শব্দের একটি অর্থ নতুন/নব। সুতরাং এ অর্থানুসারে 'আহলে হাদীস' অর্থ দাঁড়ায় নবউদ্ভাবিত) এদের কাজ হলো, উম্মাহর মাঝে দীর্ঘ তেরো-চৌদ্দশ বছর যাবত নিরবচ্ছিন্নধারায় চলে আসা প্রমাণভিত্তিক স্বীকৃত আমলকে ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলে জনমনে একপ্রকার সংশয় সৃষ্টি করে নব ফেতনার দ্বার উন্মোচন করা।

বিশেষত বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের সিংহভাগ মানুষ হানাফী হওয়ায় হানাফী মাযহাবের প্রতি তাদের বিদ্বেষীভাব যেনো জন্মগত স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। হানাফী মাযহাবের কোনো মাসআলা পেলে তার বিরোধিতা করাটাই যেনো তাদের মূলনীতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে চলে আসা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিভিন্ন আমল ও পদ্ধতিকে শুধু হানাফী

মাযহাবের মাসআলা হওয়ায় তারা ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলে প্রচার করছে। তাদের তো এতোটুকু ভয় থাকা উচিত ছিলো যে, তারা যে আমলগুলোকে ভুয়া বলে প্রচার করছে তা হয়তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিংবা তাঁর সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও অনুসরণীয় তাবেয়ীদেরই ফতোয়া ও আমল। সুতরাং এতে প্রকারান্তরে তাঁদের আমলকেই ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলা হচ্ছে না? এটা কতো বড় ধৃষ্টতার শামিল!!

আমাদের পূর্বসূরী আসলাফের মধ্যে ইখতিলাফ ছিলো সত্য, তাই বলে তাঁরা পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি। কখনো তারা একে অন্যের মতকে ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলেননি। কেননা, ইখতিলাফী ও মুজতাহাদ ফীহ (মতানৈকপূর্ণ) মাসআলায় কারো রায় বা মতকেই নিশ্চিতভাবে সঠিক বা ভুল বলার অবকাশ নেই। যে কারো মত সঠিক হতে পারে এবং যে কারো মত ভুল হতে পারে। সুতরাং একটিকে সঠিক আখ্যা দিয়ে অন্যটিকে নিশ্চিতভাবে ভুল বলা চরম হঠকারিতা বৈ কিছু নয়। আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায় যাদেরকে ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে করে সেই ইমাম ইবনে হযম রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওযিয়া রহ., আল্লামা শাওকানী রহ.-সহ প্রমূখ ইমামগণও এসকল ইখতিলাফী ও মুজতাহাদ ফীহ মাসআলে যে কারো মত সহীহ হতে পারে এবং কারো মতকেই ভুল বলা যাবে না বলে যে ইনসাফপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন তার যৎসামান্যও কি এ সকল আহলে হাদীস নামধারীদের মাঝে পাওয়া যায়?

আরেকটি কথা না বললেই নয় যে, এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের সহীহ ও যঈফ হাদীস নির্ণয়ের পদ্ধতি বড় আশ্চর্যজনক। প্রথমত: সহীহ হওয়ার অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো, হাদীসটি বুখারী বা মুসলিমের হতে হবে। এর বিপরীত ভিন্ন সনদে অন্য কোনো কিতাবে কোনো হাদীস পাওয়া গেলে তা যঈফ হবে। যদিও উক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসটি বুখারী বা মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হোক। দ্বিতীয়ত: যে হাদীসটি তাদের স্বীয় দাবীর পক্ষে হয়; যদিও তা বুখারী বা মুসলিমের হাদীস না হোক এবং সনদের বিচারে হাদীসটি যঈফ হোক। তৃতীয়ত: তাদের মান্যবর মহান ইমাম আলবানী সাহেব যেটাকে সহীহ বলেছেন সেটি সহীহ এবং যেটাকে যঈফ বলেছেন সেটা যঈফ। যদিও ইমাম বুখারী রহ., ইমাম রাযী রহ., ইমাম ইবনে মাজীন রহ.-সহ প্রমূখ ইমামগণ এর বিপরীত বলে থাকেন। কতো ইলম দৈন্যতার পরিচয়!

যাই হোক, এ বিষয়ে কথা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কিছুদিন পূর্বে লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত একটি লিফলেট হাতে আসে। আমি অবাক হয়ে দেখতে পেলাম, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন আমল ও পদ্ধতিকে ঢালাওভাবে ভুয়া ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্থানে স্থানে বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে মাযহাব ও মাযহাবসিদ্ধ আমলগুলোর ব্যাপারে সংশয় ও অনাস্থা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। অথচ উদ্ধৃতি মতো বুখারীর সেসব হাদীস তাদের দাবীর পক্ষে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন নয়। কিন্তু ধোকা দেওয়ার ইনস্কার্বে সবার আস্থাযোগ্য বুখারীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কোনো আমল নয়; বরং সাধারণ মানুষের কিছু ভুল ও উদাসীনতাকেই হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত ভুয়া আমল বলে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। উদ্ধৃতিপ্রদানেও অনেক ভুলভ্রান্তি ও গড়বড় করা হয়েছে। লিফলেটটির শুরুতে পরোক্ষভাবে এ দাবী করা হয়েছে যে, তাদের মত ও পথই একমাত্র ইসলাম। এ ভিন্ন অন্যান্য মতের অনুসারীরা হাদীসবিরোধী হওয়ায় মুসলিম নয়; বরং জাহান্নামী!!

আফসোস! এ নবউদ্ভাবিত দলটি যদি আরো আগে অস্তিত্ব লাভ করতে তাহলে হয়তো কোটি কোটি বনী আদম তাদের অনুসারী হয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারতো! নতুবা তাবেয়ীযুগ থেকে তেরোশ হিজরী পর্যন্ত মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমান সহীহ হাদীস না মানায় জাহান্নামী হয়ে গেলো যে! আল ইয়াযবিল্লাহ (আল্লাহর পানাহ)! এই তো হলো এদের অবস্থা।

সঙ্গত কারণেই ইচ্ছা না থাকলেও কলম ধরতে হয়। ঈমানের দাবীতেই তাদের অভিযোগগুলোর সঠিক জবাব দান করতে হয়। যাতে সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্ট দ্বিধা-সংশয় দূর হয়, তাদের ঈমান-আমল ঠিক হয় এবং সত্যানুসঙ্গী ইনসাফপ্রিয় লা-মাযহাবী ভাইদের সুমতি ও হিদায়াত পাওয়ার পথ সুগম হয়। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী।

আর যেহেতু প্রচারিত লিফলেটটি ভ্রান্ত একটি দলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তাই তাদের লেখায় থাকা ভুলভ্রান্তি সহকারেই প্রকাশ করা হলো, যেনো পাঠকমহল বুঝতে পারে যে, কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে দৈন্যতার পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতায়ও তারা কতো দুর্বল!

আডরা ংখন পৰ্যায়ক্রডে হানারীদেৱ ংপর আরোপিত বিয়াল্লিশটি প্রশ্নেৱ যথারীতি খণ্ডন ং হানারীদেৱ পক্ষের প্রডাণাদি নিয়ে আলোচনা করবো। পূর্বে লিফলেটটির পূর্ণ কপি ংল্লেখ করা হলেং আলোচনার বিষয়বস্তু সহজলভ্য করার ংদ্দেশ্যে আডরা বিয়াল্লিশটি পাঠ তৈরী করবো। প্রত্যেকটি পাঠের সাথে লিফলেটে বর্ণিত প্রশ্নটি পুনরায় ংল্লেখপূর্বক মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে ংকটি শিরোনাম রাখবো। সর্বশেষ ংকটি পরিশিষ্ট বা ংপসংহার টেনে রচনাটির ইতি টানবো। আল্লাহ তাআলা কাজটি আমাদের জন্য সহজ করুন ংবং ংটিকে কবুল করুন। আমীন!

১ম পাঠ: (গোসলের ফরয সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

গোসলের তিন ফরয আমরা জানি তা ভূয়া। উত্তম রূপে রাসূল সাঃ এর পদ্ধতিতে গোসল করতে হবে। সূরা মায়েদা ৬ নং আয়াতে তিন ফরয বলা নাই।

উত্তর:

গোসলে তিন ফরযের বিষয়টি ভূয়া নয়; বরং তা কুরআন ও তাফসীর, হাদীস ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (১)

অর্থাৎ আর যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো।

এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন যে, আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র অনুপাতে فَاطَّهَّرُوا শব্দটিতে মুবালাগা তথা অতিশয়োক্তি জোরদানের অর্থ রয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। এক: উত্তমরূপে কুলি করা। দুই: ভালোভাবে নাকে পানি পৌঁছানো। তিন: সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

যেমন বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলুসী রহ. বলেন:

(فاطهروا) أى اغسلوا على أتم وجهه وقرئ (فاطهروا) أبدانكم. والمضمضة والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن؛ لأنه سبحانه أضاف التطهير إلىسمى الواو وهو جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن إليه إلا ما فيه

حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولا حرج في داخل الفم والأنف
فيشملهما نص الكتاب من غير معارض^(১)

অর্থাৎ ফাটহরো অর্থ ভালো ও পরিপূর্ণরূপে গোসল করো। আর অন্য একটি কিতাবের বর্ণনায় ফাটহরো এসেছে, যার অর্থ তোমরা তোমাদের শরীরকে পবিত্র করো। এখানে সমস্ত শরীর ধৌত করার মতো ভালোভাবে কুলি করা ও নাকে পানি পৌঁছানোও ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র করা ক্রিয়াটিকে ও সর্বনামের সত্ত্বা তথা প্রত্যেক মুকাল্লাফের সম্পূর্ণ শরীরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, বিধায় পানি পৌঁছাতে কষ্ট হয় না যথা চোখের আভ্যন্তরীণ অংশ এমন ছান ছাড়া শরীরের যতোটুকু অংশে পানি পৌঁছানো যায় সব এর অন্তর্ভুক্ত হবে। চোখের ভিতরাংশে পানি পৌঁছাতে কষ্টকর হওয়ায় তা ধৌত করার আবশ্যকীয়তা থাকবে না। আর মুখ ও নাকের ভিতরাংশে পানি পৌঁছাতে কোনো কষ্ট না হওয়ায় কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা কুরআনের মূল নস (পাঠ) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী রহ. লিখেন:

(فاطهروا) أمر بالمبالغة في التطهير فيجب غسل سائر البدن ويجب المضمضة والاستنشاق أيضا أمثالا للمبالغة بالتطهير. فإن باطن الفم والخيشوم ظاهر البدن من وجه إذا انفتح وباطنه إذا انضم فألحقنا في الغسل بالظاهر رعاية للمبالغة.^(২)

অর্থাৎ ফাটহরো শব্দটি পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে জোরদানমূলক আমার তথা নির্দেশসূচক ক্রিয়া। সুতরাং পুরা শরীর ধৌত করা আবশ্যিক এবং ভালোভাবে কুলি করা ও নাকে পানি পৌঁছানোও আবশ্যিক, পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে জোরদানের অর্থ বাস্তবায়নকল্পে। কেননা, মুখ এবং নাকের ভিতরাংশটি তা (মুখ ও নাক) খোলা থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরের বহিরাংশ বলে বিবেচিত হয়। (সুতরাং মুখ ও নাকের ভিতরাংশ ধোয়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার মতো ফরয হওয়া চাই।) আবার তা বন্ধ ও মিলিয়ে রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরের ভিতরাংশ বলে মনে হয়। (সুতরাং মুখ ও নাকের

১ তাফসীরে রুহুল মাআনী : ৪/১০৮ (আলা মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, কায়রো)

২ তাফসীরে মাযহারী : ৩/৮৮ (যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ)

ভিতরাংশ ধোয়া ফরয না হওয়া চাই যেমনিভাবে শরীরের অন্যান্য ভিতরাংশ ধোয়া ফরয নয়।) তাই আমরা গোসলের ক্ষেত্রে নাক ও মুখকে মুবালাগা (জোরদান) এর দিকে তাকিয়ে শরীরের বহিরাংশ বলে গণ্য করলাম। (কারণ, এখানে মুখ ও নাককে শরীরের বহিরাংশ গণ্য করে তা ধোয়া আবশ্যিক না বললে মুবালাগা অনুসারে আমল হয় না। অথচ কুরআনে মুবালাগায়ুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিধায় কুরআনের অর্থ সঠিকভাবে করলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, গোসলের সময় সমস্ত শরীর ধৌত করার মতো মুখ ও নাকে পানি দেয়াও ফরয।)

উপরোক্ত দু'টি তাফসীরগ্রন্থের যুক্তিযুক্ত ও সহীহ তাফসীর থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, গোসলে তিন ফরয। এক: কুলি করা। দুই: নাকে পানি দেয়া। তিন: সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা। অজ্ঞ ও একগুঁয়ে ছাড়া কেউ উক্ত অনুধাবনটি অস্বীকার করতে পারবে না। হ্যাঁ, এখানে হয়তো কেউ বলতে পারে, কুরআনে তো তিন শব্দ উল্লেখ নেই বিধায় তিন ফরয বলার বিষয়টি ভুয়া। কিন্তু এটা অত্যন্ত মোটা ও বোকাসূলভ প্রশ্ন। কারণ, কুরআন কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয় যে, এখানে সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করবে। এরকম করলে তো কুরআন শত শত খণ্ডের বিশাল এক ভাণ্ডার হয়ে যেতো। এরা কি দেখে না যে, অযুর ফরয চারটি সবাই বলে অথচ কুরআনে চার শব্দ উল্লেখ নেই? কুরআন হলো বুঝার জিনিস, অনুধাবন করার গ্রন্থ, মুফাসসিরগণ যা তাফসীর গ্রন্থদিতে লিখে গিয়েছেন।

হাদীসগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলেও দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয গোসলের সময় সর্বপ্রথম লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধৌত করে হাতে পানি নিয়ে ভালোভাবে কুলি করতেন। এরপর নাকে পানি পৌঁছাতেন। এরপর মাথায় পানি ঢেলে পুরা শরীর ধৌত করতেন।

যেমন বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (১)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (ফরয গোসলের) জন্য পানি রাখলাম। তারপর একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করলাম। আর তিনি দু'হাতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করলেন। এরপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাহান ধুলেন। তারপর হাত মাটিতে মেরে মাসাহ করে ধুয়ে ফেললেন। এরপর ভালোভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এবং চেহারা ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথায় পানি ঢেলে পুরা শরীরে পানি পৌঁছে দিলেন। এরপর (জায়গা থেকে কিছুটা) সরে এসে পা ধুলেন।

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ছাড়াও সহীহ মুসলিম^(২), সুনানে আবু দাউদ^(৩), সুনানে তিরমিযী^(৪), সুনানে ইবনে মাজাহ^(৫) ও সুনানে দারেমী^(৬)-তেও বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায়, গোসলের সময় মুখে ও নাকে পানি দিতে হবে। সুতরাং গোসলের তিন ফরযকে অস্বীকার করে যারা কুলি করে না ও নাকে পানি দেয় না তাদের গোসলও শুদ্ধ হয় না, নামাযও শুদ্ধ হয় না।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেযে হাদীস আল্লামা আইনী রহ. বলেন:

وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرَكْهُمَا، قَدْ لَّ عَلَى الْمُوَظَّيَةِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى الْمُوَظَّيَةِ؟ قُلْتَ: عَدَمُ النَّقْلِ عَنْهُ بِتَرْكِهِ إِيَّاهُمَا. (৭)

১ সহীহ বুখারী : ১/৪১ হা. নং ২৭৬ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ সহীহ মুসলিম : ১/১৪৭ হাদীস নং ৩১৭ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

৩ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩২ হাদীস নং ২৪৫ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

৪ সুনানে তিরমিযী : ১/২৯ হাদীস নং ১০৩ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৫ সুনানে ইবনে মাজাহ: পৃ. নং ৪৩ হাদীস নং ৫৭৩ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৬ সুনানে দারেমী : ১/১৩৭ হাদীস নং ৭৫০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৭ উমদাতুল কারী : ৩/২০৬ অধ্যায় নং ৭ (দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত)

অর্থাৎ এ হাদীসে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিষয়টি পরিষ্কার। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি কাজ কখনো ছেড়ে দিতেন না বিধায় তা নিরবচ্ছিন্নতার সাথে করেছেন বলে বুঝা যায়। সুতরাং এতে তা আবশ্যকীয়তার প্রমাণ হয়। যদি তুমি প্রশ্ন করো, নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ কী? আমি বলবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা ছেড়ে দেয়া সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা না থাকাই দলীল।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও বর্ণিত আছে যে, ফরয গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া জরুরী। তা না করলে বা করতে ভুলে গেলে গোসল শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না তা আদায় করবে। অর্থাৎ গোসলের পরে হলেও কুলি ও নাকে পানি দিতে হবে।

যেমন সুনানে দারা কুতনীতে এসেছে:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْفَةَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: نَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاءَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةِ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ ابْنُ عُرْفَةَ: إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةِ انْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ (৮)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি জানাবাত তথা অপবিত্রতার কারণে গোসল (ফরয) হয়ে থাকে তাহলে (কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ভুলে গেলে) নতুন করে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে এবং (এ গোসলে আদায়কৃত) নামায পুনরায় শুরু করবে। আর ইবনে আরাফা (ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কথার ব্যাখ্যায়) বলেন, (গোসলকারী) যখন কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ভুলে যাবে, যদি গোসল অপবিত্রতার কারণে (ফরয) হয়ে থাকে তাহলে সে ফিরে যাবে এবং কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে (পূর্বের আদায়কৃত) নামায পুনরায় পড়ে নিবে।

এরপরে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ صَالِحٍ نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُعِيدُ
فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ. (১)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অপবিত্রতার গোসলে (কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ভুলে গেলে) তা (পূর্বে আদায়কৃত নামায) পুনরায় পড়ে নিবে। অবশ্য অযুর ক্ষেত্রে হলে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (কারণ, অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয নয়।)

একটি মুরসাল বর্ণনায় নাকে পানি দেয়ার নির্দেশ এসেছে। হাদীসটি হলো:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
نَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالِاسْتِنْشَاقِ
مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا. (২)

অর্থাৎ ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসলে তিনবার নাকে পানি পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছেন।

এ হাদীসটি মুরসাল হলেও এর সনদ সহীহ।^(৩) যেহেতু মুরসাল হাদীস জমহুরের নিকট হুজ্জত ও প্রমাণযোগ্য; বিশেষত ইবনে সীরীন রহ এর মুরসাল মুহাদ্দিসীনদের নিকট সন্দেহাতীতভাবে সহীহ ও প্রমাণযোগ্য।^(৪)

মুরসাল বলা হয়, সাহাবীর নাম উল্লেখ ব্যতীরেকে তাবেয়ী কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত হাদীসকে। মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের বক্তব্যানুসারে মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার মতটিই অধিক শক্তিশালী। তবে তাবেয়ীদের মধ্য হতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ., ইবরাহীম নাখয়ী

৩ প্রাণ্ডক্ত : ১/২০৮ হাদীস নং ৪১২

২ প্রাণ্ডক্ত : ১/২০৭ হাদীস নং ৪১০

৩ ইলাউস সুনান : ১/২১৫ হাদীস নং ১৫৪ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৪ প্রাণ্ডক্ত : ১/২১৩ হাদীস নং ১৫২ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রহ., মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ.-সহ শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন তাবেয়ীর বর্ণিত মুরসাল হাদীস সকল উলামায়ে কিরামের মতেই প্রমাণযোগ্য। এতে উল্লেখযোগ্য কারো দ্বিমত নেই।

ইমাম ইবনে আ. বার মালেকী রহ. স্বীয় আত তামহীদে বলেন:

وَكُلُّ مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَذْلِيلُهُ وَمُرْسَلُهُ مَقْبُولٌ. فَمَرَّاسِيلُ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ^(৫)

অর্থাৎ যেসকল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে জানা যাবে যে, সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করে না তার মুদাল্লাস (হাদীসের সনদে স্বীয় শাইখের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত বর্ণিত হাদীস) ও মুরসাল গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ., ইবরাহীম নাখয়ী রহ. ও মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. এর মুরসাল বর্ণনাগুলো মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ বলে স্বীকৃত।

সুতরাং প্রমাণযোগ্য এ হাদীসে অপবিত্রতার গোসলে নাকে পানি পৌঁছানোর আদেশ থাকায় তা ফরয বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু আদেশসূচক ক্রিয়া বা আদেশ থেকে ফরযই প্রমাণিত হয়। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া যেহেতু ওৎপোড়িতভাবে একটা অপরটার সাথে জড়িত তাই নাকে পানি পৌঁছানো ফরয প্রমাণিত হলে কুলি করাও ফরয প্রমাণিত হবে।

যদি কেউ একগুঁয়েমি করে মুরসাল হাদীসকে প্রমাণযোগ্য মানতে না চায় এবং নাকে পানি পৌঁছানো ফরয হওয়ায় কুলি করাও ফরয হওয়ার বিষয়টি বুঝতে না চায় তার জন্য পৃথক প্রমাণও রয়েছে।

সরাসরি মারফূ একটি বর্ণনায় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া উভয়টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসটির সনদও সহীহ।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَ نَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكْرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَا: نَا أَحْمَدُ

৫ আত তামহীদ : ১/৩০ মুকাদ্দামা- (অযারাতু উম্মিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, মাগরিব)

بُنْ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (অপবিত্রতার গোসলে) কুলি করতে ও নাকে পানি পৌছাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ, যা পালন করা সবার জন্য আবশ্যিক। ইমাম দারা কুতনী রহ. এ হাদীসের পরে ভিন্ন সনদে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যদিও এখানে এ কথা বলেছেন যে, হাম্মাদ রহ. থেকে এ দু'জন ছাড়া অন্যরা মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সনদগত কোনো দুর্বলতা দেখাতে পারেননি।

আমরা বলবো, এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এটা হতে পারে যে, হাম্মাদ রহ. হাদীসটি মারফু ও মুরসাল উভয়ভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ছাত্র যেমন শুনেছে সে পরবর্তীতে তেমনই তা বর্ণনা করেছে। বিধায় এতে কোনো অসুবিধা বা সাংঘর্ষিকতা নেই।

কুরআনের আয়াত, তার সঠিক অর্থ, তাফসীর, হাদীস ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, ফরয গোসলে পুরা শরীর ধোয়ার মতো কুলি করা ও নাকে পানি পৌছানোও ফরয বা আবশ্যিক। এ ফরযকে অস্বীকার করে যারা ফরয গোসলে কুলি করে না, নাকে পানি পৌছায় না তাদের না পবিত্রতা অর্জন হয় আর না এ গোসলে নামায শুদ্ধ হয়। সুতরাং একটা প্রতিষ্ঠিত আমলকে ভুয়া ভুয়া না বলে এর দালীলিক পর্যালোচনাও দেখা উচিত ছিলো বলে মনে করি। আর ইনসাফপ্রিয় যে কোনো লা-মাযহাবী ভাই এ প্রমাণগুলো দেখলে আশা করি সঠিক পথ ও মতে ফিরে আসবে।

মূলত এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ আরো অনেক রয়েছে। শুধু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ.

স্বীয় মুসান্নাফে অনেক হাদীস ও আসার এনেছেন, যা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এভাবে আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে বিভিন্ন হাদীস এনে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন।

একটি কিয়াস বলে এ অধ্যায়ের ইতি টানছি। আমরা জানি, জুনুবী অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তির মুখে তিলাওয়াত করা নিষেধ; যেমনিভাবে তার হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ। এতে বুঝা যায়, হাত ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মুখের ভিতরাংশও নাপাক থাকে। সুতরাং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মুখের ভিতরাংশ ধোয়া তথা কুলি করা আবশ্যিক হবে। পক্ষান্তরে মুহদিস তথা অযুহীন ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ হলেও মুখে তা তিলাওয়াত করতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে বুঝা যায়, মুহদিসের মুখ নাপাক হয় না। তাই অযুতে কুলি করাও আবশ্যিক নয়।

সুতরাং কুরআন, হাদীস, তাফসীর, সাহাবীদের বাণী ও কিয়াস সবকিছু দ্বারাই প্রমাণিত হলো যে, ফরয গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার মতোই আবশ্যিক।

২য় পাঠ: (তায়াম্মুমের ফরয সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি সেটিও ভূয়া। তায়াম্মুমের ফরজ হল ২টি দেখুন সূরা মায়েরদা ৬ নং আয়াত।

উত্তর:

হানাফী মাযহাব অনুসারে তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। এক: পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। দুই: উভয় হাত মাটিতে মেরে পুরো মুখমণ্ডল মাসেহ করা। তিন: উভয় হাত মাটিতে মেরে কুনই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করা।

এ মাসআলাটি ভূয়া নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (১)

অর্থাৎ এরপর যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে তোমরা (পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে) পবিত্র মাটি ব্যবহারের ইরাদা করো। এরপর মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো মাসেহ করো। (অনুবাদ- মাআরিফুল কুরআন, (উর্দু) মূফতী শফী রহ.)

কই? তায়াম্মুমের তিন ফরয ভূয়া হলো কীভাবে? কুরআনই তো বলছে, পানি না পাওয়া গেলে মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের ইরাদা করতে হবে। আর মনের ইরাদা বা ইচ্ছাকেই তো নিয়ত বলা হয়। সুতরাং নিয়তের বিষয়টি কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। আর বাকী দু'টি ফরয তথা সমস্ত মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করার বিষয় তো আরো সুস্পষ্ট। বুঝা গেলো, তায়াম্মুমের তিন ফরয সঠিক।

আল্লামা ইবনে মানযূর রহ. লিসানুল আরবে বলেন:

وَتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ لِلصَّلَاةِ - وَأَصْلُهُ التَّعَمَّدُ وَالتَّوَخَّى مِنْ قَوْلِهِمْ تَيَمَّمْتُكَ وَتَأَمَّمْتُكَ. قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" أَيْ اقْصِدُوا

لَصَعِيدٍ طَيِّبٍ. ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى صَارَ التَّيَمُّمُ اسْمًا عَلَمًا
لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ. (২)

অর্থাৎ (আরবী ভাষায় বলা হয়,) আমি নামাযের জন্য মাটি ব্যবহারের ইচ্ছা করেছি। তৈম্ম এর মূল অর্থ ইচ্ছা করা, নিয়ত করা। আরববাসী বলে, تَأَمَّمْتُ আমি তোমার ইচ্ছা করেছি এবং تَأَمَّمْتُ আমি তোমাকে ইরাদা করেছি। ইবনুস সীকীত রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا এর অর্থ পবিত্র মাটির ইরাদা করো। এরপর এটি এতো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে যে, একপর্যায়ে তায়াম্মুম শব্দটি নির্দিষ্ট একটি বিশেষ্য নামে রূপান্তরিত হয়েছে, যা মাটি দ্বারা দু'হাত এবং চেহারা মাসেহ করা বুঝায়।

আভিধানিকভাবে এবং আরবদের ব্যবহাররীতি দেখেও বুঝা যায় যে, স্বয়ং তায়াম্মুম শব্দের মধ্যেই নিয়ত ও ইরাদার অর্থ রয়েছে। এটা এতোই সুস্পষ্ট যে, এরজন্য পৃথকভাবে কিছু বলতে হয় না। বিধায় তায়াম্মুমে নিয়তের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করা আরবী ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। নিয়তের বিষয়টি অবশ্য হাদীস দ্বারাও প্রমানিত।

সহহি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَى. (৩)

অর্থাৎ উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেকটি কাজ

২ লিসানুল আরব : ১/২৫৪ (দারুত তাওফীকিয়া লিভুরাস, কায়রো)

৩ সহীহ বুখারী : ১/২ হাদীস নং ১ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বীয় নিয়ত অনুসারেই ফলাফল রয়েছে। (ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে খারাপ)

এ হাদীস দ্বারা ফুকাহায়ে কিরাম ইবাদাতের জন্য নিয়তকে আবশ্যিক বলেছেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়তের আবশ্যকীয়তা এ হাদীস থেকেই প্রমাণিত। তায়াম্মুমও যেহেতু একটি ইবাদাত তাই এতেও নিয়তের আবশ্যকীয়তা রয়েছে। তায়াম্মুম নামায রোযার মতো ইবাদাতে মাকসূদা (মৌলিক ইবাদাত) না হলেও এটা যেহেতু পবিত্রতা অর্জনে স্বাভাবিক পন্থাবিরোধী ব্যতিক্রম একটি ব্যবস্থা (কেননা, পানি দ্বারাই স্বাভাবিক নিয়মে পবিত্রতা অর্জন করা যায়, মাটি দ্বারা নয়; বরং মাটি দ্বারা তো শরীর আরো ময়লা হওয়ার কথা) তাই এক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী অনুভূত হয়। সুতরাং নিয়তের মাধ্যমেই একমাত্র মাটি দ্বারা মাসেহ করাকে পবিত্রতার মাধ্যম বলে গণ্য করা সম্ভব। নিয়ত না করে সারাদিন মাটিতে গড়াগড়ি করলেও পবিত্রতা অর্জিত হবে না।

এটা তো গেলো নিয়তের আলোচনা। বাকী মুখমণ্ডলের মাসেহ করা নিয়েও কোনো সমস্যা ও ইখতিলাফ নেই। সমস্যা হলো হাত মাসেহ করা নিয়ে। লামাযহাবীগণ শুধু কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। এর বিপরীত আমাদের নিকট হাত কুনই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

ইমাম দারা কুতনী রহ. এবং ইমাম হাকিম নীশাপুরী রহ. বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا: نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ نَا عَثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثَنَا جَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ
عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: التَّيْمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (১)

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুম হলো চেহারা মাসেহ করার জন্য একবার(মাটিতে) হাত মারা এবং কনুই পর্যন্ত হাতদ্বয় মাসেহ করার জন্য আরেকবার (মাটিতে) হাত মারা।

১ সুনানে দারা কুতনী : ১/৩৩৫ হাদীস নং ৬৯১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

ইমাম দারা কুতনী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন:

رَجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. (২)

এর সবগুলো বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। অবশ্য হাদীসটি মাওকুফ (সাহাবীর হাদীস) হিসেবেই সঠিক।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّشٍ أَلْعَدْلُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: اضْرِبْ هَكَذَا وَضَرْبَ يَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرْبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهَمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (৩)

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট) এসে বললো, আমি অপবিত্র হওয়ায় (তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে) মাটির মধ্যে গড়াগড়ি খেয়েছি। তখন তিনি বললেন, এভাবে হাত মারো। অতঃপর তিনি মাটিতে দু'হাত মারলেন। এরপর স্বীয় চেহারা মাসেহ করলেন। এরপর মাটিতে আবার হাত মেরে কুনই পর্যন্ত হাত মাসেহ করলেন।

ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পূর্বে বলেন:

وَقَدْ رَوَيْنَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (৪)

অর্থাৎ বিশুদ্ধ সনদে জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসের ভাবার্থ আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে।

২ প্রাপ্ত

৩ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/২৮৮ হাদীস নং ৬৩৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত),

সুনানে বাইহাকী : ১/৪২৩ হাদীস নং ৯৯৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৪ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/২৮৮ হাদীস নং ৬৩৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

হাফেয যাহাবী রহ. তালখীসে বলেন:

صَحِيحٌ. (১)

অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ

এ দু'টি মারফু হাদীস ছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, হাত কুনই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। এছাড়া মাওকুফ হাদীসও অনেক আছে। তন্মধ্যে থেকে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসই বেশী প্রসিদ্ধ।

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيُونُسُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: التَّيْمَمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (هذا قد صححه البيهقي.) (২)

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন তায়াম্মুম হলো দু'বার হাত মারার নাম। একবার চেহারার জন্য হাত মারা এবং দ্বিতীয়বার কনুই পর্যন্ত হাতের জন্য হাত মারা। ইমাম বাইহাকী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى. (৩)

অর্থাৎ ইমাম মালেক রহ. নাফে রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) তিনি ও আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা জুরুফ থেকে আসছিলেন। যখন মিরবাদে পৌঁছলেন তখন (সওয়ারী থেকে) নেমে পড়লেন।

১ আভালখীস মাআ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/২৮৮ হাদীস নং ৬৩৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত), আত তালীক আলা সুনানি বাইহাকী : ১/৪২৩ হাদীস নং ৯৯৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৪২২ হাদীস নং ৯৯৭ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৩ মুআত্তা মালেক: পৃ: নং ১৯ হাদীস নং ১৭৬ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ঢাকা)

এরপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে গিয়ে তিনি প্রথমে পুরা চেহারা মাসেহ করলেন এরপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত মাসেহ করলেন। এরপর নামায পড়লেন।

বর্ণনাটি সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ। যে হাদীসের রাবী ইমাম মালেক রহ., নাফে রহ. ও ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর মতো লোক হবে তা শুধু সাধারণ সহীহই নয়; বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ বলে মুহাদ্দিসদের নিকট বিবেচিত। হাদীসটি মাওকুফ হলেও বিষয়টি যেহেতু ইবাদত সংক্রান্ত, যেথায় কোনো ধরনের কিয়াস ও অনুমান চলে না বিধায় তা মারফুর পর্যায়ভূক্ত। অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনেই এমনটি করেছেন। যেমন অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায়। সুতরাং কনুই পর্যন্ত মাসেহ করাটাই সহীহ ও অবশ্যক।

যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও বুঝা যায়, হাতের মাসেহ কনুই পর্যন্ত করাই নিরাপদ পন্থা। কেননা তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, মাসেহ কজ্জি পর্যন্ত করাটাই জরুরী, কনুই পর্যন্ত নয়; তথাপি কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলে তো কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ অবশ্যই হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাস্তবিক যদি কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা জরুরী হয় (আর এটা বাস্তবিকই) তাহলে কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ করলে তো কনুই পর্যন্ত মাসেহ হচ্ছে না বিধায় এতে করে তায়াম্মুমও সহীহ হচ্ছে না। বুঝা গেলো, যারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করে তায়াম্মুম করে তাদের তায়াম্মুম সবার নিকটেই সহীহ হবে আর যারা কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ করে তায়াম্মুম করে তাদের তায়াম্মুম সবার নিকট সহীহ হয় না। তাই কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করাটাই নিরাপদ নয় কি?

যে আমাদের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে লামাযহাবীগণ হাত কজ্জি পর্যন্ত মাসেহ করার প্রবক্তা, সে আমাদের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার কথাও তো বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর হাদীস দিয়ে এককভাবে কজ্জি পর্যন্ত হাত মাসেহ করার প্রমাণ পেশ করার কোনো অবকাশ নেই।

মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হয়েছে:

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِسْحَاقَ يَتَقَارِبُونَ فِي حَدِيثِهِمْ كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ. فَأَمَرْنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (১)

قال الحافظ في الدراية : أخرجه البزار باسناد حسن. (২)

অর্থাৎ আমাদের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক সফরে) আমরা পানি না পাওয়ায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি লোকদের (সাহাবীদের) সাথেই ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলে আমরা চেহারার জন্য একবার (মাটিতে হাত) মারলাম এবং কনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য আরেকবার (হাত) মারলাম।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. আদিরায়াতে বলেন, হাদীসটি ইমাম বাযরার রহ. হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

১ মুসনাদে বাযযার: ৪/২২১ হাদীস নং ১৩৮৪ (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা)

২ আদিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া (হেদায়া কিতাবের টিকায় সংযোজিত) :

১/৫০ আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৩য় পাঠ: (অযুর ফরযের সংখ্যা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

ওযুর ফরয চারটি সঠিক। দেখুন সূরা মায়েদা ৬ নং আয়াতে।

উত্তর:

হ্যাঁ, অযুর ফরয চারটি এতে কোন ইখতিলাফ বা মতভেদ নেই। দলমত নির্বিশেষে সবার নিকটই তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই এটা বোধগম্য হচ্ছে না যে, বাংলাদেশের হুজুরদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ভুয়া মাসআলার তালিকায় এটা কেনো আনা হলো? সম্ভবত এটা তাদের হানারফী মাযহাবের মাসায়েল সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা মাসআলা জেনেও জনগণের মনে কুধারণা সৃষ্টির অপপ্রয়াস অথবা হিংসাগত শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। যেনো তালিকায় ভুলশুদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত সব মাসআলা এনে তালিকা দীর্ঘ করা যায়। আমরা এ বইয়ে শুধু ঐসকল মাসআলারই হাদীসভিত্তিক আলোচনা করবো, যা হানারফী উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। অযথা অন্যান্য বিষয়ে সময় ব্যয় করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

৪র্থ পাঠ: (গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

ওযুর সময় গর্দান মাসেহ করা ভুয়া। কোন দলিল নেই বরং তা বিদআত।
রাসূল (সা) অযু করার সময় গর্দান মাসেহ করেননি।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ১ম খণ্ড ১১৮ পৃঃ ১৮৫ নং হাদীস।

উত্তর:

বুখারী শরীফে অযু সংক্রান্ত কোনো একটি হাদীসে গর্দান মাসেহ করার বিষয়টি না থাকলে তা হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের কোথাও পাওয়া যাবে না এমন ধারণা বা দাবি করা চরম গোড়ামী ও মূর্খতা। এতে বরং হাদীসের বিস্তৃত ময়দান ও সুবিশাল জগত সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতাই ফুটে ওঠে। তারা অজ্ঞ হবেন নাই বা কেনো? তাদের অধিকাংশ তো আরবীতে হাদীস পড়া বা অর্থ করার যোগ্যতাই রাখে না। তাদের পুঁজি আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র অনুবাদকৃত বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, আবু দাউদ, তিরমিযীসহ কতিপয় হাদীসের গ্রন্থাদি। অথচ এর বাইরে কতো হাদীসের কিতাব রয়ে গেছে, তারা যার নামটি পর্যন্ত হয়তোবা শুনেনি। তাই বাধ্য ও অপারগ না হলে এসকল মূর্খদের সাথে কথা না বলাই শ্রেয়।

যাই হোক, মূলকথা হলো গর্দান মাসেহ করার বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কোনো হাদীসে তার উল্লেখ এসেছে এবং অনেক হাদীসে তার উল্লেখ আসেনি। এজন্য উলামায়ে কিরাম গর্দান মাসেহ করাকে ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত বলেননি; বরং তা মুস্তাহাব (শরীয়তে পছন্দনীয়) বলে অভিহিত করেছেন।

এখন আমরা দেখবো, বুখারী শরীফের ১৮৫ নং হাদীসে কী আছে? লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ

تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهَمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهَمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهَمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (১)

অর্থাৎ একজন লোক আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললেন, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে অযু করতেন? আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি পানি আনতে বললেন। তারপর হাতে পানি ঢেলে স্বীয় হাত দু'বার ধৌত করলেন। এরপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার চেহারা ধৌত করলেন। এরপর স্বীয় দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। এরপর দু'হাত দ্বারা স্বীয় মাথা মাসেহ করলেন। হাত দু'টিকে সামনে থেকে পিছনের দিকে এবং পিছন থেকে সামনের দিকে টানলেন। স্বীয় মাথার সামনের অংশ দিয়ে শুরু করে হাত দু'টিকে একেবারে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এরপর তথা থেকে হাত দু'টি যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখান পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন। এরপর স্বীয় পা দু'টি ধৌত করলেন।

পাঠক, একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, এখানে গর্দান মাসেহ করার বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা হলেও এর ইঙ্গিত বুঝা যায়। কেননা, হাত যখন মাথা মাসেহ করতে গিয়ে গর্দান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তখন অবশ্যই হাত গর্দান স্পর্শ করেছে। আর আমরা তো পূর্ণ গর্দান মাসেহের প্রবক্তা নই। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে গর্দান মাসেহের বিষয়টি এ হাদীসটি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হাদীসও রয়েছে, যা সামনে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: আমরা যদি এ কথা মেনেও নেই যে, এ হাদীসে গর্দান মাসেহ করার কোনো আলোচনাই আসেনি তাহলে আমরা বলবো, এ হাদীসটিতে অযুর পূর্ণ বর্ণনা আসেনি। লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের দাবি অনুপাতে যদি বলা হয় এ হাদীসই অযুর পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপূর্ণ হাদীস তাহলে আমরা প্রশ্ন করবো যে, অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, মিসওয়াক করা, দাড়ি খিলাল করা, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করার মতো হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করা, কান মাসেহ করাসহ অযুর বিভিন্ন সূনাতগুলো উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে কি এগুলো সূনাত নয়? লা-মাযহাবীগণ হয়তো উত্তর দিবেন যে, এগুলো অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত। সুতরাং আমরাও বলবো গর্দান মাসেহ করার বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে অন্যান্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

এখন আমরা গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করবো। এ হাদীসগুলোর কিছু যঈফ, কিছু সহীহ এবং কিছু সহীহ যঈফের মাঝামাঝি তথা প্রমাণযোগ্য।

عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن الغل يوم القيامة. (১)

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং (অযুর মধ্যে) দু'হাত দ্বারা স্বীয় গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন বেড়ী ও শিকল পরানো থেকে নিরাপদ থাকবে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

৯৮ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وَفِي الْغُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِرْزَادَ ثَنَا عُمرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّوْيَانِيِّ: لَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ مَسْحَ الْعُنُقِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ سُنَّةٌ. وَأَنَا قَرَأْتُ جُزْءًا رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ يَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَفِي الْغُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ: هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قُلْتُ: بَيَّنَّ ابْنُ فَارِسٍ وَفُلَيْحٌ مَفَازَةً فَيُنْظَرُ فِيهَا. (২)

অর্থাৎ ৯৮ নং- ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং স্বীয় গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন বেড়ী পরানো থেকে রক্ষা পাবে।

ইমাম আবু নুআইম রহ. তাঁর তারীখে আসবাহান (স্পেনের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ বিন আহমাদ রহ. বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান বিন দাউদ রহ. সূত্রে, তিনি উসমান বিন খিরযাদ রহ. সূত্রে, তিনি উমার বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান রহ. সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন আমর আনসারী রহ. সূত্রে, তিনি আনাস বিন সীরীন রহ. সূত্রে, তিনি ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে যে, তিনি যখন অযু করতেন তখন (অযুর মধ্যে) গর্দান মাসেহ করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং (তাতে) গর্দান মাসেহ করবে কিয়ামতের দিন তাকে বেড়ী ও শিকল দ্বারা বাঁধা হবে না।

ইমাম রুইয়ানী রহ. এর ‘আল বাহর’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম শাফেয়ী রহ. গর্দান মাসেহ করার কথা উল্লেখ না করলেও আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম এটাকে সুন্নাত বলেছেন। আর আমি (রুইয়ানী) হাদীসের একটি খণ্ড পড়েছিলাম, যা ইমাম আবুল হুসাইন স্বীয় সনদে ফুলাইহ বিন সুলাইমান রহ.

থেকে, তিনি নাফে রহ. থেকে, তিনি ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং (তাতে) স্বীয় দু'হাত দ্বারা গর্দান মাসেহ করবে কিয়ামতের দিন সে বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে। আর তিনি বলেন, এটা ইনশাআল্লাহ সহীহ হাদীস।

আমি (ইবনে হাজার রহ.) বলি, ইবনে ফারেস ও ফুলাইহ এর মাঝে (রাবীদের) নির্জন প্রান্তর রয়েছে। সুতরাং এ প্রান্তরে লক্ষ্য রাখা উচিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, অযুতে গর্দান মাসেহ করার মধ্যে ফযীলত রয়েছে। আর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস যঈফ হলেও আমলযোগ্য হয়। ইমাম আবুল হুসাইন রহ. এর বর্ণিত হাদীসটিকে ইমাম রুইয়ানী রহ. 'ইনশাআল্লাহ সহীহ' বলে অভিহিত করেছেন, যা কমপক্ষে হাসান (প্রমাণযোগ্য) স্তরের হাদীস হিসেবে পরিগণিত হবে। সুতরাং প্রমাণযোগ্য এ হাদীস থাকায় গর্দান মাসেহের বিষয়টি প্রমাণিত এবং ফযীলতপূর্ণ হওয়ায় তা অযুর মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম রুইয়ানী রহ. হাদীসটির সনদে যদিও ইবনে ফারেস ও ফুলাইহের মধ্যবর্তী রাবীদের নাম উল্লেখ করেননি তথাপি তিনি যেহেতু একজন স্বীকৃত ইমাম এবং সনদ পর্যালোচনা করে তিনি হাদীসটিকে 'ইনশাআল্লাহ সহীহ' বলে অভিহিত করেছেন বিধায় তার কথার উপর আস্থা রাখা যায়।

এছাড়াও ইমাম তাবরানী রহ. ও ইমাম বাযযার রহ. স্বীয় যে সনদে গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত হাদীস এনেছেন তাতেও কোনো প্রকারের ত্রুটি ও সমস্যা নেই; বরং এ দু'টিও প্রমাণযোগ্য সনদ। আমরা এখানে উভয় কিতাব তথা মু'জামে তাবরানী কাবীর ও মুসনাদে বাযযারের উদ্ধৃতিতে হাদীস দু'টি উল্লেখ করছি।

ইমাম তাবরানী রহ. স্বীয় মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ يَحْيَى عَنْ وَائِلِ
بْنِ حُجْرٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ

.....وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ
الرَّأْسِ.....الخ(১)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর জন্য) পানিভর্তি একটি পাত্র আনা হলো।.....(তিনি অযু করার শেষদিকে মাথা মাসেহ করলেন) এবং মাথা মাসেহের পর (হাতে লেগে থাকা) অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বীয় দুই কানের বহিরাংশ মাসেহ করলেন এবং স্বীয় গর্দান ও দাড়ির ভিতরাংশ মাসেহ করলেন।

ইমাম বাযযার রহ. স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ
.....وَمَسَحَ ظَاهِرَ رُقْبَتِهِ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ.(২)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলাম আর (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর জন্য) পানিভর্তি পাত্র আনা হলো। (অযু করার শেষ পর্যায়ে এসে) তিনি স্বীয় গর্দানের উপরিভাগ ও দাড়ির ভিতরাংশ মাসেহ করলেন।

এ হাদীস দু'টি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গর্দান মাসেহ করা বিদআত নয়। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গর্দান মাসেহ করেছেন। যদিও তিনি সর্বদাই তা করেননি; বরং মাঝেমাঝে করেছেন এবং ফযীলতপূর্ণ মৌখিক হাদীস বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন। এজন্যই

১ মু'জামে কাবীর, তাবরানী : ২২/৪৯ হাদীস নং ১৭৫৮৪ (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা)

২ মুসনাদে বাযযার : ১০/৩৫৫ হাদীস নং ৪৪৮৮ (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা)

আমরা এটাকে অযুর সুনাত না বলে অযুর মুস্তাহাব বলে গণ্য করি। যেহেতু যে আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা না করে মাঝেমাঝে করেন এবং মৌখিকভাবে তা করতে উৎসাহিত করেন বা এর ফযীলত বর্ণনা করেন, শরীয়তে তা সুনাত না হয়ে মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হয়।

মু'জামে তাররানী ও মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হাদীস দু'টির সনদে কোনো দুর্বলতা ও সমস্যা নেই বিধায় এ হাদীসদ্বয় আমলযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য।

হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. উপরোক্ত হাদীস দু'টির সনদগত মান বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন:

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: نَعَمْ وَرَدَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ فِي صِفَةِ
وضوء النبي. أخرجه الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَزَّازُ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (১)

অর্থাৎ হাফেয ইরাকী রহ. বলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর পদ্ধতি বর্ণনায় ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসে মাথা মাসেহের কথা এসেছে, যা ইমাম তাবরানী রহ. ও ইমাম বাযযার রহ. এমন একটি সনদে বর্ণনা করেছেন, যাতে (সনদগত) কোনো সমস্যা নেই।

এসকল আলোচনা থেকে এসব লোকদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, যারা সর্বদা বলে বেড়ায় যে, গর্দান মাসেহ সংক্রান্ত কোনো সহীহ বা প্রমাণযোগ্য হাদীস নেই এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত সব হাদীসই মওযু ও অত্যাধিক দুর্বল।

আমরা বলি, হ্যাঁ এ ব্যাপারে সহীহ, হাসান ও যঈফ তিন ধরনের হাদীসই পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ যদি গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত হাদীস খুঁজতে গিয়ে শুধু যঈফ হাদীসই খুঁজে পায়, সহীহ বা হাসান কোনো হাদীস তার চোখে না পড়ে তাহলে সেটা তার চোখের দোষ বা অধ্যয়নের কমতি। শুধু যঈফ হাদীসগুলো দেখেই শোরগোল ও হৈ চৈ করা যে, এ সংক্রান্ত সব হাদীসই যঈফ ও মওযু তা শুধু তাদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীই প্রমাণ করে।

সহীহ ও হাসান ছাড়াও এ সংক্রান্ত কিছু যঈফ হাদীস আছে সত্য, কিন্তু তা এ পর্যায়ে যঈফ নয় যে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য করা হবে। দু'একজন মওযু বললেও অন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করে শুধু যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন:

২৯ - حَدِيث: مَسَحَ الرَّقَبَةَ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: مَوْضُوعٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ بِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ

لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ. (২)

অর্থাৎ ২৯ নং হাদীস: গর্দান মাসেহ করা বেড়ি পরানো থেকে মুক্তির পরওয়ানা সংক্রান্ত। আল্লামা নববী রহ. বলেছেন এটা মওযু। আর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তালখীসে হাবীরে এ হাদীসের উপর যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এটা মওযু হাদীস নয়।

হাফেয আইনী রহ. ইমাম আবু উবাইদ রহ. এর বর্ণনার উদ্ধৃতিতে একটি আসর উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে মারফুয়ে হুকমীর অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন:

مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ

الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ

قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قُلْتُ: هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ

الرَّفْعِ، لَأَنَّهُ لَا مَجَالَ فِيهِ لِلرَّأْيِ. (৩)

وزاد ابن حجر العسقلاني بعده فهو على هذا مرسل. (৪)

অর্থাৎ ইমাম আবু উবাইদ রহ. কিতাবুত তুহুরে আ. রহমান বিন মাহদী রহ. থেকে, তিনি মাসউদী রহ. থেকে, তিনি কাসেম রহ. থেকে, তিনি আ. রহমান রহ. থেকে তিনি মুসা বিন তালহা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (মুসা বিন তালহা রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি (অযুতে) স্বীয় মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামত দিবসে বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে। আমি (বদরুদ্দীন

২ আল ফাওয়ায়িদুল মাজমূআ : ১/১২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ আল বিনায়া : ১/২২০ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৪ আত তালখীসুল হাবীর : ১/২৮৮ হাদীস নং ৯৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আইনী রহ.) বলবো, এটা যদিও মাওকুফ হাদীস কিন্তু তা মারফু হাদীস (সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস) -এর পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এ জাতীয় বর্ণনায় (নিজের পক্ষ থেকে) কিয়াস বা অনুমান করে কোনো কিছু বলার অবকাশ নেই। (যেহেতু কিয়ামত দিবসের অবস্থা একমাত্র অহীর মাধ্যমেই জানা যায়। তাই বাহ্যতঃ এটা একজন তাবেয়ীর বাণী হলেও বাস্তবিকপক্ষে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীই হবে। যে কোনো কারণে তিনি সাহাবী সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উল্লেখ করেননি।)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (অনুরূপ আলোচনা শেষে) অতিরিক্ত এ কথাটি বলেছেন যে, এ অনুসারে হাদীসটি মুরসাল হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এ হাদীসটিও গর্দান মাসেহ করার ব্যাপারে প্রামাণ্য একটি দলীল হতে পারে।

গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত আরেকটি হাদীস সুনানে আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। যদিও হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে তথাপি এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস এর সমর্থনে থাকায় এখানে তা উল্লেখ করার যোগ্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا. (১) وَفِي أَحْمَد:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ
طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ..... حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدِّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةٍ.
قَالَ: الْقَذَالُ السَّالِفَةُ الْعُنُقُ. (২)

অর্থাৎ তালহা বিন মুসাররিফ তার পিতা থেকে তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (অযুতে)

১ সুনানে আবু দাউদ : ১/১৭-১৮ হাদীস নং ১৩২ (আল মাক্ তাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ মুসনাদে আহমাদ : ১২/৩৮৫ হাদীস নং ১৫৮৯৩ আহমাদ শাকের কর্তৃক তাহকীককৃত (দারুল হাদীস, কায়রো)

একবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি। এমনকি (মাসেহ) গর্দানের উপরিভাগ পর্যন্ত পৌছলো। মুসনাদে আহমাদে এসেছে..... এমনকি মাথার পশ্চাভাগ ও তার পাশাপাশি গর্দানের সামনের অংশ পর্যন্ত একবারই (মাসেহ) পৌছলো। তিনি বলেন, কযাল অর্থ গর্দানের উপরিভাগ অথবা কানের কাছের চুল তথা মাথার পিছনভাগ।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে মন্তব্য করেন:

واسناده ضعيف. (৩)

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল।

এটি দুর্বল হাদীস হলেও এ পর্যায়ের নয় যে, তা পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লামা আ. হাই লাখনবী রহ. স্বীয় রিসালা ‘তুহফাতুত তালাবা ফী তাহকীকি মাসহির রাকাবা’-এর টীকায় লেখেন:

قلت: يعلم من مجموع ما ذكرنا أن في سند الحديث المذكور في المسح من رواية طلحة عن أبيه عن جده اختلافات وعلا. أما الاختلافات: فمنها الاختلاف أن طلحة الروای له هو ابن مصرف أو غيره؟ والأول أصح. ومنها الاختلاف في اسم جده وهو كعب بن عمرو أو كعب بن عمر أو عمر بن كعب؟ والأشهر هو الأول. ومنها الاختلاف في كون جده صحابياً؟ والأصح كونه صحابياً. وأما العلل: فأولها ضعف ليث الروای عن طلحة. وثانيها ضعف مصرف أو جهله. وثالثها عدم كون جده صحابياً على ما قاله جماعة. والحق أن من أثبت كونه صحابياً معه زيادة علم على من لم يعرفه. وضعف ليث ومصرف يسير لا يستحق الحديث به الترك. (৪)

৩ আত তালখীসুল হাবীর : ১/২৮৮ হাদীস নং : ৯৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ হাশিয়াতু তুহফাতিত তালাবা ফী তাহকীকি মাসহির রাকাবা : পৃ. নং ৮ ও ৯ -এটি ‘মাজমুআতু রাসাইলিল লাখনবী’-এর প্রথম খণ্ডের ৬ নং প্রবন্ধ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, মদীনা)

অর্থাৎ আমি (আ. হাই লাখনবী রহ.) বলবো, আমাদের পূর্বের সামগ্রিক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তালহা তার পিতা থেকে তার দাদা সূত্রের বর্ণনায় (গর্দান) মাসেহ করা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে কিছু বিতর্ক ও ত্রুটি আছে। বিতর্কগুলোর একটি হলো, হাদীসের বর্ণনাকারী তালহা কি মুসাররিফের সন্তান না অন্য কারো? তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় বিতর্ক হলো, তার দাদার নামের বিতর্ক। সে কাব বিন আমর নাকি কাব বিন উমার নাকি উমার বিন কাব? তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় আরেকটি বিতর্ক হলো, তার দাদা সাহাবী হওয়া নিয়ে মতানৈক্য। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, তিনি সাহাবী। আর ত্রুটিগুলোর একটি হলো, তালহা থেকে বর্ণনাকারী লাইস দুর্বল রাবী হওয়া। দ্বিতীয় একটি ত্রুটি হলো, মুসাররিফ নামক রাবী দুর্বল বা মাজহুল (অজ্ঞাত) হওয়া। আর তৃতীয় আরেকটি ত্রুটি হলো, তার (তালহার) দাদা সাহাবী না হওয়া যেমনটি বলেছেন কতিপয় মুহাদিসীন। তবে বাস্তব সত্য হলো, যে সকল মুহাদিসীন তাঁকে সাহাবী বলে জানেন ও স্বীকৃতি দেন তাদের অতিরিক্ত ইলম ও অধিক গবেষণা রয়েছে ঐসকল মুহাদিসীনের তুলনায়, যারা তাঁকে সাহাবী বলে চিনতে পারেননি। আর লাইস ও মুসাররিফের দুর্বলতা এতো স্বল্প যে, এর কারণে হাদীসটি পরিত্যক্ত হতে পারে না।

এ আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হলো যে, আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ হলেও এ পর্যায়ের নয় যে, তা পরিত্যক্ত ও বিবেচনাহীন বলে গণ্য হবে; বরং হাদীসটির দুর্বলতা সহনীয় পর্যায়ের হওয়ায় তা আমলযোগ্য হবে। আর এটা ছাড়াও গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত সহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীসগুলো তো রয়েছেই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি গর্দান মাসেহ করার ব্যাপারে সহীহ, হাসানসহ প্রমাণযোগ্য কোনো হাদীস নাও থাকতো তবুও অসুবিধা ছিলো না। কেননা, আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

ইবনে হাজার হাইসামী রহ. স্বীয় গ্রন্থ আল ফাতহুল মুবীনে বলেন:

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فُضَائِلِ

الْأَعْمَالِ. (১)

১ আল ফাতহুল মুবীন বিশরহিল আরবাস্টিন: ১/১০৭ (দারুল মিনহাজ, জেদা)

অর্থাৎ ফযীলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমলের বৈধতার ব্যাপারে সকল উলামা ও মুহাদ্দিসীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

মুল্লা আলী কারী রহ. তাঁর আল মাওযুআতুল কুবরাতে বলেন:

رَوَى مَرْفُوعًا مِنْ مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا. وَلِذَا قَالَ أَثِمَّتْنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ. (২)

অর্থাৎ (গর্দান মাসেহ করা সংক্রান্ত) মুসনাদে ফিরদাউসে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর একটি মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তা দুর্বল সনদে (বর্ণিত)। আর ফযীলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে আমলযোগ্য। এজন্যই আমাদের ইমামগণ বলেন, গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।

আল্লামা নববী রহ. তাঁর ‘আল আরবাইন’ গ্রন্থে, হাফেয সাখাবী রহ. তাঁর ‘আল কাওলুল বদী’ ফিসসালাতি আলান হাবীবিশ শাফী’ গ্রন্থে এবং আল্লামা জালালী দাওওয়ানী রহ. ‘উনমূযাজিল উলূম’ গ্রন্থে; এছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিস ও প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ স্ব স্ব কিতাবে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, যঈফ হাদীস ফযীলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গর্দান মাসেহ করা ফযীলতপূর্ণ একটি আমল।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, গর্দান মাসেহ করা ভুয়া কোনো আমল নয়। সহীহ ও প্রমাণযোগ্য একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যেমন গর্দান মাসেহ করেছেন তেমনি ফযীলতপূর্ণ হাদীস বলে এর প্রতি উৎসাহিতও করেছেন। সুতরাং যারা গর্দান মাসেহকে ভুয়া বলবে প্রকারান্তরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর হাদীসকেই যেনো ভুয়া বললো। নাউযুবিল্লাহ!

৫ম পাঠ: (আযানের উত্তরের বাক্য সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

আযানের উত্তরে আসহাদুআল্লা মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর জবাবে শুধু (সাঃ) বলা ভুয়া। মোয়াজ্জিন যা বলে তাই বলতে হবে। তবে হাইয়া আলা ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার উত্তরে লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলতে হবে। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৫৮৫, ৫৮৬ নং হাদীস।

উত্তর:

স্মরণ রাখা উচিত যে, আযানের বাক্য **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** (আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) এর উত্তরে শুধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা হানাফী উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো আমল বা মাসআলা নয়। অনেক সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশত এমন বলে থাকে। সাধারণ মানুষের একটি ভুল আমলকে বাংলাদেশের হুজুরদের প্রতিষ্ঠিত মাসআলা ঘোষণা করে প্রচার করা কেমন নগ্ন ইনসাফহীনতা! হানাফী মাযহাবের প্রমাণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাবে কি তারা এ মাসআলাটির অস্তিত্ব খুঁজে দেখাতে পারবে? সুতরাং যারা মাসআলা না জেনে সঠিকভাবে তালাশ ও অনুসন্ধান না করে শুধু হানাফী মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষের কারণে অন্যের উপর মিথ্যা ও ভুয়া অভিযোগ তুলতে পারে তাদের আর কতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে? তাদের কথা ও দাবিতে বাস্তবেই সত্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আযানের জবাবের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মাসআলা হলো এরূপ: মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে শ্রবণকারী সে শব্দগুলোই বলবে। তবে অবশ্য **إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ** এর জবাবে **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** ও **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বলবে।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. বলেন:

قال: (من سمع المؤذن وليس في صلاة قال كما قال المؤذن، إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول مكان ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله.)^(১)

অর্থাৎ তিনি (ইমাম তাহাবী রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনকে আযান দিতে শুনবে এবং সে নামাযরত অবস্থায় থাকবে না সে মুআযযিন যেমন বলে তেমনই বলবে। তবে মুআযযিনের **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** এবং **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** বাক্যদ্বয় ব্যতিক্রম। যেহেতু জবাবদাতা এ ক্ষেত্রে **إِلَّا بِاللهِ** বলবে।

তাহাবী রহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হানাফীগণ আযানের জবাবে দুই স্থান ছাড়া বাকী ক্ষেত্রে হুবহু মুআযযিনের বাক্যগুলোই পুনরাবৃত্তির প্রবক্তা। হানাফী প্রায় সকল কিতাবে এমনই বলা হয়েছে। দু'একটিতে একটু ভিন্নতা থাকলেও তা হানাফীদের ফতোয়া নয়।

এ ব্যাপারে হানাফীদের দলীল হলো আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস, যা ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় জামে সহীহে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. (২)

অর্থাৎ আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরা মুআযযিনের বলার অনুরূপ বলবে।

এরপরের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

...انه قال: لما قال حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قال: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. (৩)

অর্থাৎ তিনি (সাহাবী) বলেন, যখন মুআযযিন **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** বলবে তখন শ্রোতা **إِلَّا بِاللهِ** বলবে এবং তিনি বলেন, আমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এরূপই বলতে শুনেছি। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** এর জবাবে **إِلَّا بِاللهِ** বলতেন।)

২ সহীহ বুখারী : ১/৮৬ হাদীস নং ৬০৩ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

৩ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৬০৫

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (٥)

এসকল হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুআযযিন যা বলবে শ্রোতা তাই বলবে। শুধুমাত্র **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** ও **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** এর ক্ষেত্রে **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** বলবে। এটাই হানাফী মায়হাব।

৬ষ্ঠ পাঠ

(‘আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম’ এর জবাব সংক্রান্ত)

অভিযোগ নং:

ফজরের আযানের সময় খাইরুম মিনান নাওম এর জবাবে সাদাকতা বারাকতা বলা ভুয়া। সঠিক দলিল নাই (মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলতে হবে)

জবাব:

প্রশ্নে শুধু ‘খাইরুম মিনান নাওম’ বলা হয়েছে, অথচ সম্পূর্ণ বাক্য হবে এরূপ: ‘আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম’। এরপর বলা হয়েছে, ‘সাদাকতা বারাকতা’- এটাও ভুল। সঠিক উচ্চারণ হলো- ‘সাদাকতা ও বারারতা’। এভাবে পূর্বের ৫ম প্রশ্নে বলা হয়েছে, ‘আসহাদুআন্না মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। অথচ এর সঠিক উচ্চারণ হবে এরূপ: ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’। আর বানানগত অসংখ্য ভুল তো রয়েছেই।

যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ এর জবাবে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলার অবকাশ আছে কিনা? এ ব্যাপারে হানাফীদের মাঝে কিছু মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে এর জবাবে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলবে। এ ব্যাপারে ইমাম ইসমাইল আজলুনী রহ. তাঁর কাশফুল খাফা ওয়া মুখীলুল ইলবাসে বলেন:

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال في المقاصد: هو كلام يقوله كثير من العامة عقب قول المؤذن في الصبح "الصلاة خير من النوم" وهو صحيح بالنظر لكونه صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على قوله "الصلاة خير من النوم" كما بينت ذلك في القول المألوف. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة يقول ذلك ولذا كان استحباب قوله وجهها. لكن الراجح استحباب قوله "صدقت وبررت" فقط... قال الدميرى: وادعى ابن الرفعة أن

خبراً ورد فيه لا يعرف قائله. انتهى... وأجاب الشمس الرملى عن اعتراض
الدميرى على ابن الرفعة بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى. وفيه
إشارة إلى اختياره استحبابه. (১)

অর্থাৎ ১৫৯০ নং হাদীস: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - আল
মাকাসিদে (হাফেয সাখাবী রহ.) বলেন, এটা একটি বাক্য, যা সাধারণ অনেক
মানুষই ফজরের আযানে মুআযযিনের বাণী الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর জবাবে
বলে থাকে। এটা বাস্তবিক অর্থে সহীহ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
বলাকে (আযানের অংশ বলে) স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা আমি ‘আল কাওলুল
মালুফ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মাহযূরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে এটা বলার
নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য এটা মুস্তাহাব হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। তবে শুধু
صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ (সাদাকতা ওয়া বারারতা) বলা মুস্তাহাব হওয়াটা
অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লামা দামীরী রহ. বলেন, ইবনে রাফআ রহ. এ সংক্রান্ত
হাদীস থাকার দাবি করলেও এর প্রবক্তা জানা যায়নি। তবে আল্লামা শামস
আররামালী রহ. ইবনে রাফআ রহ. এর উপর দামীরী রহ. কর্তৃক আরোপিত
অভিযোগের জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছু ইয়াদ বা সংরক্ষণ করেছে
তার কথা ঐসকল লোকের বিপরীত দলীল বলে গণ্য হবে, যারা তা ইয়াদ বা
সংরক্ষণ করেনি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তা (সাদাকতা ওয়া বারারতা)
বলা মুস্তাহাব হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ এর
জবাবে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলা হাদীস থেকে প্রমাণিত কিনা- এ ব্যাপারে
মতভেদ আছে। কারো মতে হাদীস থেকে প্রমাণিত নয় এবং কারো মতে তা
হাদীস থেকেই প্রমাণিত। যেহেতু কোনো ফকীহ মুহাদ্দিস এভাবে মিথ্যা বলতে
পারে না যে, এ ব্যাপারে হাদীস এসেছে। আর অন্যরা উক্ত হাদীস খুঁজে না
পাওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, উক্ত হাদীসটির অস্তিত্ব নেই। কেননা,

১ কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস : ২/২০ হাদীস নং ১৫৯০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া,
বৈরুত)

যে খুঁজে পেয়েছে সে তো পেয়েছেই আর যে খুঁজে পায়নি সে কম অনুসন্ধান করেছে বা বেশী অনুসন্ধান করলেও হয়তো হাদীসটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাই 'আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' এর জবাবে 'সাদাকতা ওয়া বারারতা' বলাকে ভুয়া বলা উচিত নয়।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,
 وَالْإِجَابَةُ أَنَّ يَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ... إِلَّا فِي قَوْلِهِ: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" فَإِنَّهُ يَقُولُ مَكَانَهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،
 فَإِنَّ إِعَادَةَ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ وَالِاسْتِهْزَاءَ. وَكَذَا إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ "الصَّلَاةُ
 خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" لَا يُعِيدُهُ السَّامِعُ لِمَا قُلْنَا وَلَكِنَّهُ يَقُولُ "صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ" أَوْ مَا
 يُؤْجَرُ عَلَيْهِ. (২)

অর্থাৎ আর আযানের জবাব হলো, মুআযযিন যা বলে তাই বলবে। তবে
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর ব্যতিক্রম। কেননা, এর পরিবর্তে
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ বলবে। যেহেতু উক্ত বাক্যের পুনরাবৃত্তি
 অনুকরণ ও উপহাস করার সদৃশ্য হয়। তদ্রূপ মুআযযিন যখন
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলবে তখন পূর্বোক্ত কারণেই শ্রোতা তা পুনরাবৃত্তি করবে না; বরং সে
 বলবে صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ অথবা এমন বাক্য, যা প্রতিদানোপযুক্ত ও পূণ্যময় হয়।

এ বক্তব্য থেকে একটি বিষয় বুঝা গেলো যে, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর
 জবাবে صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ বলাই জরুরী নয়; বরং এরকম ভালো অর্থযুক্ত
 যেকোনো বাক্যই বলা যায়। যেমন বলা যায় بِالْحَقِّ نَطَقْتَ (সত্যই উচ্চারণ
 করেছো) বা أَحْسَنْتَ (উত্তম কথা বলেছো) ইত্যাদি।

মোটকথা الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর জবাবে উক্ত বাক্যই উচ্চারণ একপ্রকার
 উপহাস করার মতোই মনে হয়। কেননা, এর অর্থ হলো ঘুম থেকে নামায
 উত্তম। এখন মুআযযিনের এ কথার উত্তরে 'সাদাকতা ওয়া বারারতা' তথা 'তুমি
 সত্য বলেছো তুমি সত্যবাদী হয়েছো' জাতীয় বাক্য বলাটাই উপযোগী। এর

২ বাদায়েউস সানায়ে : ১/৩৮২-৩৮৩ আযান অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদ (মাকতাবাতু
 যাকারিয়া, দেওবন্দ)

বিপরীতে শ্রোতাও **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** বলাটা জবাব হিসেবে ঠিক হয় না। যেরকমভাবে **الصَّلَاةُ خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** (এসো নামাযের দিকে) এর জবাবে হুবহু **خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** বলাটা জবাব হিসেবে চলে না; বরং এতে একপ্রকার উপহাসের মাত্রা পাওয়া যায়। **وَبَرَزْتُ صَدَقْتُ** এর বিষয়টিও ঠিক এরূপই।

এর বিপরীত হানাফীদের আরেক দল ফুকাহা **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** এর জবাবে **صَدَقْتُ** বলা প্রবক্তা নন। তারা বলেন, আযানের জবাবে মুআযযিন যেরূপ বলে সেরূপই বলা উচিত। শুধুমাত্র **خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** এবং **الصَّلَاةُ خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** বলবে। এ মাসআলাটি বুখারী, মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা আমরা ৫ম পাঠে উল্লেখ করেছি।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রধান ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. স্বীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থ মুখতাসারুত তাহাবীতে বলেন:

مسألة- (إجابة المؤذن) قال: (من سمع المؤذن وليس في صلاة قال كما قال المؤذن، إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.)^(১)

অর্থাৎ মাসআলা: মুআযযিনের জবাব সংক্রান্ত। তিনি (তাহাবী রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনকে আযান দিতে শুনবে এবং সে নামাযরত অবস্থায় থাকবে না সে মুআযযিন যেরূপ বলে সেরূপই বলবে। তবে **الصَّلَاةُ خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** এবং **الصَّلَاةُ خَيْرٌ عَلَى النَّوْمِ** বাক্যদ্বয় এর ব্যতিক্রম। কেননা, সে এর পরিবর্তে **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** বলবে।

ইমাম আবু বকর রাযী আল জাসসাস রহ. তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন:

روى حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدهم الله أكبر الله أكبر وذكر نحو ما قال أبو جعفر في حي على الصلاة والفلاح.^(২)

১ শরহ মুখতাসারিত তাহাবী: ১/৫৬২-৫৬৩ আযান অধ্যায় (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

২ প্রাগুক্ত

অর্থাৎ হাফস বিন আসেম বিন উমার রহ. স্বীয় পিতা সূত্রে তাঁর দাদা উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুআযযিন যখন **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ** বলবে এবং তোমাদের কেউ **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ** বলবে, এরপর আবু জাফর (তাহাবী) রহ. **عَلَى الصَّلَاةِ** এর (জবাবে) যা বলেছেন, (হাদীসে) অনুরূপ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ **عَلَى الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** এর জবাবে **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ** বলার প্রবক্তা ছিলেন না; বরং মুআযযিন যেমন বলে তেমনই বলার কথা বলেছেন। শুধুমাত্র **عَلَى الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** এর জবাবে **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ** বলার কথা বলেছেন, যা মুসলিম শরীফ এবং বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। ইমাম জাসসাস রহ.ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে **عَلَى الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** এর জবাবে **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ** বলা সম্পর্কে কিছু বলেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি **عَلَى الصَّلَاةِ** ব্যতীত আযানে অন্যান্য বাক্যগুলোতে মুআযযিনের অনুরূপ বাক্য বলারই প্রবক্তা। হাদীসে যেহেতু **عَلَى الصَّلَاةِ** ব্যতীত অন্যান্য বাক্যগুলোতে হুবহু মুআযযিনের বাক্যের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে তাই **عَلَى الصَّلَاةِ** এর জবাবে **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ** বলাটাই হাদীস অনুসৃত পদ্ধতি বলে গণ্য হবে।

হানাফী মাযহাবের বরণ্য ফকীহ আল্লামা রাফেয়ী রহ. তার ‘তাকরীরাতে রাফেয়ী আলা হাশিয়াতি ইবনে আবেদীন’ গ্রন্থে বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা রহমতী রহ. এর উদ্ধৃতিতে বলেন:

(قول الشارح: فيقول صدقت الخ قال الرحمتي: ويأتى في هذا ما تقدم في الحيعلتين بل أولي، لأن حديث "قولوا مثل ما يقول" يشمل ولم يرد حديث آخر في "صدقت وبررت" بل نقلوه عن بعض السلف.^(৩))

অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারের উক্তি- সুতরাং সে বলবে **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ** আল্লামা রহমতী রহ. বলেন, এখানে ঐ প্রশ্নই উত্থাপিত হবে, যা **عَلَى الصَّلَاةِ** এবং

৩ তাকরীরাতে রাফেয়ী আলা হাশিয়াতি ইবনে আবেদীন : (ফাতাওয়ায়ে শামীর শেষে সংযুক্ত) ১/৪৭ (যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ)

حَى عَلَى الْفَلَاحِ এর ক্ষেত্রে হয়েছে; বরং এক্ষেত্রে তো আরো বেশী করে অভিযোগ হওয়ার কথা। কেননা, قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ (মুআযযিন যেমন বলে তোমরা তেমনই বলো) হাদীসটি তাকে (النُّومُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ) কে অন্তর্ভুক্ত ও শামিল করে। অথচ صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ এর ব্যাপারে কোনো হাদীস আসেনি; বরং ফুকাহায়ে কিরাম পূর্ববর্তী কিছু ফুকাহা থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

এ আলোচনার সারকথা হলো, আযানের জবাবে মুআযযিন যা বলে তাই বলতে হবে। কেননা إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে তাই বলো) বাক্যে হাদীস এসেছে। সুতরাং আযানের জবাবে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তো মুআযযিনের মুখ নিঃসৃত সব বাক্যের হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে হবে, অথচ আমরা জানি حَى عَلَى الْفَلَاحِ এর জবাবে لَا بِاللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলতে হয়। সুতরাং উক্ত হাদীসের উপর তো পরিপূর্ণ আমল হলো না। এর উত্তর হলো, আযানের জবাবে হুবহু আযানের পুনরাবৃত্তি করার বিধান থেকে حَى عَلَى الْفَلَاحِ এর বিধান একটু ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র, যা অন্য একটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য ফুকাহা ও নীতিনির্ধারকদের নিকট هَادِيَسَاتِي مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ (ব্যাপক একটি বিধান, যার কিয়দংশ একটু ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র) এর অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যতিক্রমী এ বিধানটি প্রমাণিত হয়েছে পূর্বের মতোই শক্তিশালী সহীহ একটি হাদীস দ্বারা। তাই এখানে আর কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে الصَّلَاةُ الْخَيْرُ مِنْ النُّومِ এর জবাবে صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ বলা সংক্রান্ত কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি তাই মুআযযিন الصَّلَاةُ الْخَيْرُ مِنْ النُّومِ বলা জবাবে صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ (মুআযযিন যা বলে তাই বলো) হাদীসটির সম্পূর্ণ বিরোধী বলে গণ্য হবে। বিশেষত যখন এ সংক্রান্ত কোনো সহীহ বা যঈফ হাদীস পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, ফজরের আযানে الصَّلَاةُ الْخَيْرُ مِنْ النُّومِ এর জবাবে صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ বলা হানাফীদের ঐক্যমত সমর্থিত মাসআলা নয়; বরং এতে ইখতিলাফ আছে। আমাদের মতে الصَّلَاةُ الْخَيْرُ مِنْ النُّومِ এর জবাবে হুবহু الصَّلَاةُ الْخَيْرُ مِنْ النُّومِ বলা মতটিই অধিক শক্তিশালী এবং হাদীস অনুসৃত পদ্ধতি।

৭ম পাঠ:

(নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

গোসল ও অযু করার আগে মুখে মুখে নিয়ত পাঠ করা ভূয়া। এটা made in bangladesh মক্কা ও মদীনায়ে made হয়নি। শুধু বিসমিল্লাহ বলে ওয়ু ও গোসল শুরু করতে হবে। দেখুনঃ তিরমিঃ মিনাঃ প্রঃ ২৫ নং হাদীস।

জবাব:

অযু গোসলের পূর্বে নিয়ত করার আবশ্যকীয়তা এবং মুখে তা পাঠ করা কোনোটিই হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়। নিয়ত আবশ্যক না হওয়ার প্রমাণ উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।

সুনানে দারা কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غِيْلَانَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَا: نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ نَا الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتْنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَّوْا، فَأَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ، وَكَانُوا يَقْرَأُونَ طه، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ أَقْرَأْهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْنَا فَاعْتَسَلْنَا أَوْ تَوَضَّأْنَا، فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأْنَا ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ طه. (১)

আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (অমুসলিম থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তলোয়ার

হাতে বের হলেন। তখন তাকে বলা হলো, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তো ধর্মত্যাগী অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদের নিকট আসলেন। সেসময় তাঁদের নিকট খাব্বাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু নামক একজন মুহাজির সাহাবী অবস্থান করছিলেন এবং তাঁরা সূরা ত্বাহা পড়ছিলেন। অতঃপর উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে তা আমাকে দাও, আমি পড়বো। আর উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু কিতাব পড়তে পারতেন। তখন তাঁর বোন বললেন, তুমি অপবিত্র। আর এটা একমাত্র পবিত্ররাই স্পর্শ করতে পারে। অতএব যাও, (আগে) গোসল করো বা বললেন, অযু করো। এরপর উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (কাফের অবস্থায়ই) অযু করলেন অতঃপর কুরআন হাতে নিয়ে সূরা ত্বাহা পড়লেন।

হাফেয যাইলায়ী রহ. এর সনদকে **ج** বা উত্তম সনদ বলে অভিহিত করছেন।^(১)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, পবিত্রতা অর্জন করার জন্য নিয়ত আবশ্যিক নয়। যেহেতু উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু কাফের অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, কাফের থাকাকালীন নিয়ত করা যায় না, করলেও শরীয়তে তা অগ্রহণযোগ্য হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা জানার পর এ কথা বলেননি যে, উমারের নিয়ত না থাকায় তার পবিত্রতা সহীহ হয়নি। সুতরাং নতুন করে তাকে নিয়তের সহিত পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। পরবর্তীতেও এমন কোনো হাদীস বলেননি যে, পবিত্রতা অর্জন করতে হলে সহীহ-শুদ্ধ নিয়ত করা আবশ্যিক বা এ জাতীয় কোনো নির্দেশনাও দেননি। এটা যেহেতু এখানকার আলোচ্য বিষয় নয় বিধায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ও বিস্তারিত প্রমাণাদি জানতে হানাফী মাযহাবের বড় বড় প্রামাণ্যগ্রন্থ- যেমন ইলাউস সুনান ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

অযু গোসলের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করার কথা হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মাসআলা না হলেও কিছু কিছু হানাফী ফকীহগণ অবশ্য নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করার কথা বলেছেন।

১ নাসবুর রায়া : ১/২৬১ হায়েয অধ্যায় (মাকতাবাতু দারিল ইমান, সাহারানপুর)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতোয়াগ্রন্থ আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে:

(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي النِّيَّةِ) النِّيَّةُ إِرَادَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي. وَأَذْنَاهَا مَا لَوْ سُئِلَ لَأَمْكَنَهُ أَنْ يُجِيبَ عَلَى الْبَدِيهَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُجِيبَ إِلَّا بِتَأْمُلٍ لَمْ يَجُزْ صَلَاتُهُ. وَلَا عِبْرَةٌ لِلذِّكْرِ بِاللِّسَانِ فَإِنْ فَعَلَهُ لَتَجْتَمِعَ عَزِيمَةُ قَلْبِهِ فَهُوَ حَسَنٌ كَذَا فِي الْكَافِي. وَمِنْ عَجَزٍ عَنْ إِحْضَارِ الْقَلْبِ يَكْفِيهِ اللِّسَانُ كَذَا فِي الزَاهِدِي. (২)

অর্থাৎ চতুর্থ পরিচ্ছেদ নিয়ত সংক্রান্ত। (নামাযের) নিয়ত হলো, নামায শুরু করার ইচ্ছা বা সংকল্প করা। এর শর্ত হলো, স্বীয় অন্তর দ্বারা এ কথা জানা বা চিন্তা করা যে, সে কোন নামায পড়ছে। আর এটা বুঝার সর্বনিম্ন পদ্ধতি হলো, যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় (যে, সে কোন নামায পড়ছে?) তাহলে সে চিন্তা করা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে এর উত্তর দিতে পারে (যে, আমি এখন উদাহরণ স্বরূপ আসরের নামায পড়ছি)। আর যদি সে চিন্তা ফিকির করা ব্যতীত এর উত্তর দিতে না পারে তাহলে (বাস্তবিক অর্থে তার নিয়ত না থাকায়) তার নামায সहीহ হবে না। আর শুধু মুখে নিয়ত উচ্চারণ বা উল্লেখ করার কোনো মূল্য নেই। তবে যদি কেউ মৌখিকভাবে নিয়ত উচ্চারণ করে যাতে তার অন্তরের সংকল্প (মৌখিক উচ্চারণের সাথে) মিলে যায় তাহলে তা ভালো। ‘কাফী’ গ্রন্থে এমনই আছে। আর যে ব্যক্তি (অত্যাধিক পেরেশানী বা অন্য কোনো কারণে) অন্তরে নিয়ত করতে একেবারেই অপারগ হবে তার জন্য মৌখিক নিয়তই যথেষ্ট। ‘যাহেদী’ গ্রন্থে এমনই আছে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, হানাফী মাযহাবে একান্ত অপারগ না হলে শুধু মৌখিক নিয়তের অবকাশ নেই; বরং অন্তরের ইচ্ছাই আসল নিয়ত। তবে কেউ অন্তরে নিয়ত থাকা সত্ত্বেও মনের ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে; বরং নিয়তকে মযবুত করার উদ্দেশ্যে যদি মৌখিক নিয়তও করে তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্ষেত্রবিশেষ তা উত্তমও বটে। এর মূল

কারণ হলো, এখানে মৌখিক উচ্চারণকে নিয়তের বিকল্প ভাবা হয়নি; বরং আসল নিয়ত তথা অন্তরের ইচ্ছা ও সংকল্প আরো দৃঢ় ও মযবুতভাবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই অন্তরে থাকার পাশাপাশি মুখেও তা উচ্চারণ করা হয়।

শরীয়তে এর দৃষ্টান্তও আছে। যেমন ঈমান, যার অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমান মূলত অন্তরের কাজ অর্থাৎ মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করা যে- আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল, ফেরেস্তা হক, নবী রাসূলগণ হক, আল্লাহর পাঠানো কিতাবসমূহ হক, কিয়ামত হক, পুনরুত্থান দিবস হক, তাকদীর হক- এগুলো বিশ্বাস করলেই সে মুমিন। তথাপি এর বাহ্যিক প্রমাণের জন্য শরীয়তে তার উপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করাকে আবশ্যিক করেছে। সুতরাং বুঝা গেলো, অন্তরের কাজ হওয়া সত্ত্বেও মুখে উচ্চারণ করা যেতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষ (যথা ঈমানের ক্ষেত্রে) তা শর্তও বটে। তাই যেকোনো ইবাদাত ও ভালো কাজের শুরুতে অন্তরের নিয়তই মূল আর মৌখিক নিয়ত হলো তার সহায়ক। আশা করি পাঠক বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

আমাদের উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ মৌখিক নিয়তকে সুন্নাত বলেছেন। তবে তারা এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত উদ্দেশ্য নেননি; বরং মাশায়েখদের সুন্নাত বুঝিয়েছেন। সুন্নাত অর্থ তরীকা ও পদ্ধতি। বড়দের চালচলন ও পদ্ধতিকেও সুন্নাত বলা হয়। তবে বেশীরভাগ এটা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এ ব্যাপারে আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন,

قال الحافظ ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: "أصلي كذا" ولا عن أحد من الصحابة والتابعين؛ بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذه بدعة "إه.

وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وما روى عن

عمر رضي الله عنه أنه أدب من فعله فهو محمول على أنه إنما زجر من جهر

به فلا بأس بها. فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. كذا قال الشرنبلالي في مراقى الفلاح. وقال الطحطاوى في حاشيته: "قال في البحر: فتحرر من هذا الاقوال أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة" قال في الفتح بعد قول الهداية: إنه حسن لاجتماع عزيمته. (১)

অর্থাৎ হাফেয ইবনুল কাইয়িম জাওয়ী রহ. বলেন, সহীহ বা যঈফ কোনো সূত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি নামায শুরু করার সময় বলতেন ‘আমি এ নামায পড়ছি।’ তদ্রূপ তা কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকেও প্রমাণিত নয়। বরং বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। তাই এটা বিদআত বা নবআবিষ্কৃত। (আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন,) আর কোনো কোনো ফুকাহা এটা (অন্তরের সাথে সাথে মুখেও নিয়ত করা) বৈধ বলেছেন। যেহেতু এতে অন্তরের কাজটি নিশ্চিতকরণ এবং (নিয়ত না করা সংক্রান্ত) ওয়াসওয়াসা ও সংশয় দূর হয়। আর উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে যে বর্ণিত আছে, তিনি মৌখিক নিয়তকারীকে শাস্তি দিতেন তার ব্যাখ্যা হলো, তিনি শুধু তাদেরকেই শাস্তি দিতেন, যারা মৌখিক নিয়ত উচ্চস্বরে আওয়ায করে বলতো। সুতরাং এ ধরনের লোকদের শাস্তি দিতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের মাশায়েখদের মধ্যে যারা নিয়ত উচ্চারণ করাকে সুন্নাত বলেছেন তারা এদ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত বুঝাননি; বরং মাশায়েখদের সুন্নাত তথা পদ্ধতি বুঝিয়েছেন। (এটা পরবর্তীতে মাশায়েখগণ চালু করেছেন) যুগ-যামানা পরিবর্তন ও তাবেয়ীন পরবর্তী সময়ে মানুষের অন্তরে কাজের ব্যস্ততা অধিক হওয়ায়। ‘মারাকিউল ফালাহ’ গ্রন্থে আল্লামা শরমবুলালী রহ. এমনই বলেছেন। আর আল্লামা তাহতাবী রহ. ‘মারাকিউল

১ ইলাউস সুনান : ২/৬৬৩-৬৬৪ হাদীস নং ৬৪১ ও ৬৪২ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারুল ফিকর, বৈরুত)

ফালাহ' এর হাশিয়ায় বলেন, বাহরুর রায়েকে বলেছে, এসকল বর্ণনা ও উক্তি থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৌখিক উচ্চারণকে অন্তরের সংকল্পের সাথে একীভূত করার উদ্দেশ্যে এটা (মুখে নিয়ত করা) উত্তম একটি নতুন পদ্ধতি। হেদায়ার বক্তব্যের পর ফাতহুল কাদীয়ে বলেছে, স্বীয় সংকল্পের সাথে এক করার জন্য তা (মৌখিক নিয়ত) উত্তম।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, মৌখিক উচ্চারণকে কেউ নিয়তের শর্ত অথবা নিয়তের মূলরূপ বলে অভিহিত করেননি; বরং আসল নিয়তের সহায়ক হিসেবে তারা একে উল্লেখ করেছেন।

বিষয়টি আরো খোলাসা করে এভাবে বলা যায়, নিয়ত তো মূলত কলব বা অন্তরের কাজ। যেমন লিসানুল আরবে বলা হয়েছে, ^(১) النية عمل القلب অর্থাৎ নিয়ত হলো কলব বা অন্তরের কাজ। আল মানজিদে বলা হয়েছে, عزم ^(২) النية: القصد/ القلب অর্থাৎ নিয়ত হলো, ইচ্ছা করা বা মনের সংকল্প করা। বুঝা গেলো নিয়তের স্থান হলো কলব।

এখন যদি কেউ মনে কোনো বিষয়ের নিয়ত বা সংকল্প করে এবং মুখেও তার প্রকাশ ঘটায় তাহলে শরয়ী ও আভিধানিক কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হবে না যে, তার নিয়ত সহীহ হয়নি বা তার নিয়ত বাতিল হয়ে গিয়েছে; বরং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাই বলা হবে যে, তার নিয়ত আরো মযবুত ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেমনিভাবে মনে মনে কেউ ঈমান সংক্রান্ত সবগুলো বিষয় বিশ্বাস করলো এবং মুখেও তা স্বীকার করলো তাহলে তার মনে আনিত ঈমান মুখে স্বীকার করার কারণে তার কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ঈমানের বিষয়টি আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হবে। এছাড়া মুখে নিয়ত করা জরুরী কোনো বিষয় নয় যে, তা না করলে নামায ও ইবাদাতই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যার অন্তরের নিয়ত পরিস্কারভাবে আছে তার জন্য মুখে তা উচ্চারণ না করাই উচিত। আর যার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানী ও ব্যস্ততা আছে, যার কারণে মনে কোনো কিছু নিয়ত করা বা স্মরণ করা কষ্টকর হয়ে যায় তার জন্য সংশয় দূরীকরণে অন্তরে নিয়ত থাকা সত্ত্বেও মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ভালো।

১ লিসানুল আরব : ১৪/৩৭৯ (দারুত তাওফীকিয়া লিভুরাস, মিশর)-

২ আল মানজিদ : পৃ. নং ৮৪৯ (দারুল মাশরিক, বৈরুত)

মূলকথা হলো, মৌখিকভাবে নিয়ত করার মাসআলাটি শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে। কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিয়ত হলো অন্তরের কাজ এবং প্রায় প্রত্যেক ইবাদাতের জন্য বিশেষত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয়। বিষয়টি সহজ মনে হলেও সাধারণ লোকদের জন্য তা কঠিন বলেই বিবেচিত হয়। কারণ, তারা ভাবে নিয়ত কীভাবে আদায় হয়? মনে মনে নিয়ত করলে কী বলতে হবে? কতটুকু বলতে হবে আর কতটুকু বলতে হবে না? এ জাতীয় বিভিন্ন সংশয় ও ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত থাকে। ফুকাহায়ে কিরাম মূলত তাদের এ অসুবিধার কথা বুঝতে পেরে মনে মনে কী বলতে হয় তার একটি ধারণা দিলেন যে, উদাহরণস্বরূপ মনে মনে এভাবে বলবে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যোহরের চার রাকআত ফরয নামায এ ইমামের পিছনে পড়ছি। এটা মনে মনে হুবহু উচ্চারণ করাটাও জরুরী নয়; বরং এতোটুকু তার জানা থাকতে হবে যে, আমি কোন ওয়াক্তের কী নামায পড়ছি। এ কথাটিকেই বিভিন্নজন বিভিন্ন বাক্যে উচ্চারণ করে দেখিয়েছেন।

যাই হোক, নিয়তের ব্যাপারে মূল মাসআলা এটাই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় শুধু মনে মনে জানা থাকলেই যথেষ্ট হবে যে, আমি কোন আমল কীভাবে করছি। আর অন্তর স্থির না থাকলে বা নিয়ত না করার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির আশংকা থাকলে মুখেও তা উচ্চারণ করে নেয়া উত্তম ও ভালো।

৮ম পাঠ:

(আযান, ইকামাতের শব্দসংখ্যা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

আযানের শব্দগুলো দুবার এবং একামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মক্কা ও মদিনায় এখনো তা বিদ্যমান। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠাঃ ৫৮০ নং হাদীস।

জবাব:

আমরা বলি, মক্কা-মদীনায় তো তারাবীহ এখনো বিশ রাকআত পড়া হয়। অথচ আমাদের আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী ভাইগণ এ বিষয়ে অন্ধ থাকে বা দেখলেও তা আর মানুষের মাঝে এভাবে প্রচার করে না যে, ভাই সকল! মক্কা-মদীনায় তো তারাবীহ নামায এখনও বিশ রাকআত বিদ্যমান, তাই আসুন আমরা সবাই এর অনুসরণে তারাবীহ নামায বিশ রাকআত পড়ি। কারণ, এটা বললে তাদের আলবানী সাহেবের বিরোধিতা করা হয়। তিনি তো মহান ইমাম! তার আট রাকআত তারাবীহ নামাযের ফতোয়ার বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোনোকিছু দলীলযোগ্য হতে পারে না। তাই মক্কা-মদীনায় কী পড়া হলো বা করা হলো তা দেখার অবকাশ নেই। আলবানীকে মানতে হবে এটাই শেষ কথা। যদিও বাস্তবতা হলো বিশ রাকআত তারাবীহ মক্কা-মদীনায় সহস্রাধিক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে। আর আযান-ইকামাত ও নামাযের বর্তমান পদ্ধতি চালু হয়েছে সৌদী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে। সৌদি আরবের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয়।

যাই হোক, আমাদের মূল আলোচনা হলো, ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে নাকি আযানের মতোই দু'বার করে বলতে হবে? তো এ ব্যাপারে হানাফীদের প্রতিষ্ঠিত মাসআলা হলো, ইকামাত আযানের মতোই দু'বার করে বলবে। এর স্বপক্ষে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস পাওয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রধান মুআযযিন বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ অনেক সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ইকামাতও আযানের মতো দু'বার করে বলার কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে থেকে

আমরা এখানে ইকামাত সংক্রান্ত কিছু সহীহ, হাসান হাদীস এবং কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবার বর্ণনা উল্লেখ করছি।

১ নং হাদীস:

نا وَكَيْعٌ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةٍ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى وَقَعَدَ قَعْدَةً. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ فَلَقَّاهُ فَأَذَّنَ مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى وَقَعَدَ قَعْدَةً. (১)

অর্থাৎ আ. রহমান বিন আবী লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গীগণ (সাহাবা) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেনো দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত একব্যক্তি দেয়াল এর গোড়ায় দাঁড়ানো। এরপর তিনি দু'বার দু'বার (জোড় সংখ্যায়) শব্দ বলে আযান দিলেন এবং দু'বার দু'বার করে (আযানের মতোই) ইকামাত দিলেন এবং (মাঝে) কিছুক্ষণ বসলেন। তিনি বলেন, এরপর বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তা শুনে দাঁড়িয়ে দু'বার করে আযান দিলেন এবং দু'বার করেই ইকামাত দিলেন এবং মাঝে কিছুক্ষণ বসলেন।

এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত মযবুত এবং সহীহ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশারদ আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩১১-৩১২, হাদীস নং ২১৩১ (দারুল কিবলা, জেদ্দা),
সুনানে কুবরা-বাইহাকী : ১/৭৮৬ হাদীস নং ১৯৭৫ (দারুল হাদীস, মিশর), আল
আওসাত-ইবনে মুনিয়র : ৩/২৮ হাদীস নং ১১৭৯ (দারু তাইবা, রিয়াদ)
২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮২ (মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

ইমাম ইবনে দাকীক আল ঈদ রহ. স্বীয় আল ইমামে বলেন:

وهذا رجاله رجال الصحيح، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة وأن جهالة أسماءهم لا تضر. (১)

অর্থাৎ এ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি সাহাবায়ে কিরামের আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’ এর মাযহাব অনুসারে মুত্তাসিল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সূত্র পরম্পরায় সংযুক্ত) হাদীস। আর সাহাবীদের নাম অজানা থাকা হাদীসের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. তাঁর আল জাওহারুল্লাকীতে প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। (২)

ইমাম ইবনে হযম রহ. স্বীয় আল মুহাল্লাতে বলেন:

قال على: وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد كوفيين. (৩)

অর্থাৎ আবু মুহাম্মাদ আলী (ইমাম ইবনে হযম রহ.) বলেন যে, কূফাবাসীদের সনদে এটা অত্যন্ত বিশুদ্ধ পর্যায়ের একটি সনদ।

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন,

وَأَمْثَلُ إِسْنَادٍ رُوِيَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (৪)

অর্থাৎ দু'বার করে জোড় সংখ্যায় ইকামাত দেয়া সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে থেকে আ. রহমান বিন আবী লাইলার হাদীস (অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত হাদীস) উৎকৃষ্টতর হাদীস।

এসকল বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি লা-মাযহাবীদের প্রধান গুরু ও ইমাম শাইখ আলবানী পর্যন্ত তাঁর ‘আসসামারুল মুস্তাভাব’ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। (৫)

১ নাসবুর রায়া : ১/৩৪১ (মাকতাবাতু দারিল ঈমান, সাহারানপুর)

২ তালীক আলা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩১২ (দারুল কিবলা, জেদা)

৩ আল মুহাল্লা : ৩/১৩১ মাসআলা নং ৩৩১ (দারুল তুরাস, কায়রো)

৪ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৭৮৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৫ তালীক আলা সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৭৮৬ হা. নং ১৯৭৫ (দারুল হাদীস, কায়রো)

সুতরাং এ হাদীস এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইকামাত আযানের মতোই দুই দুই শব্দে জোড় সংখ্যায় হবে।

২ নং হাদীস:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: عَلَّمَهُ بِلَا لَا نَأْذَنَ مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَقَعَدَ قَعْدَةً. (৬)

অর্থাৎ আ. রহমান বিন আবী লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গীগণ (সাহাবীগণ) বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে আযান দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তার বর্ণনা দিলেন। তখন তিনি বললেন, এটা বেলালকে শিখিয়ে দাও। এরপর তিনি (আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) দু'বার দু'বার করে আযান দিলেন এবং দু'বার দু'বার করে ইকামাত দিলেন এবং (মাঝে) কিছুক্ষণ বসলেন।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৭)

অর্থাৎ আর এ হাদীসটির সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

এ সহীহ হাদীস থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আযান এবং ইকামাত উভয়ের শব্দই জোড় সংখ্যক করে হবে। এখান থেকে এটা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর স্বপ্নে দেখা আযান শুনে সমর্থনই করেননি; বরং সাথে সাথে তা উচ্চ আওয়াযবিশিষ্ট সাহাবী বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে তা শিখাতে বলেছেন। তখন তিনি বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে আযান

৬ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/১৩৪ হাদীস নং ৮২৪ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৭ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮২ (মাকতাবাতুল বুশরা, পাকিস্তান)

ও ইকামাত উভয়টিই জোড় জোড় সংখ্যায় উচ্চারণ করে শিখিয়ে দিলেন যেমনটি তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

৩ নং হাদীস:

عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمِيسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ. فَقَالَ: عِلْمُهُنَّ بِلَالًا. قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقِيمَ فَأَقَمْتُ. (১)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ তার পিতা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে (আব্দুল্লাহকে) স্বপ্নে আযান দু'বার দু'বার করে এবং ইকামাত দু'বার দু'বার করে দেখানো হলো। তিনি বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে (স্বপ্নের) বর্ণনা দিলাম। তখন তিনি বললেন, বেলালকে (আযানের) বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। তিনি বলেন, এরপর আমি সামনে অগ্রসর হলে আমাকে ইকামাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও সহীহ।

উক্ত হাদীসের শেষে فَأَقَمْتُ (সুতরাং আমি ইকামাত দিলাম) শব্দ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। এ সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আযানের মতোই ইকামাতের বাক্যগুলো দু'বার করে জোড় সংখ্যায় হবে।

৪ নং হাদীস:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ أَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى. (৩)

১ মুখতাসারু খিলাফিয়াতিল বাইহাকী : ১/৫০৫ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)

২ আদিরায়্যা (হেদায়ার সাথে সংযুক্ত) : ১/৮৮ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৩ মুস্তাখরাজু আবী আওয়ানা : ১/২৭৬ হাদীস নং ৯৬৫ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

অর্থাৎ ইমাম শাবী সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযান শুনেছি। তাঁর আযান ও ইকামাত ছিলো দু'বার দু'বার করে।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وهو مرسلٌ قوى. (৪)

অর্থাৎ এটি শক্তিশালী একটি মুরসাল হাদীস।

মুরসাল বলা হয়, যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে তার পরবর্তী বর্ণনাকারীর নাম থাকে। এ হাদীসটি মুরসাল হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, শাবীর মুরসাল মুহাদিসদের নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য বলে বিবেচিত।

হাফেয যাহাবী রহ. স্বীয় তাবাকাতুল হুফফাযে বলেন:

وقال أحمد العجلي: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحًا. (৫)

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইজলী রহ. বলেন, শাবীর মুরসাল হাদীস সহীহ। তিনি সহীহ হাদীস ছাড়া সাধারণত (কোনো যঈফ হাদীস) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন না।

ইমাম ইবনে আ. বার মালেকী রহ. স্বীয় আত তামহীদে বলেন:

وَكُلُّ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَدْلِيْسُهُ وَمُرْسَلُهُ مَقْبُولٌ. (৬)

অর্থাৎ যেসব রাবীদের ব্যাপারে জানা যাবে যে, তিনি সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী ছাড়া (দুর্বল কোনো রাবী থেকে) হাদীস গ্রহণ করেন না তাদের মুদাল্লাস এবং মুরসাল হাদীস গ্রহণীয়।

এসকল আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম শাবী রহ. কর্তৃক হাদীসটি মুরসাল হলেও তা বিশুদ্ধ এবং সহীহ। সুতরাং এ হাদীসটি ইকামাতের

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ তায়কিরাতুল হুফফায, যাহাবী : ১/৭৯-৮০ ক্রমিক নং ৭৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৬ আত তামহীদ : ১/৩০ মুকাদ্দামা (অযারাতু উমূমিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, মাগরিব)

শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে জোড় সংখ্যক হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট ও প্রমাণযোগ্য।

৫ নং হাদীস:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
عَامِرِ الْأَخْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْيِرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ
كَلِمَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (১)

অর্থাৎ আবু মাহযুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযান শিখিয়েছেন উনিশটি বাক্যে আর ইকামাত শিখিয়েছেন সতেরোটি বাক্যে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী রহ. বলেন, এটা একটি হাসান সহীহ হাদীস।

ইমাম তিরমিযী রহ. ছাড়াও অনেকেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম ইবনে দাকীক আল ঈদ রহ. স্বীয় আল ইমামে বলেন:

وهذا السند على شرط الصحيح. (২)

অর্থাৎ আর এ হাদীসের সনদটি সহীহ হাদীসের সনদের শর্তানুযায়ী।
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর আদিরায়াতে বলেন;

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ. (৩)

অর্থাৎ আর হাদীসটিকে ইমাম ইবনে খুযাইমাহ রহ. এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ হাদীসটি হানাফীদের দাবীর পক্ষে অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা, এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় সংখ্যার মাধ্যমে ইকামাতের বাক্য কয়টি হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে হাদীসটির মর্মার্থ দ্ব্যর্থহীন, যাতে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

১ সুনানে তিরমিযী : ১/৪৮ হাদীস নং ১৯২ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ),
মুসনাদে আহমাদ : ১২/১৫২-১৫৩ হাদীস নং ১৫৩১৭ (দারুল হাদীস, কায়রো)
২ নাসবুর রাযা : ১/৩৪২ (মাকাতাবাতু দারিল ঈমান, সাহারানপুর)
৩ আদিরায়াত ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া : ১/১১৪ হা. নং ১১৫ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

সতেরোটি বাক্য হলো: ‘আল্লাহ্ আকবার’ চারবার, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দু’বার, ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ দু’বার, ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ দু’বার, ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ দু’বার, ‘কাদ কামাতিস সালাহ’ দু’বার, ‘আল্লাহ্ আকবার’ দু’বার এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ একবার। সুতরাং ইকামাতের মোট বাক্যসংখ্যা হয় $8+2+2+2+2+2+2+1=19$ টি।

এ হাদীসের বিপরীত সহীহ বা যঈফ এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, যেখানে এরকম পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, ইকামাতের বাক্যসংখ্যা এগারটি। হ্যাঁ, কিছু কিছু হাদীসে এভাবে পাওয়া যায় যে, আযান হবে জোড় সংখ্যায় দু’বার দু’বার করে আর ইকামাত হবে বিজোড় সংখ্যায় একবার একবার করে।

যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتَرَ الْإِقَامَةَ
إِلَّا الْإِقَامَةَ. (8)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেনো আযান জোড় সংখ্যায় দেয় এবং ‘কাদ কামাতিস সালাহ’ ছাড়া ইকামাত বেজোড় সংখ্যায় দেয়।

পাঠক, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, এ হাদীসটি সহীহ ঠিক আছে, কিন্তু তাদের দাবীর পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট নয়। কেননা, এখানে (বেজোড় হওয়া) শব্দটির দু’টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক: শব্দগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইকামাতের বাক্যগুলো বিজোড় হওয়া, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার’ দু’বার না বলে একবার করে বলা, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দু’বার না বলে একবার করে বলা। এভাবে বাকীগুলোও, যা আযানে দু’বার করে বলা হতো এখানে একবার করে বলবে।

দুই: নিঃশ্বাস নেয়া ও উচ্চারণগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইকামাত বিজোড় হওয়া, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার’ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করবে, এভাবে ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দু'শ্বাসে না বলে একশ্বাসে উচ্চারণ করবে। তদ্রূপ বাকীগুলোও যা আযানে আলাদা আলাদা নিঃশ্বাসে দু'বার করে বলতে হতো তা এখানে বিজোড় তথা এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করবে। এ উভয় ব্যাখ্যা উক্ত হাদীসের জন্য প্রযোজ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করবো? এর উত্তরে হানাফী উলামায়ে কিরাম বলে, আমরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করবো। কারণ, এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে এ হাদীসের সাথে পূর্বোক্ত হাদীসের কোনো সংঘর্ষ হয় না, যে হাদীসে ইকামাতের বাক্য সতেরোটি বলা হয়েছে। এতে উভয় হাদীস অনুসারে আমল করা সম্ভবপর হয়। তা এভাবে যে, ইকামাতের বাক্য সংখ্যা সতেরোটিই হবে এবং এর বাক্যগুলোকে আযানের মতো আলাদা আলাদা নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করবে না; বরং এক নিঃশ্বাসে একটি বাক্য দু'বার করে উচ্চারণ করবে। তাহলে ইকামাতের বাক্য সতেরোটি হওয়ায় পূর্বোক্ত হাদীস অনুসারে আমল হলো আর এর বাক্যগুলো দু'বার জোড় নিঃশ্বাসে উচ্চারণ না করে একবার বিজোড় নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করায় পরে উল্লেখিত বুখারীর হাদীস অনুযায়ীও আমল হলো। এভাবে হানাফীগণ সব হাদীসের উপরই যথাসম্ভব আমল করার চেষ্টা করে। যেনো নবীজির কোনো হাদীস সহজে আমল থেকে বাদ না পড়ে।

এর বিপরীত আমাদের দেশের তথাকথিত আহলে হাদীসগণ পূর্বোক্ত হাদীসকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে শুধু পরের হাদীসের উপর আমল করে। অথচ পরের হাদীসটি দু'টি ব্যাখ্যায়ুক্ত হওয়ায় তাদের দাবীর পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নয়, যেখানে পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্ব্যর্থহীন ও অত্যন্ত স্পষ্ট এবং হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী রহ., ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহ.-সহ প্রমুখ সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় তারা একটি সহীহ হাদীস ত্যাগ করে অন্য একটি সহীহ হাদীস ধরলো আর আমরা যথাসম্ভব উভয় সহীহ হাদীসের উপর আমল করলাম। এরপরও নাকি তারাই আসল হাদীস অনুসারী আর আমরা হানাফীরা হাদীসবিরোধী! কোথায় ইনসাফ ও বাস্তবতা?

৬ নং হাদীস:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ

حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً..... وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (১)

অর্থাৎ আবু মাহযূরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযান শিখিয়েছেন উনিশটি বাক্যে এবং ইকামাত শিখিয়েছেন সতেরোটি বাক্যে।.....আর ইকামাতের বাক্যগুলো এরূপ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহু আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহু, হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

ইমাম ইবনে দাকীক আল ঈদ রহ. স্বীয় আল ইমামে বলেন:

رجالہ رجال الصَّحیح. (২)

অর্থাৎ এ হাদীসটির রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও সহীহ।

১ সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৩ হাদীস নং ৫০২ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ নাসবুর রায়া : ১/৩৪২ (মাকতাবাতুল দারিল ঈমান, সাহারানপুর)

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

ইমাম হাযেম রহ. এ হাদীসটিকে তাঁর ‘আন্নাসেখ ওয়াল মানসূখ’ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন:

حديث حسن. (১)

অর্থাৎ এটি একটি হাসান তথা উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস।

এ হাদীসটি মূলত ৫নং হাদীসের অনুরূপই, তবে এখানে আযান ও ইকামাতের যথাক্রমে উনিশটি ও সতেরোটি বাক্য উচ্চারণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এদ্বারা আরো পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, হানাফীরা যেভাবে সতেরোটি বাক্য উচ্চারণ করে ইকামাত দেয় তা সম্পূর্ণ সহীহ হাদীসভিত্তিক, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে শিখিয়েছেন।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা মারফু হাদীস তথা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করছিলাম। এ পর্যায়ে আমরা কিছু আসার তথা সাহাবা কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এর ইকামাত দেয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করবো।

১ নং আসর:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثْنِي الْأَذَانَ وَيُثْنِي الْإِقَامَةَ وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيُخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ. (২)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আযানও দিতেন জোড় সংখ্যায় দু'বার দু'বার করে এবং ইকামাতও দিতেন জোড় সংখ্যায় দু'বার দু'বার করে। আর তিনি (আযান, ইকামাত) তাকবীর বলে শুরু করতেন এবং তাকবীর বলে শেষ করতেন।

এর সব রাবীই উঁচু পর্যায়ের বিশ্বস্ত ও ইমাম। উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. স্বীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মুলহিমে বলেন:

১ বাযলুল মাজহুদ : ৩/২৯৭ (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

২ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ১/৪৬২-৪৬৩ হাদীস নং ১৭৯০ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

আল্লামা নিমবী রহ. অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন।^(৪)

২ নং আসর:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (৫)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বলেন যে, তার আযান ও ইকামাত ছিলো (জোড় সংখ্যায়) দু'বার দু'বার করে।

এ হাদীসটিরও সবগুলো রাবীই অত্যন্ত বড় মাপের ইমাম ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সুতরাং হাদীসটির সনদ নির্দিধায় সহীহ।

অনেকের ধারণা, আসওয়াদ রহ. বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি বা সরাসরি তার থেকে কিছু শ্রবণ করেননি। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। কারণ, ইমাম নাসায়ী রহ. আসওয়াদ রহ. সূত্রে একটি হাদীস এনেছেন, যেখানে তিনি (আসওয়াদ রহ.) বলেন, حَدَّثَنَا بِلَالٌ^(৬) অর্থাৎ বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এ সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন ও শুনেছেন।

এছাড়াও আল্লামা যাহাবী রহ. তাঁর তাযকিরাতুল হুফফায়ে আসওয়াদ রহ. এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

أَخَذَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحَذِيفَةَ وَبِلَالٍ وَالْكِبَارِ. (৭)

অর্থাৎ তিনি ইলম ও হাদীস শিখেছেন মুআয রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও বড় বড় সাহাবা থেকে।

৩ ফাতহুল মুলহিম : ৩/১৩৭ (মাকতাবাতু দারিল উলুম করাচী)

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ১/৪৬৩ হাদীস নং ১৭৯১ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৬ হাশিয়াতু আসারিস সুনান : পৃ. নং ৮৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৫১ ক্রমিক নং ২৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

এখান থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি সরাসরি বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদীস শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন।

এ দু'টি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রধান মুআযযিন বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ইকামাত ছিলো জোড় সংখ্যায় দু'বার দু'বার করে, যেমনটি হানাফীগণ বলে থাকে। ইকামতের ব্যাপারে মৌখিক হাদীসের সাথে সাথে সাহাবীদের বাস্তবিক আমল থাকায় এ মতটি আরো মযবুত ও সুদৃঢ় হলো।

৩ নং আসর:

حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنُ قَالَ: ثنا شَرِيْكُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالًا يُؤَدِّئُ مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى. (১)

অর্থাৎ সুওয়াইদ বিন গাফালা রহ. বলেন, আমি বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে দু'বার করে (জোড় সংখ্যায়) আযান দিতে এবং দু'বার করে (জোড় সংখ্যায়) ইকামাত দিতে শুনেছি।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده حسن. (২)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ হাসান তথা অতিউত্তম।

ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. বলেন:

وإسناده جيد. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ উৎকৃষ্ট ও ভালো।

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আযানের মতো ইকামাতও দু'বার করে বলতেন।

উল্লেখ্য যে, সুওয়াইদ রহ. যেহেতু তাবেয়ী তাই নিশ্চিতরূপে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু পরবর্তীই বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা

১ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/১৩৪ হাদীস নং ৮২৮ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ ফাতহুল মুলহিম : ৩/১৩৭ (মাকতাবাতু দারিল উলুম করাচী)

আনহু-কে জোড় সংখ্যায় ইকামাত দিতে দেখেছেন। সুতরাং এখানে এ অযুহাত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই যে, এটা ইসলামের প্রথমদিকে ছিলো, পরে রহিত হয়ে গেছে।

৪ নং আসর:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمْ يُذْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ
وَيُنِّي الْإِقَامَةَ - مَوْقُوفٌ. (৪)

অর্থাৎ সালামা বিন আকওয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি যখন লোকদের সাথে (জামাতে) নামায পেতেন না তখন নিজে আযান দিতেন ও ইকামাত দিতেন। আর ইকামাত (জোড় সংখ্যায়) দু'বার করে দিতেন। ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, এটি মাওকুফ তথা সাহাবীর হাদীস।

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম দারা কুতনী রহ. কর্তৃক মাওকুফ বলা ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য না করা প্রমাণ করে যে, হাদীসটির সনদে কোনো সমস্যা ও দুর্বলতা নেই।

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৫)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ সहीহ।

এ হাদীস থেকে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা বিন আকওয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ইকামাতের পদ্ধতি জানা গেলো যে, তিনি দু'বার করে জোড় সংখ্যায়ই ইকামাত দিতেন। আর এটা হতে পারে না যে, ইবাদাত বিষয়ক এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে না জেনেই চালু করবেন। সুতরাং এটাই বাস্তব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা জেনেই আমল করেছেন। এ জাতীয় হাদীসকে পরিভাষায় حكم الموقوف বলা হয়। অর্থাৎ

৪ সুনানে দারা কুতনী : ১/৪৫০ হাদীস নং ৯৩২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা সাহাবীর আমল বা বাণী মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই আমল বা বাণী।

৫ নং আসর:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ثَوْبَانُ يُؤَدِّنُ مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى. (১)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখরী রহ. বলেন যে, সাওবান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু দু'বার করে জোড় সংখ্যায় আযান দিতেন এবং দু'বার করে জোড় সংখ্যায় ইকামাত দিতেন।

এ হাদীস থেকে আরেক সাহাবী সাওবান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর আমল পাওয়া গেলো যে, তিনি আযানের মতো ইকামাতও দু'বার করে জোড় সংখ্যায় বলতেন।

এটি মুরসাল হাদীস হলেও সাধারণ কোনো মুরসাল নয়; বরং ইবরাহীম নাখরীর মুরসাল। আর হাদীস বিষয়ে সাধারণ ধারণা রাখে এমন সকলেরই জানা যে, ইবরাহীম নাখরীর মুরসাল কখনো যঈফ হতে পারে না। বরং মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সমুদ্রে ব্যবসা সংক্রান্ত ও নামাযে হাসলে নামায ও অযু ভঙ্গ হওয়া সংক্রান্ত দু'টি মুরসাল ছাড়া তার সবগুলো মুরসাল হাদীসই সহীহ বলে গণ্য। (২)

৬ নং আসর:

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ

يَقُولُ: الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى. وَأَتَى عَلَى مُؤَدِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: أَلَا جَعَلَتْهَا

مَثْنَى؟ لَا أُمَّ لِلْآخِرِ. (৩)

অর্থাৎ হাজান্না বিন কায়েস থেকে বর্ণিত যে, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন, আযান ও ইকামাত দু'বার করে। একবার তিনি এক

১ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/১৩৬ হাদীস নং ৭৩৭ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

২ তালীক আলা মুসান্নাফি ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১ হা. নং ১১২১ সংশ্লিষ্ট (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩২০ হাদীস নং ২১৪৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

মুআযযিনের নিকট আসলেন, যে একবার একবার বাক্য বলে ইকামাত দিচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, তুমি দু'বার বাক্য বলে কেন ইকামাত দিচ্ছে না? অন্য পদ্ধতির কোনো ভিত্তি নেই।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সহীহ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, হাদীসটির সনদ সহীহ।

এ হাদীস থেকে আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর অবস্থান জানা গেলো যে, তিনি একবার একবার বাক্য বলে ইকামাত দেয়ার পক্ষে ছিলেন না। এর জন্য তিনি তাকে ধমকও প্রদান করেন এবং ওটাকে ভিত্তিহীন বলেন।

বুঝা গেলো, একবার বাক্য বলে ইকামাত দেয়ার পদ্ধতি তাঁর নিকট সঠিক বলে বিবেচিত নয়; নতুবা তাকে তিনি ধমক দিতেন না।

৭ নং আসর:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاءَةَ قَالَ:
نَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ
وَالْإِقَامَةَ. (8)

অর্থাৎ আবু ইসহাক বলেন, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর শাগরিদরা আযান ও ইকামাত উভয়টিই জোড় সংখ্যায় দু'বার দু'বার বাক্য বলে দিতেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মতো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুও এ মত পোষণ করতেন যে, আযান ও ইকামাত উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যগুলো দু'বার দু'বার করে জোড় সংখ্যায় হবে। আর তাদের এ শিক্ষা তাদের সঙ্গীসাথী ও ছাত্ররা সবাই গ্রহণ করেছে।

জ্ঞান গরিমায় এ দু'জন যেহেতু সকল সাহাবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিধায় এটাই স্বাভাবিক যে, অন্যান্য গাইরে মুজতাহিদ সাহাবীরাও এক্ষেত্রে তাদের মতের অনুসারী ছিলেন। কারণ, সবারই এটা জানা ছিলো যে, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যতটুকু ইলম ও নৈকট্য অর্জন করেছেন দু'চারজন ছাড়া অন্যরা

ততটুকু অর্জন করতে পারেননি। তাই কোনো মাসআলায় এ দু'জনের একমত হওয়া তা সঠিক হওয়ার বড় একটি প্রমাণ।

৮ নং আসর:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ فِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ قَدْ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (১)

অর্থাৎ মুজাহিদ রহ. এর নিকট একবার একবার ইকামাতের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, এ পদ্ধতিটি তো পরবর্তী (উমাইয়া) আমীর-বাদশারা হালকা ও সহজকরণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করেছে। বাস্তবে ইকামাত তো দু'বার দু'বার করে।

আল্লামা নিমবী রহ. এটি উল্লেখ করে বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

এখান থেকে নতুন একটি বিষয় জানা গেলো যে, একবার একবার করে ইকামাত পূর্বে ছিলো না। এটা মূলত উমাইয়া আমীর-উমারাদের কাজ। তারা দ্রুততার সহিত নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে আযানের মতো যে ইকামাত দেয়া হতো তা অর্ধেক করে একবার করে ইকামাত চালু করে।

মূলত এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস ও আসার আছে, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, ইকামাত আযানের মতোই দু'বার করে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা তা ছেড়ে দিলাম। শেষে আহলে হাদীসদের মান্যবর এক ইমাম আল্লামা শাওকানী রহ. এর মন্তব্য উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের ইতি টানছি।

আল্লামা শাওকানী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ নাইলুল আওতারে বলেন,

٤٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ..... وَحَدِيثُ أَبِي مُحَمَّدُورَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، سَأَلَهُ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَذَكَرَ فِيهِ الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ. وَسَيَأْتِي مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْخُمْسَةُ: أَنَّ

১ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ১/৪৬৩ হাদীস নং ১৭৯৩ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৮৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمُهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مُتَأَخَّرٌ عَنْ حَدِيثِ بِلَالٍ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِإِيتَارِ الْإِقَامَةِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ لِأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَحْذُورَةً مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ، وَبِلَالًا أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَوَّلَ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ فَيَكُونُ نَاسِخًا. وَقَدْ رَوَى أَبُو الشَّيْخِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِمَنْى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ

. إِذَا عَرَفْتَ هَذَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ أَحَادِيثَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ صَالِحَةٌ لِلِاخْتِجَاجِ بِهَا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ. وَأَحَادِيثُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَصَحَّ مِنْهَا لِكَثْرَةِ طُرُقِهَا وَكَوْنِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنَّ أَحَادِيثَ التَّثْنِيَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ، فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا لَازِمٌ، لَا سِيَّمَا مَعَ تَأَخُّرِ تَارِيخِ بَعْضِهَا كَمَا عَرَفْنَاكَ. (৩)

অর্থাৎ ৪৯১ নং হাদীস: আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেনো সে জোড় সংখ্যায় দু'বার করে বাক্য বলে আযান দেয় এবং *قد قامت الصلاة* ছাড়া বাকী বাক্যগুলো বিজোড় সংখ্যায় বলে ইকামাত দেয়।..... আর আবু মাহযুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসটি (যাতে জোড় সংখ্যায় সতেরোটি বাক্যে ইকামাতের কথা এসেছে) সহীহ হাদীস। ইমাম হাযেমী রহ. হাদীসটিকে তাঁর 'আল্লাসেখ ওয়াল মানসুখ' গ্রন্থে এনেছেন এবং তাতে দু'বার দু'বার বাক্য বলে ইকামাতের কথা আছে। তিনি বলেন, এটি ইমাম আবু দাউদ রহ., ইমাম তিরমিযী রহ. ও ইমাম নাসায়ী রহ. এর শর্তানুযায়ী হাসান তথা উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস। আর শীঘ্রই ঐ হাদীসের আলোচনা আসছে, যা (ইমাম তিরমিযী রহ., আবু দাউদ রহ.সহ) পাঁচজন ইমাম স্ব স্ব গ্রন্থে এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উনিশটি বাক্যে আযান এবং সতেরোটি বাক্যে ইকামাত শিখিয়েছেন। এটা এমন একটি হাদীস, যা ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যরা সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। আর এটা বেলাল রাযিআল্লাহু

তাআলা আনহু এর হাদীস, যাতে ইকামাত বিজোড় সংখ্যায় দেয়ার নির্দেশ রয়েছে- এর তুলনায় পরের হাদীস। কেননা, (জোড় সংখ্যায় ইকামাত দেয়া সংক্রান্ত) হাদীসটি মক্কা বিজয়ের পরের কথা। যেহেতু আবু মাহযূরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তো মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতদের একজন (তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে আযান ইকামাত শিখানোর ঘটনা মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনাই হবে)। আর বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে তো বিজোড় সংখ্যায় ইকামাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো আযানের বিধান শুরু হওয়ার প্রাক্কালে। সুতরাং (আবু মাহযূরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ) হাদীসটি (বিজোড় সংখ্যায় ইকামাত দেয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে) রহিতকারী হবে। এছাড়াও আবুশ শাইখ রহ. বর্ণনা করেন যে, বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু মিনায় আযান দিয়েছিলেন জোড় সংখ্যায় দু'বার দু'বার বলে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ইকামাতও অনুরূপ (দু'বার দু'বার করে) দিয়েছিলেন।

ইমাম শাওকানী রহ. বলেন, যখন তুমি এটা জানতে পারলে তখন তোমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, দু'বার দু'বার বাক্য বলে ইকামাত দেয়ার হাদীসগুলো প্রমাণযোগ্য, যার কারণ আমরা পূর্বে বলে এসেছি। আর একবার করে ইকামাত দেয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো বুখারী মুসলিমে থাকায় ও এর সনদ অধিক হওয়ায় যদিও তুলনামূলকভাবে (দু'বার করে ইকামাত দেয়ার হাদীসগুলোর তুলনায়) অধিক বিশুদ্ধ, কিন্তু দু'বার করে ইকামাত বলার হাদীসগুলো যেহেতু অধিক সংখ্যক বাক্যকে ধারণকারী তাই এ হাদীস গ্রহণ করে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাই আবশ্যিক হবে। বিশেষত যখন (জানা গেলো যে,) জোড় সংখ্যায় ইকামাত বলা সংক্রান্ত কিছু হাদীস (একবার করে বিজোড় সংখ্যায় ইকামাত বলা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর তুলনায়) পরবর্তী সময়ের, যেমনটি আমরা তোমাকে অবগত করেছি।

আল্লামা শাওকানী রহ., লা-মাহযাবী আহলে হাদীসগণ যাকে গুরুজ্ঞান করে থাকে তিনিও এক্ষেত্রে বাস্তবতা স্বীকার করে ইনসাফ ও সত্য মেনে নেয়ার উত্তম এক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

তাঁর বক্তব্য থেকে দু'বার করে ইকামাত বলা সংক্রান্ত বিধান প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি ছাড়াও অতিরিক্ত আরো একটি বিষয় জানা যায়। আর তা হলো, কোনো হাদীস বুখারী, মুসলিমে থাকলেই অথবা হাদীস অধিক বিশুদ্ধ

হলেই চোখ বন্ধ করে তার উপর আমল করা যাবে না; বরং সেখানে আরো অনেক বিষয় দেখার থাকে। তন্মধ্য হতে অন্যতম একটি বিষয় হলো, রহিত হওয়া না হওয়ার বিষয়। কেননা, রহিত বিধান যতই বিশুদ্ধ হাদীসে থাকুক না কেন তার উপর আমল করা যাবে না।

যেমন সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (১) وَفِي رَوَايَةٍ بَعْدَ هَذِهِ - قَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (২)

অর্থাৎ যাবেদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণে অযু করতে হবে।

এর পরে অন্য একটি বর্ণনায় আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর অযু করো।

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আগুনে পাকানো খাদ্য যথা ভাত, রুটি, তরকারী ইত্যাদি খেলে অযু ভেঙ্গে যায়। হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ এ হাদীস অনুসারে আমল করে না। কারণ, এ বিধানটি পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। এরকম আরো অনেক বিধান রয়েছে, যেগুলো বুখারী, মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থাদিতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হলেও তদানুযায়ী আমল করা যায় না। কারণ, তা সব রহিত বিধান সংক্রান্ত হাদীস। মোটকথা দু'বার দু'বার করে জোড় সংখ্যায় ইকামাত দেয়ার হাদীসসমূহ সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণযোগ্য; বরং অন্যের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

১ সহীহ মুসলিম : ১/১৫৬-১৫৭ হাদীস নং ৩৫১ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৩৫৩

৯ম পাঠ: (আযান পরবর্তী দুআ সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

আযানের দোয়ার শেষে অতিরিক্ত শব্দ ওয়ারযুকনা বলা ভুয়া বরং তা বেদআত। এটা made in Bangladesh মক্কা ও মদিনায় made হয়নি। দোয়ায় ওআত্তা পর্যন্ত শেষ। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৪৩ নং পৃঃ ৫৮০ নং হাদীস।

জবাব:

আমরা বলি, আযানের দুআয় ‘ওয়ারযুকনা শাফাআতাহ্’ বৃদ্ধি করা হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয় যে, বাংলাদেশের হুজুরদের প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার ভুয়া মাসআলার তালিকায় এটি উল্লেখ করতে হবে আর আমাদের পক্ষ থেকে তার জবাব দিতে হবে।

হানাফী মাযহাবে আযানের পর ঐ দুআই পড়ার কথা বলা হয়েছে, যা সহীহ ও প্রমাণযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

এ ব্যাপারে আল্লামা শামী রহ. বলেন,

(قَوْلُهُ: وَيَدْعُو إِحْ) أَيُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا لِي الْوَسِيلَةَ..... وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِهِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ..... قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَزِيَادَةُ "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" وَخَتْمُهُ بِ"يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" لَا أَصِلَ لَهُمَا. (১)

১ রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী) : ২/৬৮ আযান অধ্যায়ের শেষাংশ (যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ)

অর্থাৎ আল্লামা হাসকাফী রহ. এর উক্তি ‘আযান শ্রবণকারী আযান শেষে দুআ পড়বে’- (আল্লামা শামী রহ. বলেন) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠের পর (দুআ পড়বে)। কেননা, ইমাম মুসলিম রহ.-সহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন) তোমরা যখন মুআযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন তার অনুরূপই তোমরা (আযানের শব্দগুলো) বলো এরপর আমার উপর দরুদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। এরপর তোমরা আমার জন্য ‘অসীলা’ প্রার্থনা করো।..... এবং ইমাম বুখারী রহ.-সহ অনেকেই বর্ণনা করেন যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন) যে ব্যক্তি আযান শোনা পরবর্তী বলবে ‘আল্লাহুমা রাক্বা হাযিহিদাওয়াতিত্তামাহ ওয়াসসালাতিল কায়িমাহ আতি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াত্তাহ’ কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ করা কর্তব্য হয়ে পড়বে। ইমাম বাইহাকী রহ. উক্ত দুআর শেষে অতিরিক্ত এ বাক্যটি এনেছেন- ‘ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ’।..... ইবনে হাজার রহ. শরহুল মিনহাজে বলেন, (আযানের দুআয়) ‘ওয়াদ দারাজাতার রাফীআহ’ বৃদ্ধি করা এবং ‘ইয়া আরহামার রাহিমীন’ বলে দুআ শেষ করা- এর কোনো ভিত্তি নেই।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর ফাতহুল কাদীরে অনুরূপ কথাই উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আযান পরবর্তী কোনো দুআ যে নির্দিষ্ট নেই; বরং এ ব্যাপারে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন:

وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ كَمَا

يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلِّ تَعَطُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الْقَائِمَةُ وَالصَّلَاةُ النَّافِعَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّي رِضًا لَا سَخَطَ بَعْدَهُ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتُهُ. وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ وَالْقَصْدُ الْحُثُّ عَلَى الْخَيْرِ. (۱)

অর্থাৎ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (আরো) বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শোনা পরবর্তী বলবে ‘ওয়া আনা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু রাসীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাসূলা’ তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. ও তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি (এসে) বললো হে আল্লাহর রাসূল, মুআযযিনগণ তো আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে গেলো (তাহলে আমরা কী করবো?) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুআযযিনগণ যা বলে তুমিও তাই বলো। এরপর যখন বলা শেষ করবে তখন (তোমার ইচ্ছামতো) প্রার্থনা করো তা তোমাকে দেয়া হবে। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ., নাসায়ী রহ. এবং ইবনে হিব্বান রহ. স্বীয় সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তাবরানী রহ. তাঁর আওসাতে এবং ইমাম আহমাদ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান দেয়া পরবর্তী সময়ে বলবে ‘আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদাওয়াতিল কায়িমাহ

ওয়াসসালাতিনাফিয়াহ সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ারযা আন্না রিয়ান লা সাখাত বা'দাহ' আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন। ইমাম তাবরানীর কাবীরে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আযান শুনবে অতঃপর বলবে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া বাল্লিগহু দারাজাতাল ওয়াসিলাহ ইনদাকা ওয়াজআলনা ফী শাফাআতিহী ইয়াউমাল কিয়ামাহ' তার জন্য (আমার) সুপারিশ করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। মূলত এ (আযানের দুআ সংক্রান্ত) অধ্যায়ে হাদীস অনেক রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ভালো কাজে (দুআর মাধ্যমে) উৎসাহিত করা।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এ দু'টি গ্রন্থসহ আরো অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় যে, আযানের দুআয় 'ওয়ারযুকনা শাফাআতাহ' বাক্যটি বৃদ্ধি করা হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়। এটা হয়তো সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচলন আছে। তারা না বুঝে অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের একটি ভুলকে বাংলাদেশের হুজুরদের প্রতিষ্ঠিত ভূয়া মাসআলা বলে চালিয়ে দেয়া এবং লিফলেট আকারে তা প্রচার করা কোন ধরনের আমানতদারি ও ইনসাফ, তা একটু ভেবে দেখা উচিত। মনে রাখতে হবে, হানাফীগণ কখনো হাদীসবিরোধী কথা বলে না এবং কুরআন-হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দেয় না।

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে 'ওয়ারযুকনা শাফাআতাহ' বৃদ্ধির কথা তো নেই-ই; বরং ফাতওয়ায়ে শামীতে আযানের দুআয় 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআহ' বাক্য বৃদ্ধি করা এবং 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' বলে দুআ শেষ করাকে ভিত্তিহীন পর্যন্ত বলা হয়েছে, যা অনেক জায়গাতেই প্রচলিত আছে। সুতরাং আযানের দুআ এটাই, যা আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বুখারীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন 'আল্লাহুমা রাব্বা হাযিহিদাওয়াতিত্তামাহ ওয়াসসালাতিল কাযিমাহ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ ওয়াবআসলু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াতাহ।

অবশ্য হানাফী ফকীহগণ সুনানে বাইহাকীর একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করে উক্ত দুআর শেষে إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ (ইন্বাকা লা তুখলিফুল মীআদ) বাক্যটি

বৃদ্ধি করার অবকাশ দিয়েছেন। বাইহাকীর এ বর্ণনাটি ইমাম কাশমীহিনী রহ. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীতেও উল্লেখ আছে। (ভারত উপমহাদেশে অবশ্য বুখারীর যে নুসখাটি বিদ্যমান তা কাশমীহিনী রহ. কর্তৃক বুখারী নয়; বরং তা হলো ইমাম ফিরাবরী রহ. এর বর্ণিত নুসখা।) বাইহাকীর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدَ الْقَامِيُّ قَالَا:
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ "
.....وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ" إِلَّا حَلَّتْ
لَهُ شَفَاعَتِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عِيَّاشٍ. (১)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনা পরবর্তী বলবে, ‘আল্লাহুম্মা..... ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াত্তাহ ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ’ তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারীতে আলী বিন আইয়াশ রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সম্ভবত ইমাম বাইহাকী রহ. সহীহ বুখারী বলতে ইমাম কাশমীহিনী রহ. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারী বুঝিয়েছেন, যা বর্তমান আমাদের কাছে নেই।

যাই হোক হাদীসটি সর্বাবস্থায়ই সহীহ। স্বয়ং ইমাম বাইহাকী রহ. যে সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

সুনানে বাইহাকীর নিচে সংযোজিত টীকায় বলা হয়েছে:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات حفاظ أئمة. وعليه فالحديث صحيح لا

علة له. (২)

১ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৭৬৯ হাদীস নং ১৯৩৩ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ তালীক আলা সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৭৬৯ হাদীস নং ১৯৩৩ সংশ্লিষ্ট (দারুল হাদীস, কায়রো)

অর্থাৎ এটি এমন একটি সনদ, যার সবগুলো রাবী (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য হাফেযে হাদীস ও ইমাম। সুতরাং এ ভিত্তিতে হাদীসটি নির্দিধায় সহীহ, যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি নেই।

তাই এ হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত দুআর শেষে 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ' বৃদ্ধি করলে কোনো অসুবিধা নেই; বরং দুআয় বাক্য বৃদ্ধি হওয়ায় তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, আযানের দুআ বিভিন্ন রকমে বর্ণিত হয়েছে। এটা শুধু প্রসিদ্ধ দুআর সাথে খাস নয়; বরং এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত যে কোনো একটি দুআ পড়লেই বর্ণিত ফযীলত পাওয়া যাবে। বরং সম্ভব হলে সবগুলো দুআ একসাথে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই, তা আরো বেশী উত্তম হবে।

১০ম পাঠ:

(যোহর ও আসরের সময় সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাযের সময় সম্পর্কে যোহর এবং আসরের নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে দেরীতে আদায় করা হয়, তা একেবারেই ভুয়া। যোহরের নামাজ সূর্য হেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতে হবে। এবং আসরের নামাজ বস্তুর ছায়া তার সমান পরিমাণ হয়ে গেলেই আসরের নামাজ পরতে হবে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দেখুনঃ বোঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৫১৭, ৫১৮ নং হাদীস।

জবাব:

এখানে মূলত দু'টি দাবী করা হয়েছে। এক: সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে যোহরের নামায পড়তে হবে। যেনো এর চেয়ে একটু দেরী করলে নামাযই হবে না। দুই: বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে আসরের সময় হয়ে যায়।

আমরা বলবো, প্রথম দাবীটি নিতান্তই অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিদ্বেষপূর্ণ দাবী। এটা এমনই একটি মিথ্যা ও উদ্ভট উক্তি, যার উপর স্বয়ং এর দাবীদারগণও আমল করে না। শুধু বর্তমান বাংলাদেশ বা বিশ্ব নয়; বরং ইসলামী ইতিহাসের সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশ শতাব্দি কাল যাবত আমরা এমন কোনো মসজিদের কথা জানি না, যেখানে সূর্য হেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোহরের নামায আদায় করা হতো। সুতরাং এরকম একটি উদ্ভট দাবীর উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবুও সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য করে এখানে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করা সমতীন মনে করছি, যদ্বারা এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া মাত্রই নামাযের সময় শুরু হয়ে গেলেও তখনই নামায পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা ছিলো না; বরং আযান পরবর্তী কিছু দেরী করা এবং ঋতুভেদে অনেক দেরী করে পড়াই হলো সুনাত তরীকা। আর দ্বিতীয় দাবীটিও বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় গ্রহণীয় নয়।

প্রথমত: আমরা হাদীসের ভাষায় দেখবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায কখন আদায় করতেন, সূর্য হেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ঋতুভেদে একটু কমবেশী দেরি করে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সূর্য হেলে যাওয়া মাত্রই নামায শুরু করার নিয়ম ছিলো না; বরং নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দেয়া হতো। তারপর সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপেক্ষা করতেন। যখন তিনি নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন ইকামাত দিয়ে নামায শুরু করা হতো।

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে:

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَخَضَتْ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ. (১)

অর্থাৎ জাবের ইবনে সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন সূর্য হেলে যেতো তখন বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। যখন তিনি তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখতেন তখনই ইকামাত শুরু করতেন।

সুনানে বাইহাকীতে সামান্য শব্দের কমবেশী সহকারে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَخَضَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَاهُ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ. (২)

১ সহীহ মুসলিম : ১/২২১ হাদীস নং ১৪০০ (কদীমী কুতুবখানা, করাচী)

২ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ১/৫৬৬ হাদীস নং ১৮০৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ জাবের ইবনে সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন সূর্য হেলে যেতো তখন বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখা পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। যখন তিনি তাঁকে দেখতে পেতেন তখন দেখামাত্রই ইকামাত শুরু করতেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. আবু খাইসামা রহ. সূত্রে স্বীয় সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসদ্বয় থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর যোহরের আযান দেয়া হতো। এরপর তাৎক্ষণিকভাবেই নামায শুরু করা হতো না; বরং ইমাম তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হতো এবং ইতিমধ্যে সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম বাড়ি থেকে মসজিদে আসতেন এবং সূনাত, নফল যথারীতি সম্পন্ন করে অপেক্ষা করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলে ইকামাত দিয়ে নামায শুরু করা হতো।

সুতরাং যোহরের নামায সূর্য হেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা আবশ্যিক হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও হাদীসবিরোধী। আর এভাবেই হাদীসের অনুসারী দাবীদারগণ হাদীসবিরোধী আমলকে সমাজে হাদীস বলে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে।

তথাপি হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল যোহরের নামাযের ক্ষেত্রে দু'ধরনের ছিলো। এক: শীতকালে সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায তুলনামূলকভাবে একটু আগেভাগে আদায় করতেন। দুই: গরমকালে তিনি একটু দেরীতে যোহরের নামায পড়তেন; এমন সময়ে যখন সূর্যের তীব্রতা ও প্রখরতা কমে আসতো।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ. (১)

অর্থাৎ আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে আসে। সুফইয়ান রহ., ইয়াহইয়া রহ. ও আবু আওয়ানা রহ. আমাশ রহ. থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَدْنَى مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: انْتَظِرِ انْتَظِرِ، وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ- حَتَّى رَأَيْنَا فِيَّ التُّلُولَ- فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. (২)

অর্থাৎ আবু যর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুআযযিন যোহরের আযান দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠাণ্ডা করো, ঠাণ্ডা করো বা বললেন, অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো এবং বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে আসে। (আবু যর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,) এমনকি একপর্যায়ে আমরা নিচু ছোট ছোট টিলার ছায়া দেখতে পেলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,) সুতরাং যখন গরম তীব্র হবে তখন তোমরা (যোহরের) নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো।

অনুরূপভাবে নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় এসেছে:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلَ. (৩)

অর্থাৎ আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন গরমকাল আসতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (যোহরের) নামায (সূর্যের তাপ কমলে) ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করতেন। আর যখন শীতকাল আসতো তখন তিনি (তুলনামূলকভাবে একটু) জলদি নামায পড়তেন।

২ প্রাগুক্ত : ৯০-৯১ হাদীস নং ৫৩৫ (দারুস সালাম, রিয়াদ)

৩ সুনানে নাসায়ী : ১/৩৬৪ হাদীস নং ৪৯৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

এসকল হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলা মাত্রই যোহরের নামায পড়ার নিয়ম সুন্নাত পরিপন্থী; বরং নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হলে প্রথমে আযান দিবে এরপর লোকজন মসজিদে আসবে এবং সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আদায় করে ইমাম আসার অপেক্ষা করবে। যথাসময়ে ইমাম আসলে ইকামাত দিয়ে নামায শুরু করবে। আর এ যথাসময়ও মওসুমভেদে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং গরমকালে দেরী করে, রোদের প্রকোপ কমলেই নামায শুরু করবে এবং শীতকালে একটু তাড়াতাড়িই নামায শুরু করবে। এটাই সুন্নাহভিত্তিক পদ্ধতি।

আমাদের জানামতে, বাংলাদেশে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। গরমকালে যোহরের নামায দেরিতে তথা ১.৩০ কোথাও ১.৪৫ এবং কোথাও ২.০০ টায় নামায পড়া হয়। আর শীতকালে একটু তাড়াতাড়ি তথা ১.০০ বা কোথাও ১.১৫ তে নামায শুরু করা হয়। সুতরাং লিফলেটে উল্লেখিত দাবি - যোহরের নামায ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা হয়- সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া। হাদীস এবং এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এমন দাবি করতে পারে। আসরের নামায দেরি করার বিষয়টিও অলসতাবশত নয়; বরং যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ না হওয়ায় আসরের নামায শুরু করা হয় না।

লিফলেটে দাবি করা হয়েছে, বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে আসরের সময় হয়ে যায়। অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এখন আমরা হাদীসের আলোকে দেখবো, বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় নাকি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে?

এখানে প্রথমত আমরা দেখাবো যে, বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলেও যোহরের সময় শেষ হয় না; বরং তখনও যোহরের নামায পড়া যায়। দ্বিতীয়ত প্রমাণ করবো যে, বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়, এর পূর্বে নয়।

মু'জামে আওসাতে দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ ثَنَا أَبِي نَا
رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَارِيُّ ثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي

رَبَّاحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ..... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ حِينَ ذَلَكْتَ الشَّمْسُ، فَأَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَأَقَامَ وَصَلَّى. (১)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামাযের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। এরপর বেলাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু পরেরদিন যোহরের আযান দিলেন যখন সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায আদায়ে দেরি করলেন; এমনকি প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গেলো। এরপর ইকামাত দিলে তিনি যোহরের নামায পড়ালেন।

ইমাম হাইসামী রহ. হাদীসটি মাজমাউয যাওয়ায়েদে বর্ণনা করে বলেন:

رواه الطبرانی في الأوسط، وإسناده حسن. (২)

অর্থাৎ ইমাম তাবরানী রহ. স্বীয় মু'জামে আওসাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদ হাসান (অতি উত্তম)।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পরই যোহরের নামায পড়েছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো, বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় না, যেমনটি দাবী করে লা-মাযাহাবীগণ।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

১ আল মু'জামুল আওসাত, তাবরানী : ৭/৩৯-৪০ হাদীস নং ৬৭৮৭ (দারুল হারামাইন, কায়রো)

২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাস্বাউল ফাওয়ায়েদ : ২/৪২ হাদীস নং ১৬৮৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِرَاطًا قِرَاطًا. ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِرَاطًا قِرَاطًا. ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطَيْنَا قِرَاطَيْنِ قِرَاطَيْنِ. فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِرَاطَيْنِ قِرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِرَاطًا قِرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا! قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ. (۱)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হলো আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিলো। তারা তদানুসারে কাজ করতে লাগলো, যখন দুপুর হলো তখন তারা অপারগ হয়ে পড়লো। তাদের এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। তারপর ইনজীল অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হলো। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়লো। তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হলো। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। আমাদের দুই দুই কীরাত করে দেয়া হলো। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই কীরাত করে দান করেছেন আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে, অথচ আমরাই অধিক আমলকারী। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করেছি? তারা বললো, না। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, এ হলো আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই।

একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এ হাদীস থেকে যোহরের ও আসরের ওয়াক্ত সম্বন্ধে পরোক্ষ একটি ধারণা পাওয়া যায়। তা এই যে, ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত সময় অনেক দীর্ঘ। আর এ দীর্ঘ সময়ে আমল করেছে ইয়াহুদীগণ। এরপর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করেছে নাসারাগণ আর মুসলমানরা কাজ করেছে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

লক্ষ্যণীয় যে, হাদীসটির শুরু এবং শেষাংশ দেখলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ফজর থেকে নিয়ে যোহর পর্যন্ত সময় এবং যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘতা তুলনামূলকভাবে আসর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদী-নাসারার তুলনায় এ উম্মাতের স্থায়িত্ব তথা বয়স ও সময় তুলনা করতে গিয়ে এ তিনটি সময়ের উদাহরণ দিয়েছেন। ইয়াহুদীগণ পূর্ববর্তী উম্মাত হওয়ার সুবাদে তারা সবচেয়ে বেশী বয়স ও সময় পেয়েছে। এজন্য তাদের সময়ের তুলনা করা হয়েছে সকাল থেকে দুপুর তথা যোহর পর্যন্ত সময়ের সাথে। এরপর বেশী বয়স পেয়েছে নাসারাগণ, যা ইয়াহুদীদের বয়সের তুলনায় কম তাই তাদের বয়স ও সময়ের তুলনা করা হয়েছে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের সাথে। এরপর উম্মাতে মুহাম্মাদীর বয়স ও সময় পূর্ববর্তী দুই উম্মাতের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় তাদের সময়ের তুলনা করা হয়েছে আসর থেকে মাগরিব তথা সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে। এ তুলনাটি করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তুলনা করতে গিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর বয়স ও সময়কে আসর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের সাথে তুলনা করা তখনই সঠিক হবে যখন এ কথা মানা হবে যে, আসর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘতা যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘতার চেয়ে অনেক কম হবে।

এভাবে ইয়াহুদী ও নাসারাগণের অভিযোগ -আমরা বেশী কাজ করেও এক কীরাত পেলাম আর তারা (উম্মাতের মুহাম্মাদী) কম সময় কাজ করে দুই কীরাত করে পেলো- তখনই করা সম্ভব যখন এ কথা মানা হবে যে, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের চেয়ে কম। মোটকথা, এ হাদীসে আসর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত সময় যে যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত সময়ের চেয়ে কম বুঝানো হয়েছে তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

প্রিয় পাঠক! এখন আপনিই বিবেচনা করে দেখুন যে, যদি যোহরের শেষ সময় বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত হয় এবং এখান থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসর নামাযের ওয়াক্ত ধরা হয় তাহলে যোহর নামায থেকে আসর নামাযের সময় পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘতা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘতার চেয়ে অনেক কম হয়ে যায়, যা সরাসরি বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যোহরের সময় বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত নয়; বরং এর পরও আরো অনেক সময় পর্যন্ত যোহরের সময় বাকী থাকে। অর্থাৎ বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এবং এরপর থেকেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়, যা অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায়।

যেমন বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَدْنَى مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: انْتَظِرِ انْتَظِرْ وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ- حَتَّى رَأَيْنَا فِيَّ التُّلُولَ- فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. (১)

অর্থাৎ আবু যর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুআযযিন যোহরের আযান দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠাণ্ডা করো, ঠাণ্ডা করো বা বললেন, অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো এবং বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে আসে। (আবু যর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,) এমনকি একপর্যায়ে আমরা নিচু ছোট ছোট টিলার ছায়া দেখতে পেলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,) সুতরাং যখন গরম তীব্র হবে তখন তোমরা (যোহরের) নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো।

এ হাদীসটিতে বলা হয়েছে, যোহরের নামায তখন পড়া হয়েছিলো যখন মরুভূমির ছোট ছোট টিলার ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো। এসব টিলা পাহাড়ের মতো উঁচু না, বরং সামান্য উঁচু হয়ে ঢালু আকৃতিতে দীর্ঘায়িত হতে হতে সমতল মরুভূমির সাথে মিশে থাকে। এ কারণে এগুলোর ছায়া সাধারণত

বিকাল হওয়ার কিছু পূর্ব থেকে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, এর আগে নয়। তাই বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলেও এসব টিলার কোনো ছায়াই তখন চোখে পড়ে না।

বাস্তবতার আলোকে দেখা গেছে, এসব টিলার ছায়া তখনই দেখা যায় যখন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার কাছাকাছি, যা বিকালের পূর্বমুহূর্ত। আর বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

এ সম্বন্ধে মুআত্তা মালেকে বর্ণিত সাহাবীর ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি সহীহ হাদীস দেখুন:

مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أَخْبِرُكَ صَلَّ الظُّهْرُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلْثِ اللَّيْلِ وَصَلَّ الصُّبْحُ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ. (২)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা এর আযাদকৃত দাস আব্দুল্লাহ বিন রাফে রহ. আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নামাযের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, যখন তোমার ছায়া বরাবর হয়ে যাবে তখন যোহরের নামায পড়ো এবং ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়ে যাবে তখন আসরের নামায পড়ো এবং সূর্য ডুবে গেলে মাগরিবের নামায পড়ো এবং রাতের এক তৃতীয়াংশের পূর্বে মাঝামাঝি সময়ে ইশার নামায পড়ো এবং অন্ধকার থাকতে থাকতে ফজরের নামায পড়ো।

উল্লেখ্য, যারা হাদীস এবং উলূমে হাদীস সম্বন্ধে ধারণা রাখেন, তাদের এ কথা অজানা নয় যে, কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত কোনো বর্ণনা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্বোধিত করা হয়নি, তা যদি এমন বিধান সম্বলিত বর্ণনা হয়, যা কিয়াস ও ইজতিহাদ করে বলা যায় না এবং তা পূর্ববর্তী কোনো কিতাব যথা তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদি থেকেও সংগৃহীত নয়

তাহলে তা হাদীসে মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্যাদা রাখে। বলা বাহুল্য যে, নামাযের সময় নির্ধারণ এমন একটি বিধান, যা অনুমান ও ইজতিহাদ করে বলা যায় না এবং আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সাধারণত পূর্ববর্তী কোনো কিতাবের বিধান বর্ণনাও করতেন না। সুতরাং বলা যায়, উপরোক্ত হাদীসটি বাহ্যত সাহাবী আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস মনে হলেও বাস্তবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই হাদীস।

এ হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, বস্তুর ছায়া তার বরাবর হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় না, যেমনটি মনে করে লা-মাযহাবীগণ। আর এটাও জানা গেলো যে, বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আসরের নামায পড়বে। কেননা, তখন থেকেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

বি. দ্র.: যোহরের শেষ তথা আসরের শুরু ওয়াক্ত নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে বড় ধরনের মতানৈক্য বিদ্যমান। কারো মতে বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় আর কারো মতে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হলে। আবার কারো মতে বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া থেকে শুরু করে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত সময়টি যোহর-আসর উভয়ের ওয়াক্ত। অর্থাৎ এ সময়ে যোহর পড়লেও আদায় হবে এবং আসর পড়লেও নামায ওয়াক্ত মতো পড়া হয়েছে বলেই ধরা হবে। আর কারো মতে এ সময়টি বেকার তথা এটা না যোহরের সময় আর না আসরের সময়। যেরকমভাবে সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলা পর্যন্ত সময়টি বেকার তথা কোনো নামাযের ওয়াক্ত নয়। তবে অধিকাংশ উলামা এ শেষোক্ত দু'টি মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অধিকাংশ উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের মধ্য থেকে একটি অংশ প্রথম মতের অনুসারী এবং আরেকটি অংশ দ্বিতীয় মতের অনুসারী। দু'টি মতের পক্ষে-বিপক্ষেই দলীল প্রমাণ রয়েছে। আমরা সেদিকে যাবো না। তবে আপনি যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করেন তাহলে প্রথম মতের চেয়ে দ্বিতীয় মতের মধ্যেই অধিক সতর্কতা ও সাবধানতা দেখতে পাবেন।

বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলি, উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, নামায ওয়াক্ত আসার পূর্বে আদায় করলে উক্ত নামায আদায়ই হয় না। কেননা, নামাযের জন্য আল্লাহ তাআলা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. (১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।

এ কারণেই সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, ওয়াক্তের পূর্বে নামায পড়লে তা আদায় হয় না। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর উক্ত নামায পড়লে তা কাযা নামায হলেও বিশুদ্ধ হবে। সুতরাং তর্কের খাতিরে আমরা প্রথম দু'টি মতকে পর্যায়ক্রমে ভুল ও সঠিক আখ্যা দিয়ে পর্যালোচনা করে দেখি, কোন মতটি অধিক সতর্কতা সম্বলিত ও নিরাপদ?

আমরা প্রথমে তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে, যোহরের ওয়াক্ত বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্তই থাকে, এর পর থেকে আসরের সময় শুরু হয়। এখন যে ব্যক্তি আমাদের মতানুসারে যোহরের নামায বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পর আদায় করলো তার নামাযটি তাদের দৃষ্টিতে কাযা হলেও বিশুদ্ধ হয়ে গেছে। আর সে যেহেতু বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরই আসরের নামায পড়বে তাই তার আসরের নামাযও যথানিয়মেই আদায় হবে।

পক্ষান্তরে যদি তর্কের খাতিরে তারা এ কথা মেনে নেয় যে, যোহরের ওয়াক্ত বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত থাকে এবং এর পরেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় তাহলে যে ব্যক্তি যোহরের নামায বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ বা দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বে আদায় করবে উভয় অবস্থাতেই নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আসরের নামায বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়ার পর অর্থাৎ ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বেই আদায় করবে (যেমনটি লা-মাযহাবীগণ করে থাকে) তার তো নামাযই হবে না। কেননা, এখনও আসরের ওয়াক্ত শুরুই হয়নি।

মোটকথা, যদি প্রথম মতটি সঠিক ধরা হয় তাহলে হানারফীরা যারা যোহরের নামায বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পর পড়বে তাদের নামায আদায় হিসেবে না হলেও কাযা নামায হিসেবে শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় মতটি সঠিক ভাবা হয় তাহলে যেসব লা-মাযহাবীগণ আসরের নামায বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বেই পড়ে নিবে তাদের নামাযই হবে না, না আদায় হিসেবে আর না কাযা হিসেবে।

এ কারণেই হানাফী ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, যোহরের নামায বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পূর্বেই পড়ে নিবেন। এটাই সবচে নিরাপদ। শুধু শুধু অলসতা করে বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পরে নামায পড়ার অভ্যাস করা কিছুতেই উচিত হবে না। আর লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আসরের নামায বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরেই পড়বেন। এতে আপনার নামায কাযাও হবে না এবং সওয়াবও কম হবে না; বরং তা আপনার আসরের নামাযকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করবে।

এতোক্ষণ যা বলা হলো, তা ছিলো সমঝোতার কথা। অর্থাৎ এভাবে উভয় মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ একটি নিরাপদ পন্থা অনুসরণ করা। নতুবা আমাদের প্রমাণাদি এ ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী ও মযবুত। তাই এ সম্বন্ধে অশালীন মন্তব্য করা একেবারেই অনুচিত ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

১১তম পাঠ

জায়নামাযে দাঁড়ানোর দুআ সংক্রান্ত

অভিযোগ:

জায়নামাজে দাড়িয়ে ইন্নিওজাহতু বলা ভুয়া। এটা একটি কোরআনের সূরা আনআমের ৮১ নং আয়াত। রাসূলুল্লাহ সাঃ বা তার কোনো সাহাবী এরকম আয়াত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জবাব:

দুআটির সঠিক উচ্চারণ হবে 'ইন্নি অজ্জাহতু অজহিয়া.....'। তথাপি এটা যে জায়নামাযে দাঁড়ানোর দুআ, তা বাংলাদেশের আলেমদের নিকট প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয় যে, তা এ লিফলেটে উল্লেখ করতে হবে। এটা আলেমদের প্রতি মিথ্যা একটি অভিযোগ। এছাড়াও এটা শুধু সূরা আনআমের একটি আয়াত বলাও যথেষ্ট নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দু'টি স্থানে এ দুআটি পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক: দুম্বা কুরবানী করার সময়।

সুনানে দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (১)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন দু'টি মেষ

কুরবানী দিলেন। যখন মেঘ দুটিকে কিবলামুখী করে শোয়ালেন তখন পড়লেন- ‘ইন্নি অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা শারীকা লাহু ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন’।

দুই: রাতের নফল নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (১)

وفي رواية بعد هذه: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (২)

অর্থাৎ আলী বিন আবী তালেব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, ‘অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা শারীকা লাহু ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন’।

অবশ্য এ বর্ণনাটির পরের বর্ণনায় (‘ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন’ এর পরিবর্তে) ‘ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন’ আছে।

মুসলিম শরীফে এ দুআটি এরপরে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআটি সাধারণত রাতের নামাযে

১ সহীহ মুসলিম : ১/২৬৩ হাদীস নং ৭৭০ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ প্রাগুক্ত

পড়তেন। এজন্যই ইমাম নববী রহ. এ হাদীসের জন্য باب তথা শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন-

باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بالليل. (৩)

অর্থাৎ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআ ও নামায সংক্রান্ত অধ্যায়।

আর তা শুধু নফল নামাযেই পড়তেন। প্রথমে তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন। তারপর উক্ত দীর্ঘ দুআটি পাঠ করে এরপর কিরাত পড়তেন। হাদীসের একাধিক কিতাবে উক্ত বিষয়টির উল্লেখ আছে।

যেমন সুনানে নাসায়ীর সহীহ বর্ণনায় এসেছে:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي.... إلخ. (৪)

অর্থাৎ আলী বিন আবী তালেব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন প্রথমে তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, ‘অজ্জাহতু অজহিয়া.....।

নাসায়ী শরীফে এর পরের বর্ণনায় আছে:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِي.... إلخ. (৫)

৩ প্রাগুক্ত

৪ সুনানে নাসায়ী : ১/৫৯৮-৫৯৯ হাদীস নং ৮৯৬ (দারুল হাদীস, কায়রো) نوع اخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة-

৫ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৮৯৭

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, আল্লাহু আকবার, অজ্জাহতু অজহিয়া.....।

এসকল বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত দুআটি পশু কুরবানী করার সময় এবং রাতের নফল নামাযে তাকবীরে তাহরিমার পর পাঠ করতেন। আর এ দুআটি নামাযের শুরুতে পড়া হয় বিধায় হয়তো কেউ এটাকে নামায শুরু করার পূর্বে পড়া হয় বলে ভুল ধারণা করেছে। আর এ ভিত্তিতেই সম্ভবত এটা জায়নামাযের দুআ বলে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। واللہ اعلم

১২তম পাঠ:

(উচ্চারণ করে নামাযের নিয়ত করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নাওয়াইতুআন বলে নামাযের নিয়ত করা ভুয়া। এটা Made in Bangladesh মক্কা ও মদিনায় Made হয়নি। সুতরাং তা বলা বিদআত। অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল (সাঃ) তাকবীর বলে নামাজ শুরু করতেন।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১০১ পৃঃ ৭০২ নং হাদীস।

জবাব:

নাওয়াইতুআন বলে নামায শুরু করার বিষয়টি মূলত নির্ভর করে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা যাবে কিনা- এর উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম থেকে মুখে নিয়ত উচ্চারণের কথা যেমন বর্ণিত হয়নি তেমনি এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আসেনি। নিয়ত যদিও মূলত অন্তরের কাজ, তথাপি বিভিন্ন মাশগালা (ব্যস্ততা), পেরেশানী ইত্যাদির কারণে অন্তরের কথাকে মৌখিকভাবে প্রকাশ করে নিয়তকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করা দোষণীয় কিছু নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা উত্তমও বটে। শরীয়তে এর দৃষ্টান্ত হলো- ঈমান, যা মূলত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হলেও শরীয়ত কালেমা পাঠ করে মৌখিকভাবে তা প্রকাশ করার কথাও বলেছে। এটা এজন্যই যে, যেনো অন্তরের অবস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত রূপ পায়।

হযরত উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি মুখে নিয়তকারীকে প্রহার করতেন তা ঐসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছিলো, যারা জোরে জোরে উচ্চস্বরে নিয়ত উচ্চারণ করতো। আর এ ধরনের লোকদের প্রহার করা অবশ্যই ঠিক ছিলো, তা দোষণীয় কিছু নয়। কেননা, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার অর্থ স্বাভাবিকভাবে নিজের কানে আওয়ায পৌঁছে এতোটুকু আওয়ায করা, সবাই শুনতে পায় এমন উচ্চস্বরে নয়।

হানারফী মাযহাবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার অবকাশ তাদেরকেই দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরে বিভিন্ন পেরেশানী, চিন্তা-ফিকির ইত্যাদির কারণে নিয়ত স্থিরভাবে করতে কষ্ট হয় বা মনে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় আমি নিয়ত করিনি বা ভুল নিয়ত করেছি। এদের নিয়তকে স্থির করার লক্ষ্যেই মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার কথা বলা হয়। ৭ম পাঠে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩তম পাঠ: (নামাযে হাত বাঁধার স্থান নির্ণয় সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাযের সময় নাভিতে হাত বাধা আবু দাউদে ২টি হাদীস আছে, হাদীস দুটিকে আবু দাউদ সহীহ নয় বলেছেন এবং তিরমিযী রাসুলের হাদীস নয় বলেছেন। বুকে হাত বাধতে হবে অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দেখুনঃ তিরমিযীঃ মিনা প্রঃ ১২৬ পৃঃ ২৩৯ নং হাদীস।

জবাব:

অভিযোগের ভাষ্যে বুঝা যায়, লিফলেটটির লেখক আবু দাউদ ও তিরমিযী ছাড়া অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে নাভীর নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীস খুঁজে পাননি। যদি বাস্তবেই খুঁজে না পেয়ে থাকেন তাহলে তা হবে তার ইলমী দৈন্যতার পরিচয়। আর যদি তা জেনে থাকেন তাহলে ইনসাফ বিসর্জন ও সত্য গোপনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। কেননা, নাভীর নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীস সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী ছাড়াও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে দারী কুতনী, সুনানে বাইহাকী, আল মুহাল্লা ও সুনানে দারেমীসহ অনেক হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও লিফলেটে বুকে হাত বাঁধার দলীল হিসেবে তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অথচ তিরমিযী শরীফে বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং মজার ব্যাপার হলো, ইমাম তিরমিযী রহ. হাত বাঁধা সংক্রান্ত দু'টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। এক: تحت السرة তথা নাভীর নিচে হাত বাঁধা। দুই: فوق السرة তথা নাভীর উপরে হাত বাঁধা। কিন্তু على الصدر তথা বুকে হাত বাঁধার কোনো পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। পাঠের শেষে এ বিষয়টি নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ

এবার দেখুন, নাভীর নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত বাস্তবেই প্রমাণযোগ্য ও বিশুদ্ধ সহীহ হাদীস আছে কিনা- এর কিছু নমুনা:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ
السُّرَّةِ. (১)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি নামাযে নাভীর
নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

হাফেযে হাদীস কাসেম বিন কুতলুগা রহ. বলেন:

وهذا سند جيد. (৩)

অর্থাৎ আর এটি ভালো একটি সনদ।

তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার আবুত তাইয়িব মাদানী রহ. বলেন:

هذا حديث قوى من حيث السند. (৪)

অর্থাৎ সনদের দিক থেকে এটা শক্তিশালী একটি হাদীস।

তাওয়ালিউর আনওয়ারে আবেদ সিন্ধী রহ. বলেন:

رجاله ثقات. (৫)

অর্থাৎ এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. উক্ত হাদীসের পাদটীকায় বলেন:

وهذا إسناده صحيح. (৬)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩২০-৩২২ হাদীস নং ৩৯৫৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১১১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ আত তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার : ১/৩১৪ হাদীস নং ১৬৮
(উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা)

৪ তুহফাতুল আহওয়াযী : ২/৮৪ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৫ প্রাগুক্ত

৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩২০ হাদীস নং ৩৯৫৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ আর এটি একটি বিশুদ্ধ সহীহ সনদ।
ইমাম মারদীনী রহ. স্বীয় আল জাওহারুল্লাকীতে বলেন:
بِسند جيد. (১)

অর্থাৎ ভালো একটি সনদে বর্ণিত হাদীস।
আল্লামা ইউসুফ বিনুরী রহ. বলেন:
وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ ও সহীহ।

এ হাদীসে تحت السرة (নাভীর নিচে) অংশটি নিয়ে কেউ কেউ কিছুটা আপত্তি করতে চায়, কিন্তু আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উক্ত হাদীসের তালীকে সেসব আপত্তি ও সংশয় তুলে ধরে সুন্দরভাবে ইলমী মানহাজে তা খণ্ডন করেছেন। বিস্তারিত দেখতে চাইলে দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (তালীক) : ৩/৩২০-৩২২ হা. নং ৩৯৫৯ (দারুল কিবলা, জেদা)।

এটা হলো মারফু হাদীস তথা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মপন্থা ও আমল। এ মারফু হাদীসটি ছাড়াও নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে তিনজন সাহাবী ও একাধিক তাবেয়ীর মাওকুফ হাদীসও পাওয়া যায়, যা এ বিষয়টিকে আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। মাওকুফ হাদীসগুলো উল্লেখ করার পূর্বে সহীহ সনদে আরো একটি মারফু হাদীস পেলাম, যা এখানে উল্লেখ করছি।

সুনানে দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
قَرِيبًا مِنَ الرُّشْغِ. (৩)

১ মাআরিফুস সুনান : ২/৪৪৪ (এইচ. এম. সাঈদ. কোম্পানী, করাচী)

২ প্রাগুক্ত

৩ সুনানে দারেমী : ১/৭৯০ হাদীস নং ১২৭৭ (দারুল মুগনী, রিয়াদ)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কজির কাছে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সিকা বা নির্ভরযোগ্য। এতে সনদগত কোনো ত্রুটি নেই। কেননা, এর রাবীগণ সহীহ মুসলিমের রাবী।

কিতাবটির মুহাক্কিক শাইখ হুসাইন সালীম আসাদ আদারানী দা. বা. হাদীসটির তালীকে লিখেন:

(৪) إسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এ হাদীসে যদিও পরিষ্কারভাবে নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু হাদীসে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সে পদ্ধতি অবলম্বন করে স্বাভাবিকভাবে হাত বাঁধলে নাভীর নিচেই হাত বাঁধা হবে।

পাঠক! হয়তো বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে নিজেই এ পদ্ধতি যাচাই করে দেখুন না একবার! প্রথমে ডান হাতকে বাম হাতের কজির কাছে রেখে হাত জোড়া বেঁধে ফেলুন। এবার আঙুল করে সহজ সরলভাবে দু'হাত পেটের দিকে ছেড়ে দিন। লক্ষ্য করে দেখবেন, হাত দু'টি আপনাপনি নাভীর নিচে চলে যাবে। যদিও কষ্ট করে অন্যত্রও হাত রাখা যাবে, কিন্তু ইসলাম কোথাও অপ্রয়োজনীয় কষ্টক্লেশ পছন্দ করে না; বিধায় অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও স্বাভাবিকতাই উদ্দীষ্ট হবে। আর স্বাভাবিকভাবে বাম হাতের কজিতে ডান হাত রেখে ছেড়ে দিলে কোনো সন্দেহ নেই যে, উভয় হাত নাভীর নিচে গিয়ে স্থির হবে। সুতরাং এ সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন।

এ দু'টি ছিলো মারফু হাদীস তথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল। এবার আমরা আসার তথা সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও তাবেয়ীন রহ. এর বাণী দেখবো যে, হাত বাঁধার ক্ষেত্রে কেমন ছিলো তাদের বাণী ও উক্তি?

উল্লেখ্য যে, কোনো সাহাবী থেকে যদি السنة من অর্থাৎ 'সুন্নাত হলো এমন.....' জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয় তাহলে তা বাহ্যত একজন সাহাবীর কথা

মনে হলেও মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট বাস্তবে তা হাদীসে মারফু তথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্যাদা রাখে। পরিভাষায় এটাকে *مرفوع حكمي* বলা হয়।

এবার দেখুন আসারে সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কিছু নমুনা।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. (১)

অর্থাৎ আবু জুহাইফা রহ. থেকে বর্ণিত যে, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, সুনাত হলো নামাযে নাভীর নিচে এক কজির উপর আরেক কজি রাখা।

এ হাদীসটিকে ইমাম দারা কুতনী রহ. স্বীয় সুনানে^(২), ইমাম আহমাদ রহ. স্বীয় মুসনাদে^(৩) এবং ইমাম বাইহাকী রহ. স্বীয় সুনানে কুবরা^(৪)-তে একাধিক সনদে উল্লেখ করেছেন।

সুনানে দারা কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْجَحِيمِ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ. (৫)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, নামাযে এক কজির উপর আরেক কজি তথা এক কজির পেট অন্য কজির পিঠের উপর রাখাটাই হলো সুনাত।

১ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৪৩ হাদীস নং ৭৫৬ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ সুনানে দারা কুতনী : ২/৩৪-৩৫ হা. নং ১১০২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৩ মুসনাদে আহমাদ : ১/১১০ হা. নং ৮৭৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৪ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৪৮ হা. নং ২৩৪১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৫ সুনানে দারা কুতনী : ২/৩১-৩২ হাদীস নং ১০৯৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

হাদীসটি সুনানে আবু দাউদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخَذُ الْأَكُفَّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. (৬)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, নামাযে এক হাতের কজি আরেক হাতের কজিকে ধরে নাভীর নিচে রাখা (হলো সুন্নাত তরীকা)।

দারা কুতনীর বর্ণনায় ‘নাভীর নিচে’ কথাটি নেই, (যদিও কজির উপর অন্য কজির তালু রাখার দ্বারা হাত নাভীর নিচেই থাকে) কিন্তু এতে ‘সুন্নাত’ কথাটি এসেছে। আর আবু দাউদের বর্ণনায় ‘সুন্নাত’ কথাটি নেই, তবে ‘নাভীর নিচে’ কথাটি এসেছে। সুতরাং উভয় রেওয়াযাতের সমষ্টিতে অর্থ হয় নামাযে এক কজি দ্বারা অন্য কজি ধরে নাভীর নিচে হাত বাঁধাই হলো সুন্নাত।

স্মর্তব্য যে, হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত আসর দু’টিতে আ. রহমান বিন ইসহাক নামক দুর্বল একজন রাবী থাকায় যদিও এ আসর দু’টি যঈফ তথাপি অন্যান্য সহীহ ও প্রমাণযোগ্য হাদীস এর সমর্থনে থাকায় তা হাসান লিগাইরিহী হয়ে আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম ইবনে হযম রহ. স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুহাল্লাতে বর্ণনা করেন:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوءَةِ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. وَعَنْ أَنَسٍ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوءَةِ، وَزَادَ: تَحْتَ السُّرَّةِ. (৭)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি জিনিস নবীস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। (এক) ইফতার জলদি করা। (দুই)

৬ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৪৩ হাদীস নং ৭৫৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৭ আল মুহাল্লা, ইবনে হযম : ৪/১১৩ মাসআলা নং ৪৪৮ (ইদারাতুত তাবাতাতিল মুনীরিয়া, কায়রো)

সাহরী দেৱি কৰে খাওয়া এৰং (তিন) নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। আর আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অনুরূপই বর্ণিত আছে, তবে তিনি (এভাবে) বলেন, নবুওয়াতের স্বভাবগুলো থেকে কতিপয় হলো..... এবং (বর্ণনার শেষে) ‘নাভীর নিচে’ কথাটি অতিরিক্ত বর্ধিত করেন।

আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ আসর থেকে জানা যায়, নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধা নবীদের আমল। সুতরাং এটা শুধু সাধারণ কোনো সুনাত নয়; বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুনাত।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. (১)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, নামাযে নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।

আল্লামা নিমবী রহ. এ আসরটি উল্লেখ করে বলেন:

وإسناده حسن. (২)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান তথা উত্তম।

আরেক বিখ্যাত তাবেয়ী আবু মিজলায রহ. এর ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ. (৩)

অর্থাৎ হাজ্জাজ বিন হাসসান রহ. বলেন, আমি আবু মিজলায রহ.-কে বলতে শুনেছি বা তাকে জিজ্ঞাসা করতঃ বললাম, আমি কিভাবে (নামাযে) হাত বাঁধবো? তিনি বললেন, স্বীয় ডান হাতের কজির পেটকে বাম হাতের কজির পিঠের উপর রেখে তা নাভীর নিচে নিয়ে রাখবে।

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩২২ হাদীস নং ৩৯৬০ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১১২, হাদীস নং ৩৩২ (আল মাকতবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩২৩ হাদীস নং ৩৯৬৩ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

ইমাম মারদীনী রহ. বাইহাকীর হাশিয়া আল জাওহারুন্নাকীতে বলেন:

وجاء ذلك عنه بسندٍ جيد قال ابن أبي شيبة في مصنفه. الخ^(৪)

অর্থাৎ এ ফতোয়াটি আবু মিজলায রহ. থেকে ভালো একটি সনদে বর্ণিত হয়ে এসেছে, ইবনে আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফে বলেন....। (এরপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করেন।)

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح.^(৫)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এ আসরটিতে হাত বাঁধার পদ্ধতিটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়া রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَضُّعِ.^(৬)

অর্থাৎ নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীস (হাত বাঁধা সংক্রান্ত সব হাদীসগুলোর চেয়ে) বেশী শক্তিশালী এবং বিনয় প্রদর্শনের অধিক নিকটতর।

মূলত বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত সবগুলো হাদীসই যঈফ, যা ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়া রহ. এর উক্তি থেকে আঁচ করা যায়। বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত সবচে শক্তিশালী হাদীস ভাবা হয় যে বর্ণনাটিকে তা সহীহ ইবনে খুযাইমাতে এসেছে।

হাদীসটি একটু দেখুন:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى نَا مُؤَمَّلٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.^(৭)

৪ আল জাওহারুন্নাকী মাআ সুনানিল বাইহাকী : ২/৩১ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন নিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১১২, হাদীস নং ৩৩১ (আল মাকতবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ আল আওসাত, ইবনে মুনিযির : ৩/৯৪ হাদীস নং ১২৯১ (দারু তাইবা, রিয়াদ),
মাসায়িলু আহমাদ ও ইসহাক : ২/৫৫১-৫৫২ মাসআলা নং ২১৪ (উচ্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়,
মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি)

৭ সহীহ ইবনে খুযাইমা : ১/২৪৩ হাদীস নং ৪৭৯ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়েছি। আর তিনি বুকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলেন।

এ হাদীসের রাবীদের মধ্য থেকে একজন হলেন মুআম্মাল বিন ইসমাইল। জরাহ-তা'দীলের ইমামদের নিকট তিনি বিতর্কিত একজন রাবী।

যেমন ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,
وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري: منكر الحديث وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. (১)

অর্থাৎ ইবনে মাজীন তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ. বলেন, সত্যবাদী, সুন্নাতের কঠিন অনুসারী তবে প্রচুর ভুল বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত ও অস্বীকৃত রাবী। ইমাম আবু যুরআ রহ. বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে প্রচুর ভুল থাকে।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা করেন:
وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه..... وقال يعقوب بن سفيان: وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروى المناكير عن ثقات شيوخه. وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذراً. وقال الساجي: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها. قال ابن سعد: ثقه كثير الغلط.... وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف و يتثبت فيه لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط. (২)

১ মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল : ৬/৫৭১ জীবনী নং ৮৯৫৬ (৪৯৯২) (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ তাহযীবুত তাহযীব : ৪/১৯৩-১৯৪ জীবনী নং ৮২০৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ অন্যান্য ইমামগণ বলেন, তিনি তার (হাদীসের) কিতাবগুলো দাফন করে নিজের স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, যে কারণে তার ভুলের পরিধি প্রচুর হয়েছে। ইমাম ইয়াকুব বিন সুফইয়ান রহ. বলেন, উলামায়ে কিরামের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, তাঁরা তার হাদীস থেকে বিরত থাকবে। কেননা, তিনি স্বীয় নির্ভরযোগ্য উস্তাদদের থেকে প্রত্যাখ্যাত হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। আর এটা খুবই গুরুতর অপরাধ। যদি তিনি এসব প্রত্যাখ্যাত হাদীসগুলো তাঁর অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল উস্তাদদের থেকে বর্ণনা করতেন তাহলে না হয় আমরা তার জন্য একটা অজুহাত দাঁড় করাতাম। ইমাম সাজী রহ. বলেন, সত্যবাদী বটে তবে প্রচুর ভুলকারী। তার ভুলের সংখ্যা অনেক, যা সুদীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। ইমাম ইবনে সাদ রহ. বলেন, নির্ভরযোগ্য তবে প্রচুর ভুল-ভ্রান্তিকারী। ইমাম মুহাম্মাদ বিন নসর মারুফী রহ. বলেন, মুআম্মাল যখন একা কোনো হাদীস বর্ণনা করবে তখন তাতে সংশয় ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কেননা, সে দুর্বল স্মৃতির অধিকারী ও প্রচুর ভুলকারী ছিলো।

এসকল বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুআম্মাল বিন ইসমাইলের বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে ভুল হয়। আর যে রাবীর ভুলের সংখ্যা প্রচুর হয় পরিভাষায় তার হাদীসটি যঈফ; বরং মুনকার তথা প্রত্যাখ্যাত হাদীস বলে পরিগণিত হয়।

যেমন শরহ্‌ নুখাবাতিল ফিকারে বলা হয়েছে:

فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ. (৩)

অর্থাৎ যে রাবীর ভুল বেশী হয় বা গাফলতি ও অসতর্কতা অধিক পরিমাণে ঘটে বা অন্যায় ও পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে তার বর্ণিত হাদীস মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও এ হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিপরীত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসটি সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভীর নিচে হাত বেঁধেছেন বলা হয়েছে। সুতরাং মুআম্মাল বিন ইসমাইল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মুনকার হবে। কেননা, পরিভাষায় সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের বিপরীত যঈফ (দুর্বল) রাবীদের বর্ণিত হাদীসকেও মুনকার বলা হয়।

যেমন শরহ্ নুখবাতিল ফিকারে বলা হয়েছে:

وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ مُقَابِلَهُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ. (১)

অর্থাৎ যদি (দুই হাদীসের মাঝে) বৈপরীত্য দুর্বল রাবীর সাথে ঘটে তাহলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত) হাদীসটিকে মারুফ (পরিচিত) বলা হয় এবং এর বিপরীত (তথা দুর্বল রাবীর বর্ণিত) হাদীসটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত ও অপরিচিত) বলা হয়।

প্রমাণিত হলো যে, ইবনে খুযাইমা রহ. কর্তৃক বর্ণিত বুকে হাত বাঁধার হাদীসটি দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই মুনকার, যা একেবারেই আমলযোগ্য নয়। এক: হাদীসটির রাবী মুআম্মাল অধিক ভুলকারী হওয়া। দুই: এ দুর্বল হাদীসটি অন্য একটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া। একটি হলেই যেখানে মুনকার হওয়ার জন্য যথেষ্ট তথ্য দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই তা মুনকার প্রমাণিত হওয়ায় হাদীসটির দুর্বলতার মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে, যা কিছুতেই প্রমাণযোগ্য হতে পারে না।

এ হলো বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত বর্ণিত সবচে শক্তিশালী হাদীস। তাহলে বাকী অন্যান্য হাদীসের অবস্থা আরো কতো দুর্বল ও করুণ হবে, পাঠক নিজেই চিন্তা করে দেখুন।

লিফলেটে বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীস তিরমিযীতে আছে বলে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ তিরমিযীতে বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কোনো হাদীসই বর্ণিত হয়নি; বরং কোন হাত দ্বারা কোন হাতকে ধরবে এ সংক্রান্ত একটি হাদীস পাওয়া যায়, যদ্বারা পরোক্ষভাবে নাভীর নিচেই হাত বাঁধা বুঝা যায়।

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنَا فَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ يَمِينِهِ..... حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (২)

অর্থাৎ হুলাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তখন (দেখতাম তিনি) স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হুলাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসটি হাসান।

লক্ষ্যণীয় যে, হাদীসে يَأْخُذُ শব্দ এসেছে, যার অর্থ ‘ধরা’। বলাই বাহুল্য যে, বুকে হাত বাঁধলে বাম হাতের বাহুর উপর ডান হাতের বাহু রাখা হয়, এটাকে ‘ধরা’ বলা হয় না। হ্যাঁ, ডান হাতের তালু বাম হাতের কজির পিঠে রেখে নাভীর নিচে বাঁধলে ‘ধরা’ শব্দটির বাস্তব ও যথার্থ প্রয়োগ হয়। কারণ, কোনো জিনিস একমাত্র হাতের তালু দ্বারা ধরলেই তাকে ধরা বলা হয়। কজি ছাড়া হাতের এক অংশ অন্য অংশের উপর রাখা যায় বা পরস্পরে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। পরোক্ষভাবে হাদীসটি থেকে এমনটিই বুঝা যায়।

আরো মজার বিষয় হলো, বুকে হাত বাঁধার প্রমাণ দিতে গিয়ে সুনানে তিরমিযীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ ইমাম তিরমিযী রহ. এ সংক্রান্ত কোনো হাদীস উল্লেখ তো করেনই-নি; উপরন্তু উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করে তিনি সাহাবা ও তাবেয়ীনের মত ও কর্মপন্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁদের একাংশ নাভীর নিচে হাত বাঁধার প্রবক্তা আর অন্য একটি অংশ নাভীর উপর হাত বাঁধার মত পোষণকারী। কিন্তু বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কোনো মতই উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. ভাষ্য দেখুন:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. (৩)

অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের মধ্য থেকে আহলে ইলমদের নিকট এ হাদীস অনুসারেই আমল হবে। তারা এ মতপোষণ করেন যে, নামাযী ব্যক্তি নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তবে

তাদের মধ্য থেকে একদল নাভীর উপরে হাত রাখার মতপোষণ করেন আর অন্য একটি দল নাভীর নিচে হাত বাঁধার মতপোষণ করেন। তাদের নিকট উভয়টিরই অবকাশ রয়েছে। (অর্থাৎ কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়, যে কোনো একটি অনুসরণ করা যায়।)

এই হলো নাভি ও বুকে হাত বাঁধার হাদীসগুলোর অবস্থা! এ থেকে লামাযহাবী দলটির কপটতা ও ধূর্তামি প্রকাশ হয়ে গেলো এবং প্রমাণিত হলো যে, নাভীর নিচে হাত বাঁধাই শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সুন্নাত।

১৪তম পাঠ

(সুবহানাকা আল্লাহুমা.... সানা পড়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

তাকবীর দিয়ে আমরা যে ছানা সুবহানাকা পড়ি তা ইমাম তিরমিযী দুর্বল বলেছেন, ইমাম আহমাদ সহীহ নয় বলেছেন। আসল ছানা হলো আল্লাহুমা বায়িদাবায়নী..... পড়তে হবে যা অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১০৩ পৃঃ ৭০৮ নং হাদীস।

জবাব:

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর, তা এ লিফলেটটির ছত্রে ছত্রে প্রমাণিত হচ্ছে।।
...اللهم... (সুবহানাকাল্লাহুমা...) সানাটি যে অনেক সহীহ ও হাসান সনদেও বর্ণিত হয়েছে তা তো আর লিফলেটধারীর জানা নেই। তাই অজ্ঞ লোকেরা যা করে থাকে আর কী! আন্দায়ে বলে দেয় যে, এ বিষয়ে আর কোনো প্রমাণযোগ্য হাদীস নেই। মূর্থতা আর কাকে বলে?

তথাপি আমরা এ দাবী করি না যে, এ সানাটি পড়াই আবশ্যিক; বরং এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত অন্য কোনো সানাও পড়া যেতে পারে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে একাধিক সানা বর্ণিত হয়েছে, যা এ পাঠের শেষে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা (সুবহানাকা আল্লাহুমা....) সানা সংক্রান্ত প্রমাণযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করবো।

মুত্তাদরাকে হাকিমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ بُذَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (১)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক'। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, এটা বিশুদ্ধ সনদের হাদীস তবে ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. (তাদের সহীহে) হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

হাফেয যাহাবী রহ. তালখীসে বলেন:

على شرطهما. (১)

অর্থাৎ এটা ইমাম বুখারী রহ., মুসলিম রহ. এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

رجالہ ثقات. (২)

অর্থাৎ এর সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য।

এরপর তিনি আরো বলেন:

قلت: رجالہ من رجالہما فی الجملة وليس على شرط واحد منهما. (৩)

অর্থাৎ এর রাবীগুলো সামগ্রিকভাবে বুখারী ও মুসলিমের রাবী। তবে তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনের পুরোপুরি শর্তানুযায়ী নয়। (কারণ এর কিছু রাবী শুধু বুখারীর, আর কিছু শুধু মুসলিমের আর কিছু উভয়ের, যা হাফেয ইবনে হাজার রহ. বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।)

দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন:

فأقل درجاته أن يكون حسنًا. (৪)

অর্থাৎ এ হাদীসটির মান কমপক্ষে হাসান হবে।

সুনানে আবু দাউদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

১ প্রাগুক্ত (তালীক)

২ নাতাইজুল আফকার : ১/৩৯৭ শ্রুতলিপি (إملاء) নং ৮৩ (দারু ইবনি কাসীর, দামেশক/বৈরুত)

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত : ১/৩৯৮

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ... الخ. (৫)

অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে নামাযে দাঁড়াতে তখন তাকবীর দিতেন এরপর বলতেন, সুবহানাকা আল্লাহুমা..... ।

হাদীসটি শাইখ আলবানীর রহ. সহীহ আবী দাউদে উল্লেখ করে বলেন:

قلت: وإسناده صحيح. (৬)

অর্থাৎ আমি বলি, এর সনদ বিশুদ্ধ ।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. হাদীসটির সনদগত মান বলতে গিয়ে বলেন:

هذا حديث حسن (৭)

অর্থাৎ এটি হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত) একটি হাদীস ।

সুতরাং এটি হাসান বলা হোক বা সহীহ, উভয় অবস্থাতেই তা প্রমাণযোগ্য ।

সুনানে আবু দাউদে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৮)

৫ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৫০ হাদীদ নং ৭৭৫ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৬ সহীহ আবী দাউদ : ৩/৩৬১ হাদীস নং ৭৪৮ (মুআসসাসাতু গিরাস, কুয়েত)

৭ নাতাইজুল আফকার : ১/৪০২ শ্রুতলিপি নং ৮৪ (দারু ইবনি কাসীর, দামেশক/বৈরুত)

৮ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৫০ হাদীস নং ৭৭৬ (দারুল হাদীস, কায়রো)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা.....।

এ হাদীসটি ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনা করেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব রহ. থেকে তিনি আব্বাস বিন মুহাম্মাদ দাওরী রহ. সূত্রে। আর ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন হুসাইন বিন ইসা রহ. থেকে, উভয়ে (আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রহ. এবং হুসাইন বিন ইসা রহ.) তালক বিন গান্নাম রহ. থেকে, এরপরের সনদ একই রকম। বুঝা গেলো আবু দাউদ রহ. এর সনদ উচ্চতর।

আর পূর্বে মুস্তাদরাকে হাকিমের সনদের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মন্তব্য ও উক্তি গত হয়েছে, যা সুনানে আবু দাউদের সনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এছাড়াও শাইখ আলবানী রহ. তার সহীহ আবী দাউদে বলেন :

قلت: حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (১)

অর্থাৎ আমি বলি, (এটা) সহীহ হাদীস, যাকে ইমাম হাকিম রহ. সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হাফেয যাহাবী রহ. (তালখীসে) তাকে সমর্থন করেছেন।

মু'জামে আওসাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِدِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي أُذُنَيْهِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (২)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন কান বরাবর দু'হাত উঠাতেন (এবং) বলতেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা.....।

হাফেয কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ. বলেন:

১ সহীহ আবী দাউদ : ৩/৩৬৩ হাদীস নং ৭৪৯ (মুআসসাসাতু গিরাস, কুয়েত)

২ মু'জামে আওসাত, তাবরানী : ৩/২৪২ হাদীস নং ৩০৩৯ (দারুল হারামাইন, কায়রো)

ورجاله موثوقون. (৩)

অর্থাৎ এর রাবীগণ সব নির্ভরযোগ্য।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন;

وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر. (৪)

অর্থাৎ আবু খালেদ আহমার কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াযাতের (দুর্বলতা দূরীকরণের) জন্য এটি (আওসাতের বর্ণনাটি) একটি ভালো সনদের মুতাবাআ (সমর্থক হাদীস)।

সুনানে দারা কুতনীতে ভিন্ন সনদে উপরোক্ত হাদীসটি এভাবে এসেছে:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ إِبْهَامَاهُ أَذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৫)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর দিতেন। এরপর দু'হাত উঠাতেন, এমনকি তাঁর দু'বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'কান বরাবর হতো। এরপর বলতেন, 'সুবহানাকাল্লাহ্মা ওয়া বিহামদিকা....'।

হাফেয যাইলায়ী রহ. ইমাম দারা কুতনীর মন্তব্য নকল করতঃ বলেন:

إسناده كلهم ثقات. (৬)

৩ আত-তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার : ১/৩১৭ হাদীস নং ১৭০ (উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা)

৪ আদ্বিরায়া : ১/১২৯ হাদীস নং ১৪৮ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

৫ সুনানে দারা কুতনী : ২/৬২ হাদীস নং ১১৪৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৬ নাসবুর রায়া : ১/৩২০ হা. নং ১৩৮৭ (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

অর্থাৎ এর সনদের সবাই নির্ভরযোগ্য।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.ও দারা কুতনীৰ উক্তি নকল করে বলেন:

قال الدار قطنى: إسناده كلهم ثقات. (১)

অর্থাৎ ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, এর সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য।

হাফেয কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ.ও দারা কুতনীৰ উক্ত মন্তব্য তাঁর ‘আত-তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার’ গ্রন্থে নকল করেছেন।

তবে বাস্তবতা হলো, ইমাম দারা কুতনীৰ উক্ত মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা, এর রাবীদের মধ্য থেকে হুসাইন বিন আলী বিন আসওয়াদ ইজলী নামক একজন রাবী আছে, যে বিতর্কিত একজন রাবী।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, لا أعرفه অর্থাৎ আমি তাকে চিনি না। ইমাম আযদী রহ. বলেন, ضعيف جدًا يتكلمون فى حديثه অর্থাৎ খুবই দুর্বল, উলামায়ে কিরাম তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন। ইমাম ইবনে আদী রহ. বলেন, يسرق الحديث অর্থাৎ হাদীস চুরি করে।। অবশ্য ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে الثقات গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যদারা বুঝা যায় সে ثقة তথা নির্ভরযোগ্য। পাশাপাশি এটাও বলেন যে, ربما أخطأ অর্থাৎ মাঝে মধ্যে ভুল করে। আর ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ. বলেন, صدوق তথা সত্যবাদী। (২)

যাই হোক, এতে হাদীসটি যঈফ হলেও অসুবিধা নেই। কেননা, এ হাদীসের সমর্থনে একাধিক সনদে মুতাবে এবং শাহেদ হাদীস রয়েছে, যদরুন হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী হবে। আর হাসান লিগাইরিহী হাদীস মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট প্রমাণযোগ্য।

ইমাম তাবরানী রহ. এর ‘কিতাবুদ দুআ’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে:

১ আদিরায়্যা : ১/১২৯ হাদীস নং ১৪৮ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

২ নাসবুর রায়্যা : ১/৩২০ হাদীস নং ১৩৮৭ (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوِيهِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى السَّيْنَانِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৩)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা....’।

এ হাদীসটির সব রাবীই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।

শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ বিন মুহাম্মাদ হাসান বুখারী বলেন:

إسناده حسن. (৪)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান (অতি উত্তম)।

মূলত এ সানাটি বহু সাহাবী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
وَأَبْنِ عُمَرَ..... وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا يُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى
جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وَهَكَذَا رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. (৫)

৩ আদ-দুআ, তাবরানী : ২/১০৩৪, হাদীস নং ৫০৬ (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

৪ প্রাগুক্ত (তালীক)

৫ সুনানে তিরমিযী : ২/১০-১১ হাদীস নং ২৪২ (দারুল হাদীস, কায়রো)

অর্থাৎ এ (সানা) সংক্রান্ত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, জুবাইর বিন মুতইম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা (সহ প্রমুখ) থেকে বর্ণনা রয়েছে। আর অধিকাংশ আহলে ইলমগণ ঐ সানা বলেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক’- উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তাবেয়ীন ও অন্যান্য অধিকাংশ উলামা এ মতানুযায়ীই আমল করেন।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা সহীহ ও হাসান সনদে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজেও উক্ত সানাটি নামাযের শুরুতে পড়তেন। এখন আমরা কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর আমল দেখাবো যে, তাঁরাও এ সানাই পড়তেন। বরং ইমাম তিরমিযী রহ. এর ভাষ্য অনুযায়ী তো অধিকাংশ আহলে ইলম তাবেয়ীন এ সানাই পাঠ করতেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (১)

অর্থাৎ আবদা সূত্রে বর্ণিত যে, উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (নামাযে) এই কালেমাগুলো উচ্চস্বরে বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক’।

সুনানে দারা কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ

إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (قال الدار قطنی:) وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (২)

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন নামাযের তাকবীর দিতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....’।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত তাঁর উক্তিটি সহীহ ও বিশুদ্ধ আসর।

সুনানে বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

وَأَصَحُّ مَا رَوَى فِيهِ الْأَثَرُ الْمَوْقُوفُ عَلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৩)

অর্থাৎ ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে বর্ণিত সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস হলো উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মাওকুফ আসরটি। (এরপর স্থায়ী সনদে আসরটি বর্ণনা করতঃ বলেন,) আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর দিয়ে বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....’।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন:

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. كَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ..... وَهُوَ الصَّوَابُ. (৪)

২ সুনানে দারা কুতনী : ২/৬১ হাদীস নং ১১৪৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৩ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৫২ হাদীস নং ২৩৫০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ সুনানে দারা কুতনী : ২/৬১ হাদীস নং ১১৪২ সংশ্লিষ্ট (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে তাঁর বাণী হিসেবে (এ সানাটি) সংরক্ষিত। উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আলকামা রহ. ও আসওয়াদ রহ. সূত্রে ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এমনই বর্ণনা করেছেন। আর এটাই সঠিক।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

هذا موقوف صحيح. (১)

অর্থাৎ (বাইহাকীর বর্ণিত) এ হাদীসটি সহীহ মাওকুফ হাদীস।

পূর্বের এ তিনটি বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু নামাযে এ সানাই পাঠ করতেন, যা আমরা হানাফীরা পাঠ করে থাকি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যে এ সানা নামাযে পাঠ করেছেন তা পূর্বে একাধিক সহীহ ও হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে এসেছে।

ইমাম দারা কুতনী রহ. ইবরাহীম নাখয়ী রহ. সূত্রে আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيُّ سَابُورِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ
فُضَيْلٍ وَخَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا. (২)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা....’ তিনি আমাদেরকে তা শুনিয়ে পড়তেন এবং আমাদেরকে তা শিক্ষা দিতেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ শামসুল হক রহ. তাঁর আত-তালীকুল মুগনী আলাদারা কুতনীতে বলেন:

১ নাতাইজুল আফকার : ১/৪০৬ শ্রুতলিপি নং ৮৪ (দারু ইবনি কাসীর, দামেশক/বৈরুত)

২ সুনানে দারা কুতনী : ২/৬৫ হাদীস নং ১১৫৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

সنده صحيح وراوته كلهم ثقات. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ এবং এর সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।

সুনানে দারা কুতনীতে উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারেও এমনই বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذَلِكَ. (৪)

অর্থাৎ আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....’ আমাদেরকে তা শুনিয়ে পড়তেন।

আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারেও পাওয়া যায় যে, তিনি এ সানা পড়তেন।

ইমাম ইবনে মুনযির রহ. তাঁর আল আওসাতে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: ثنا مَكْحُولٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৫)

অর্থাৎ মাকহুল রহ. বর্ণনা করেন যে, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....’।

৩ প্রাগুক্ত (তালীক)

৪ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ১১৫৪

৫ আল আওসাত, ইবনে মুনযির : ৩/৮২ হাদীস নং ১২৬৬ (দারু তাইবা, রিয়াদ)

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ. স্বীয় মুসান্নাফে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা.....’ সানা পড়ার বর্ণনা সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করার পর বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. (১)

অর্থাৎ ইবনে আজলান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু অনুরূপ (সুবহানাকা আল্লাহুমা....) সানাই পড়তেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (২)

অর্থাৎ আবু উবাইদা রহ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা.....’।

ইমাম আ. রাযযাক তার মুসান্নাফে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন:

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَصَدَّقُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عُمَانَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (৩)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৭ হাদীস নং ২৪০৮ (দারুল কিবলা, জেদা)

২ প্রাণ্ড : ২/৩৯৬ হাদীস নং ২৪০৬

৩ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ২/৭৬ হাদীস নং ২৫৫৮ (আল মাজলিসুল ইলমী, ভারত)

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি যাকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মনে করি এমন এক ব্যক্তি আমাকে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা.....’।

পূর্বের এসকল বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, উপরোক্ত সানা যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন তেমনি তাঁর প্রধান প্রধান বিজ্ঞ সাহাবীগণ যথা আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও পড়েছেন।

ইমাম ইবনে মুনযির রহ. বলেন:

وَمَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ أَبُو بَكْرٍ
الصَّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. (৪)

অর্থাৎ যাদের থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তাঁরা এ সানা পড়তেন তাঁদের কতিপয় হলেন, আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু।

মূলত এ সানা সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়াত এতো বেশী যে, সব একত্রিত করা হলে আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। তাই আমরা আলোচনা আর দীর্ঘ না করে এতেই ক্ষান্ত করছি। পূর্বে যেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোই প্রমাণ ও দলীলের জন্য যথেষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সানা ছাড়াও মাঝে মধ্যে অন্যান্য সানাও পড়েছেন, যার কিয়দাংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

সহীহ বুখারীতে একটি সানা বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ

৪ আল আওসাত, ইবনে মুনযির : ৩/৮২ মাসআলা নং ৩৮৫ হাদীস নং ১২৬৫ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারু তাইবা, রিয়াদ)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَهُ - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنِيَّةٌ - فَقُلْتُ: يَا أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরাতের মাঝে থামতেন তথা দেরি করতেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, ‘কিছু সময়’। সুতরাং আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তাকবীর এবং কিরাতের মাঝে দেরি করার সময় কী বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি, ‘আল্লাহুমা বায়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া কামা বাআত্তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুমা নাক্কিনী মিনাল খাতাইয়ায়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াদু মিনাদদানাস, আল্লাহুমাগসিল খাতাইয়ায়া বিল মায়ী ওয়াস সালজি ওয়াল বারদ’।

সহীহ মুসলিমে একটি সানা বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا

يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ
إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (২)

অর্থাৎ আলী বিন আবী তালিব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, ‘অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। (এর পরবর্তী বর্ণনায় এর পরিবর্তে ‘ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন’ আছে।) আল্লাহুমা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রাব্বী ওয়া আনা আবদুকা, য়ালামতু নাফসী ওয়া তারাফতু বিয়ামবী ফাগফির লী যুনূবী জামীআ ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলাক, লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়িআহা, লা ইয়াসরিফু আন্নী সাইয়িআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা’দাইক, ওয়াল খাইরু কুল্লুহ ফী ইয়াদাইক, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইক। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তাআলাইত, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে একটি সানা বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ
نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا ثَلَاثًا، سُبْحَانَ
اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ
وَنَفْثِهِ. (৩)

জুবাইর বিন মুতইম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করার সময় আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহু আকবার’- তিনবার, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরা-

২ সহীহ মুসলিম : পৃ. ৩০৫ হাদীস নং ৭৭১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৭-৩৯৯ হাদীস নং ২৪১১ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

তিনবার, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা- তিনবার, আল্লাহুমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শাইতানির রাজীমি মিন হামাযিহী ও নাফাযিহী ওয়া নাফাসিহী।

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক রকম সানা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনে মুনযির রহ. তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে আট ধরনের সানা উল্লেখ করেছেন।^(১) ইমাম বাইহাকী রহ., ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ., ইমাম আ. রায়যাক রহ.-সহ প্রমুখ ইমামগণ অনেক সানা নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সানা যে কোনো একটি পড়লেই হয়ে যাবে। এতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নামাযহাবীগণ এখানে শুধু একটি সানা পড়াকে আবশ্যিক করে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে, যা মূলত অজ্ঞতা ও সীমালংঘনের পরিচয় বহন করে।

যেহেতু অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সিংহভাগ সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....' সানাটিই পড়তেন তাই আমরা এ সানাটি পড়াকে উত্তম মনে করি। যদিও অন্যগুলো পড়তেও আপত্তি নেই। হাফেয ইবনুল কাইয়িম জাওযীয়া রহ. যাদুল মাআদে 'সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা.....' সানা পড়া উত্তম হওয়ার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন।^(২)

সুতরাং এ সানা পড়তে একমাত্র তারাই আপত্তি করবে, যাদের না হাদীসের ইলম আছে আর না বিবেক ও আকল। বরং কিছু হাদীস থেকে জানা যায়, এক নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক সানাও পড়েছেন।

সুনানে বাইহাকীতে শক্তিশালী একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

১ আল আওসাত, ইবনে মুনযির : ৩/৮১-৮৫ হা. নং ১২৬৪-১২৭৫ (দারু তাইবা, রিয়াদ)

২ যাদুল মাআদ : ১/২০৫-২০৬ অধ্যায়- الصلاة هديه في (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ خَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. (৩)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক, অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাসা সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা-শারীকা লাহ’।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

وسنده قوى، فإن رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام. وقد قال أبو حاتم: إنه صدوق. (৪)

অর্থাৎ এর সনদ শক্তিশালী। কেননা, আব্দুস সালাম ছাড়া এর সবগুলো রাবীই সহীহ হাদীসের রাবী। আর তার ব্যাপারে ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ. বলেন, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী রাবী।

বুঝা গেলো, একসাথে দুই সানাও পড়া যেতে পারে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং ইমাম আবু ইসহাক মারুফী রহ. সানা দু’টি একসাথে পড়া মুস্তাহাব বলেছেন।

৩ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৫২ হাদীস নং ২৩৫১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ নাতাইজুল আফকার : ১/৪০৯ শ্রুতলিপি নং ৮৫ (দারু ইবনি কাসীর, দামেশক/ বৈরুত)

১৫ নং পাঠ

(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

ইমামের পিছনে মোক্তাদীগণ ছানার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। তাদের ভ্রান্ত ধারণা। সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে সূরা হিজরে ৮৭ নং আয়াতে বলা আছে, রাসূল (সাঃ) এর শত শত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১০৯ পৃঃ ৭২০ নং হাদীস।

জবাব:

এ পাঠটিকে আমরা চারটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রথম ভাগে কুরআন ও এর তাফসীর, দ্বিতীয় ভাগে সহীহ ও প্রমাণযোগ্য মারফু তথা রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস, তৃতীয় ভাগে মাওকুফ তথা সাহাবা কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এর আসার ও আমল এবং চতুর্থ ভাগে কিয়াস ও যুক্তি- মোট চার ধরনের দলীলের আলোকে আমরা এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পাবো যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়ার প্রয়োজন নেই; বরং তা নিষিদ্ধ।

১ম ভাগ: কুরআন ও তাফসীর

প্রথমে লিফলেটের উদ্ধৃতি সম্বন্ধে কিছু না বললেই নয়। লিফলেটে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণে বলা হয়েছে, এ নির্দেশ সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াতে আছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল একটি উদ্ধৃতি। কুরআনের কোথাও মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যিক হওয়ার কথা নেই। সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ^(১)

অর্থাৎ (হে নবী) আমি আপনাকে বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং মহান কুরআন দান করেছি।

১ সূরা হিজর : আয়াত নং ৮৭

এছাড়াও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত শত সহীহ হাদীস দ্বারা নাকি তা প্রমাণিত। অথচ পুরা হাদীসের ভাণ্ডার খুঁজে একটি হাদীসও পাওয়া যায় না, যেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া বা সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যিক। এভাবেই ভুল ও মিথ্যা উদ্ধৃতি দিতে অভ্যস্ত এ লা-মায়হাবী দলটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের নামে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা তো এমনই চায়। যাই হোক আমরা এখন মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো।

প্রথমত: আমরা দেখবো, মুক্তাদীর কিরাত পাঠের ব্যাপারে কুরআন কী বলে? কেননা, শরীয়তের প্রথম ও প্রধান দলীল হলো কুরআন। কুরআনে কোনো বিধান থাকলে প্রমাণ হওয়ার জন্য সেটাই যথেষ্ট। এরপর আমরা দেখবো হাদীসের ভাষ্য।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (২)

অর্থাৎ আর যখন (ফরয নামাযে) কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো। যেনো তোমাদের অনুগ্রহ করা হয়।

এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কুরআন পড়া হবে তখন শ্রবণকারী যেনো তা মনোযোগ সহকারে শোনে আর গুনতে না পেলে কমপক্ষে নীরবতা অবলম্বন করে। উল্লেখ্য, এখানে কুরআন পড়া বলতে ইমামের কিরাত পড়া উদ্দেশ্য আর শোনা ও নীরব থাকা বলতে মুক্তাদীর শোনা ও চুপ থাকা। কেননা, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ মুফাসসিরীন এ মতই পোষন করেন।

এ উম্মাতের তাফসীর সম্রাট আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ অনেক সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: قَوْلُهُ "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" يَغْنِي فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَكَذَا زُوَيْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ. (১)

অর্থাৎ আলী বিন তালহা সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী 'আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং চুপ থাকো'- উদ্দেশ্য ফরয নামাযে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবীদের মধ্যে আরেক তাফসীর বিশেষজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সাহাবী ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এ বিষয়ে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরে তাবারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَمِعَ نَاسًا يَقْرَأُونَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَمَا آَنَ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا؟ أَمَا آَنَ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. (২)

অর্থাৎ বশীর বিন জাবের বলেন, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (একদিন) নামায পড়ালে ইমামের সাথে সাথে লোকদেরও (অর্থাৎ মুক্তাদীর) কিরাত পড়তে শুনতে পেলেন। এরপর যখন (নামায শেষে) ঘুরে বসলেন তখন বললেন, তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি? তোমাদের কি বুঝার সময় হয়নি? যখন (নামাযে) কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো, যেভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি ফরয নামাযের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ ইমাম নামাযে যখন কিরাত পড়বে তখন মুক্তাদীদের দায়িত্ব হলো চুপ থাকা ও মনোযোগ সহকারে তা শোনা। এমতাবস্থায় কিরাত পড়া উক্ত আয়াতের স্পষ্ট বিরোধিতা হবে।

১ তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৫৩৭ (দারু তাইবা, রিয়াদ)

২ তাফসীরে তাবারী : ১৩/৩৪৬ হাদীস নং ১৫৫৮৪ (মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখরী রহ. থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا، قَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. (৩)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখরী রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী ‘আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো’ (এ আয়াতের ব্যাপারে) তিনি বলেন, (এটা) ফরয নামাযের ক্ষেত্রে (নাযিল হয়েছে)।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বিশিষ্ট ছাত্র প্রখ্যাত মুফাসসির তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ রহ. থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. তাঁর মুসান্নাফে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا، قَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. (৪)

অর্থাৎ লাইস সূত্রে মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত ‘আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থাকো’- তিনি বলেন, ফরয নামাযের ক্ষেত্রে (নাযিল হয়েছে)।

এভাবে ইমাম যাহহাক রহ., ইমাম হাসান বসরী রহ., ইমাম শাবী রহ., ইমাম কাতাদা রহ., ইমাম সাঈদ বিন জুবাইর রহ.-সহ প্রমুখ থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তাবারী রহ. তাঁর তাফসীরে তাবারীতে ইবেন যায়েদ রহ. এর বর্ণনা এনেছেন, যে বর্ণনায় আরো পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতটি ফরয নামাযের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে।

বর্ণনাটি হলো:

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قَالَ: هَذَا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. (৫)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/৪৪৬ হাদীস নং ৮৪৬১ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৪ প্রাগুক্ত : ৫/৪৪৮ হাদীস নং ৮৪৬৯

৫ তাফসীরে তাবারী : ১৩/৩৪৯ হাদীস নং ১৫৬০৬ (মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

অর্থাৎ ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, আল্লাহর বাণী 'আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো' এর তাফসীরে তিনি বলেন, যখন ইমাম নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং চুপ থাকো।

ইমাম আবু জাফর তাবারী রহ. বলেন:

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أَمَرُوا بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتُمُّ بِهِ يَسْمَعُهُ وَفِي الْخُطْبَةِ. (১)

অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো তাদের, যারা বলে, নামাযে কুরআন মনোযোগ সহকারে শোনার আদেশ দেয়া হয়েছে, যখন ইমাম কিরাত পড়বে এবং তার পিছে যারা ইজ্জিদা করছে তারা তা শুনবে এবং (আদেশ দেয়া হয়েছে) খুতবার ক্ষেত্রে।

এছাড়াও আরো অনেক সাহাবা এবং তাবেয়ীন থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তারিতভাবে সব উল্লেখ করা হলো না।

উল্লিখিত আয়াত এবং তার তাফসীর থেকে প্রমাণিত হলো যে, ফরয নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য কিরাত পড়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ; বরং তা শোনা বা চুপ থাকা আবশ্যক।

স্মর্তব্য যে, নামায চাই জেহরী তথা উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট (যথা মাগরিব, ইশা ও ফজর) হোক কিংবা সিররী তথা নিম্নস্বরে কিরাতবিশিষ্ট (যথা যোহর ও আসর) উভয় ধরনের নামাযেই ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরাত পড়বে না। অনেকের ধারণা, শুধুমাত্র জেহরী কিরাতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম দু'রাকআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরাত পড়বে না; বাকী রাকআতগুলোতে এবং সিররী কিরাতবিশিষ্ট নামাযের সব রাকআতে মুক্তাদী ইমামের পিছনে থাকলেও কিরাত পড়বে। কেননা, এক্ষেত্রে ইমাম যেহেতু উচ্চস্বরে কিরাত পড়ছে না; বিধায় মুক্তাদীর এখানে শোনার কিছু নেই। সুতরাং এখানে সে কিরাত পড়বে।

কিন্তু এ ধারণাটি মূলত সঠিক নয়। কারণ, কুরআনে বলা হয়েছে, 'যখন (নামাযে) কুরআন পড়া হয়'- আর পড়া শব্দটি আম (ব্যাপক), যা জেহরী (উচ্চস্বরে) ও সিররী (নিম্নস্বরে) উভয় প্রকারের কিরাতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এছাড়াও এটা পরিষ্কার যে, ইমামের জন্য কিরাত পড়া ফরয, চাই জেহরী নামাযে হোক বা সিররী নামাযে হোক। সুতরাং ইমাম যখন (উদাহরণ স্বরূপ) যোহরের নামায পড়াবে তখন অবশ্যই বলা হবে যে, তিনি নামাযে কিরাত পড়েছেন, হোক না তা সিররী (নিম্নস্বরের) কিরাত।

এরপর লক্ষ্য করুন- কুরআনে বলা হয়েছে, ‘যখন (নামাযে) কিরাত পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো’- তাহলে আমরা দেখছি, ইমাম যেহেতু জেহরী ও সিররী উভয় প্রকার নামাযেই কিরাত পড়ছে সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই উক্ত আয়াতের ‘যখন (নামাযে) কিরাত পড়া হয়’- নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। এরপর আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, আয়াতটির দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে ‘তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো’। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এখানে দু’টি বাক্য বলা হয়েছে। এক: মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। দুই: নীরব থাকো। মূলত এখানে কিরাতের দুই অবস্থার দিকে তাকিয়েই এ দু’টি বাক্য নির্বাচন করা হয়েছে। সুতরাং কিরাত যখন জেহরী (উচ্চস্বরে) পড়া হবে তখন বলা হয়েছে, ‘তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো’। আর যখন সিররী (নিম্নস্বরে) পড়া হবে তখন যেহেতু শোনার কিছু নেই তাই বলা হয়েছে ‘নীরব থাকো’।

বুঝা গেলো, নামাযে ইমাম সিররী বা জেহরী যে ধরনের কিরাতই পড়ুক না কেনো, মুক্তাদীর কোনো কিছু পড়ার অবকাশ নেই। কেননা, জেহরী কিরাত পড়া হলে তাকে শ্রবণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সিররী কিরাত পড়া হলে তাকে নীরব থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই তার কিরাত পড়ার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কোনো নামাযেই কিরাত পড়ার অনুমতি নেই।

লা-মাযহাবীগণ যাকে মান্যবর ইমাম মনে করে সেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. পর্যন্ত কুরআনের এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে কমপক্ষে জেহরী কিরাতবিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদীর কোনো ধরনের কিরাত না পড়ে চুপ থাকা এবং কিরাত শোনা আবশ্যিক মনে করেন। অর্থাৎ এ অবস্থায় মুক্তাদী না সূরা ফাতিহা পড়বে না অন্য কোনো সূরা। আর এটিকেই জমহুর তথা উম্মতের সিংহভাগ সাহাবা, উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের মত বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মাজমুআতুল ফাতাওয়াতে বলেন:

فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. قِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأَخَذُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: بَلْ يَجُوزُ الْأَمْرَانِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ. وَيُرَوَّى هَذَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ وَاللِّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: بَلْ الْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ. وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالَ أَحْمَدُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ. (১)

অর্থাৎ এতে (ইমামের পিছনে কিরাত পড়ার ব্যাপারে) উলামায়ে কিরামের তিনটি মত রয়েছে। (এক:) কারো মতে ইমাম জেহরী কিরাত পড়া অবস্থায় যখন তা (কিরাত) শোনা যাবে তখন মুক্তাদীর কিরাত পড়ার অনুমতি নেই, না সূরা ফাতিহা পড়ার আর না অন্য সূরা পড়ার। আর এটা পূর্ববর্তী, পরবর্তী জমহুর (অধিকাংশ) উলামায়ে কিরামের মত। এটিই ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ অন্যান্য অনেক ইমামের মাযহাব এবং এটা ইমাম শাফেয়ীর রহ. এর দু'টি উক্তি মধ্য থেকে একটি মত। (দুই:) আর কারো মতে (পড়া ও না পড়া) উভয়টি জায়েয, তবে পড়াই উত্তম। এ মতটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম আওয়ামী রহ., শামবাসী উলামায়ে কিরাম ও ইমাম লাইস বিন সাদ রহ. থেকে। কিছু হাম্বলী উলামাসহ অন্যান্য কতিপয় ইমামেরও এ মতটি পছন্দ। (তিন:) আর কারো মতে কিরাত পড়া আবশ্যিক। এটা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সর্বশেষ উক্তি।

(ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,) আর জমহুর উলামায়ে কিরামেরই মতই সঠিক। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো। যেনো তোমরা

অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।' ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, সকল লোক (উলামা) এ ব্যাপারে একমত যে, আয়াতটি নামাযের (কিরাতের) ব্যাপারে নাযিল (অবতীর্ণ) হয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তিনটি বিষয় জানা যায়। এক: মুক্তাদীরা ইমামের কিরাত গুনতে পেলে জমহুর উলামায়ে কিরামের নিকট তাদের যে কোনো ধরনের কিরাতই হোক না কেনো- পড়া নিষেধ; বরং তাদের তা মনোযোগ সহকারে শোনা আবশ্যিক। শুধু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দু'টি উক্তি থেকে শেবোক্ত উক্তি অনুসারে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যিক। আমাদের দেশের আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীগণ জমহুরের বিপরীত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এ মতের সাথে একমত পোষণ করে। দুই: ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যিনি লা-মাযহাবীগণের নিকট একজন গ্রহণযোগ্য ইমাম তাঁর মতানুসারে এ মাসআলায় জমহুর উলামায় কিরামের মতই সঠিক। তিন: কুরআনের এ আয়াত **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** (আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো) উলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে নামাযের কিরাত সম্বন্ধেই নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ নামাযে কুরআন পড়া হলে তা শোনা ও চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এতোক্ষণ এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য সব ধরনের কিরাত পড়া কুরআনের উক্ত আয়াত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। সুতরাং জামাতের সহিত নামায পড়াবছায় মুক্তাদীর কিরাত পড়া অনেক সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার পাশাপাশি কুরআনের এ আয়াতটির সাথেও সাংঘর্ষিক।

এখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ঐসকল সহীহ হাদীস উল্লেখ করবো, যাতে ইমামের কিরাতকেই মুক্তাদীর কিরাত আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তাকে ইমামের পিছনে চুপ থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।

২য় ভাগ:

সহীহ ও প্রমাণযোগ্য মারফু হাদীস

এ ভাগে আমরা এসব সহীহ ও প্রমাণযোগ্য মারফু (তথা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত) হাদীস উল্লেখ করবো, যেগুলোর দ্বারা দিবালোকের ন্যায় এটা প্রমাণিত হবে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদী কোনো কিরাত পড়তে পারবে না। না সুরা ফাতিহা আর না অন্য কোনো সুরা, না জেহরী কিরাতবিশিষ্ট নামাযে আর না সিররী কিরাতবিশিষ্ট নামাযে।

পাঠকদের সুবিধার্থে বলে রাখার প্রয়োজনবোধ করছি যে, আমরা তিন ধরনের মারফু হাদীস উল্লেখ করবো। এক: যেসকল হাদীসে ইমামের কিরাতকেই মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট তথা স্ফুলাভিষিক্ত বলা হয়েছে। দুই: যেসব হাদীসে মুক্তাদীদেরকে সরাসরি চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিন: যে সমস্ত হাদীসে পরোক্ষভাবে মুক্তাদীদের কিরাত না পড়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের কিরাত পাঠের আবশ্যকীয়তা না থাকার কথা বুঝানো হয়েছে।

১ নং হাদীস:

মুসনাদে আবী হানাফীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. (১)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম আছে তার জন্য তার ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। (অর্থাৎ মুক্তাদীর পক্ষ থেকে ইমামের কিরাতই তার কিরাত বলে গণ্য হবে।)

এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

১ মুসনাদুল ইমামিল আযম : পৃষ্ঠা নং ১৮৬-১৯০ হাদীস নং ১০৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

ইমাম আবু হানীফা রহ. তো আবু হানীফাই, যার পরিচিতি ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। সনদের দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মূসা রহ.। তার পরিচয় হলো, আবুল হাসান মূসা বিন আবী আয়েশা হামদানী আল কুফী রহ.। ইবনে হাজার রহ. তাকরীবুত তাহযীবে বলেন, তিনি সিকা (নির্ভরযোগ্য) ও আবেদ।^(২) সনদের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রহ.। তার পরিচয় হলো, আবুল অলীদ আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ লাইসী আল মাদানী রহ.। ইনি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। শীর্ষস্থানীয় সিকা (নির্ভরযোগ্য) তাবেয়ী। কুফায় ৮১ হিজরীতে নিহত হন। দেখুন, তাকরীবুত তাহযীব^(৩) ও আল কাশেফ^(৪)। আর জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু হলেন বিখ্যাত জলীলুল কদর সাহাবী।

সুতরাং হাদীসটির সনদ যে সহীহ এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. স্বীয় মুআত্তায় এ সনদেই ভিন্ন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.^(৫)

অর্থাৎ জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কীরাত পাঠই তাঁর কীরাত পড়া বলে বিবেচিত হবে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন

بِسند صحيح.^(১)

২ আত তাকরীব : পৃ. নং ৫৫২ জীবনী নং ৬৯৮০ (দারুল রশীদ, হালব)

৩ প্রাপ্তক : পৃষ্ঠা নং ৩০৭ জীবনী নং ৩৩৮২

৪ আল কাশেফ : ২/৫৬১ জীবনী নং ২৭৭৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৫ মুআত্তা মুহাম্মাদ : ১/১৫২-১৫৪ হাদীস নং ১১৭ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ এটা সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস।

হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন:

طريق صحيح. (২)

অর্থাৎ এটা সহীহ সনদ।

আল্লামা নিমবী রহ. তাঁর আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদটি সহীহ।

এছাড়াও আরো অনেকেই এ সনদে বর্ণিত হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। কোনো ইমাম বা হাফেযে হাদীস এর সনদকে দুর্বল বলেননি। কেননা, এ সনদের সবগুলো রাবীই উচ্চস্তরের সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবী। একমাত্র ইমাম দারা কুতনী রহ.-ই অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পাশ্চ্য ও পাশ্চাত্যের অবিসংবেদিত সবচে স্বীকৃত বড় ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে যঈফ বলার দুঃসাহস দেখিয়ে এ হাদীসটির সনদকে যঈফ বলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সকল ইমাম ও হাফেযগণ দারা কুতনীর এ মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় দুই হাফেযে হাদীস ইমাম যাহাবী রহ. ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-সহ সব মাযহাব ও দলের ইনসাফপ্রিয় গবেষকগণও তা কড়াভাবে খণ্ডন করেছেন।

মূলত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর আলোচনা শুরু করলে বিশাল একটি ভিন্ন গ্রন্থ তৈরি হয়ে যাবে। যেমনটি বলেছেন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। তিনি স্বীয় বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ তাহযীবুত তাহযীবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবনী এবং তাঁর সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী ইমামগণের মন্তব্য ও প্রশংসা বাণী উল্লেখ করে বলেন:

ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدًا. (৪)

১ ফাতহুল কাদীর : ১/৩৪৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী : ৬/১৭ হাদীস নং ৭৫৬ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ আসারুস সুনান : পৃষ্ঠা নং ১৩২ হাদীস নং ৩৬৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ তাহযীবুত তাহযীব : ৪/২৩০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনী ও মহৎ কার্যাবলীর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ।

জরাহ তা'দীলের বড় ইমাম ইবনে মাজীন রহ., আলী ইবনে মাদীনী রহ., আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ., ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ., অকী ইবনে জাররাহ রহ.-সহ পূর্ব পরের অসংখ্য ইমামগণ ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে সিকা (নির্ভরযোগ্য) ও ইমাম (মান্যবর নেতা) বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এছাড়াও ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.-সহ মাযহাবের অন্যান্য ইমামগণও তার ইমাম ও খোদাভীরু হওয়ার ব্যাপারে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

বাস্তবতা হলো, যাঁরা যতো বেশী বড় তাদের নিন্দুক ও হিংসাকারীদের সংখ্যাও ততো বেশী হয়। এ তো ইমাম আবু হানীফা রহ., যিনি ইমামদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ হওয়ায় তার নিন্দুকের সংখ্যাও প্রচুর। তিনি ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ- যথা ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম বুখারী রহ.- এদের নিন্দুকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কমবেশী সবাই হিংসুকদের থাবায় জর্জরিত হয়েছেন। বিস্তারিতভাবে সব এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

আবু হানীফা রহ. এর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও খোদাভীরুতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ায় দীর্ঘ দলীলাদির আলোচনায় না গিয়ে শুধু আমরা ইমাম ইবনে আ. বার রহ. ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর একটি মূলনীতি ও মন্তব্য উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের ইতি টানবো, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে আ. বার মালেকী রহ. বলেন:

قَدْ غَلَطَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَضَلَّتْ فِيهِ نَابِتَةٌ جَاهِلَةٌ لَا تَذَرِي مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ؟ وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ عَدَالَتُهُ وَثَبَّتْ فِي الْعِلْمِ إِمَامَتُهُ وَبَانَ ثِقَتُهُ وَبِالْعِلْمِ عِنَايَتُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ فِيهِ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي جَرَحَتِهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ يَصِحُّ بِهَا جَرَحَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الشَّهَادَاتِ وَالْعَمَلِ فِيهَا مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ لِذَلِكَ بِمَا يُوجِبُ تَصَدِيقَهُ فِيمَا قَالَهُ لِبَرَاءَتِهِ مِنَ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ

وَالْمُنَافَسَةِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَذَلِكَ كُلُّهُ يُوجِبُ قَبُولَ قَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ
الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتْ إِمَامَتُهُ وَلَا عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ وَلَا صَحَّتْ لِعَدَمِ
الْحِفْظِ وَالْإِتِّقَانِ رِوَايَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى مَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَيُجْتَهِدُ فِي
قَبُولِ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ إِلَيْهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ
فِيْمَنْ اتَّخَذَهُ جُمُهورٌ مِنْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِمَامًا فِي الدِّينِ قَوْلُ أَحَدٍ مِنَ
الطَّاعِينَ: إِنَّ السَّلَفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ سَبَقَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ كَلَامٌ
كَثِيرٌ، مِنْهُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَمِنْهُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَسَدُ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو حَازِمٍ، وَمِنْهُ عَلَى جِهَةِ التَّأْوِيلِ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْمَقُولُ فِيهِ مَا
قَالَهُ الْقَائِلُ فِيهِ. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالسَّيْفِ تَأْوِيلًا وَاجْتِهَادًا لَا يَلْزَمُ
تَقْلِيدُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ بُرْهَانٍ وَحُجَّةٍ تُوجِبُهُ. (১)

অর্থাৎ অনেক মানুষই এতে ভুল করে বসে এবং নির্বোধ প্রজন্ম তাতে
বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা জানতেও পারে না, এতে তাদের কী ক্ষতি আছে? এ
বিষয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিক নীতিমালা হলো, যার ন্যায়পরায়নতা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত
হয়েছে এবং ইলম ও প্রজ্ঞায় যার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার
নির্ভরযোগ্যতা, ইলমী পরিচর্যা ও খিদমত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার
বিরুদ্ধে কারো বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনার দ্রুত ক্ষেপ করা যাবে না। আর
সিংহভাগ মুসলমান যাকে দীনের ইমাম বলে বরণ করেছে তার ব্যাপারে যে
কোনো সমালোচনাকারীর বিরূপ মন্তব্য গ্রহণ করা যাবে না- তার প্রমাণ হলো,
পূর্ববর্তীদের অনেকেরই অনেকের ব্যাপারে প্রচুর উক্তি ও মন্তব্য গত হয়েছে।
কখনো তা রাগান্বিত অবস্থায় আবার কখনো হিংসার বশীভূত হয়ে- যেমনটি
দাবি করেছেন ইবনে আব্বাস, মালেক বিন দীনার ও আবু হাযেম- আর কখনো
(কোনো মাসআলায়) ব্যাখ্যাগত (ভিন্নতার) কারণে। এসব এমন একটি বিষয়,

১ জামিউ বয়ানিল ইলমি ও ফায়লিহী : পৃষ্ঠা নং ১০৯৩-১০৯৪ হাদীস নং ২১২৮ (দারু
ইবনিল জাওয়া, দাম্মাম)

যাতে সমালোচনাকারীর বিরূপ মন্তব্য সমালোচিত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আবার কখনো তাদের কতিপয় লোক অন্যের উপর শুধু গবেষণা ও ব্যাখ্যাগত মতভিন্নতার কারণে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করে বসেছে। মূলত যথাপোযুক্ত দলীল ও প্রমাণ ব্যতীকে এসব সমালোচনায় তাদের কারো অনুসরণ করার কোনো আবশ্যিকীয়তা নেই।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. স্বীয় ইলাউস সুনানে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন:

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: ومن ثم لم يقبل جرح الجرحين في الإمام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس وبعضهم بقلة معرفة العربية وبعضهم بقلة رواية الحديث، فإن هذا كله جرح بما لا يجرح به الراوى. (২)

অর্থাৎ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামাতে বলেন, আর এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে সমালোচকদের নিন্দা গ্রহণ করা হয়নি। কেননা, তাঁকে কেউ কেউ অধিক কিয়াস করার কারণে সমালোচনা করেছে আর কতিপয় লোক আরবী ব্যাকরণ ও নীতিমালা কম জানা থাকার অভিযোগে আর কিছু লোক হাদীস অল্প বর্ণনা করার ভিত্তিতে। মূলত এসব এমন কিছু সমালোচনা, যদ্বারা রাবীকে (পরিভাষাগতভাবে) নিন্দা করা যায় না।

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে যেসব অভিযোগ ও সমালোচনা করা হয় তা হিংসা ও বিদ্বেষমূলক কিংবা অভিযোগের অনুপযোগী কিছু দোষ চর্চা বৈ কিছু নয়। আর এ কথা কার না অজানা যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এ উম্মাহর ঐসকল ইমামদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তিত্ব, যাদের ব্যাপারে সিংহভাগ মুসলিমগণ ইমাম ও দীনে ইসলামের নির্ভরযোগ্য খাদেম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই তার ব্যাপারে প্রমাণহীন যার তার কথায় সমালোচনা ও অভিযোগ করা

২ ইলাউস সুনান : ৪/৭৪ হাদীস নং ১০৫১ সংক্রান্ত আলোচনা (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

বোকামী বৈ কিছু নয়। এমতাবস্থায় মুসলিম উম্মাহ সমালোচিত ব্যক্তিকে নয়; বরং সমালোচনাকারীকেই প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করবে।

আলোচনা আর খুব দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজনবোধ করছি না। কেননা, আবু হানীফা রহ. এর বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতায় যে সন্দেহপোষণ করবে সম্ভবত কিছুদিন পর সে দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোর ব্যাপারেও সন্দিহান হয়ে পড়বে।

২ নং হাদীস:

ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাতে বর্ণিত হয়েছে:

১/১২৬৪ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

وَشَرِيكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

২/১২৬৪ - قَالَ (أَيُّ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ): وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي

عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ جَابِرٍ. (১)

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ বিন মানী' রহ. বলেন, আমাদেরকে ইসহাক আযরাক রহ. সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফইয়ান সাওরী রহ. ও শরীক রহ. বর্ণনা করেছেন মুসা বিন আবু আয়েশা রহ. থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রহ. থেকে, তিনি জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার ইমাম থাকবে তার জন্য ইমামদের কিরাতই যথেষ্ট। ইসহাক আযরাক রহ. বলেন, আমাদেরকে জারীর রহ. বর্ণনা করেছেন মুসা বিন আবু আয়েশা রহ. থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রহ. থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। এতে তিনি 'জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত' কথাটি উল্লেখ করেননি।

১ ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা : ২/১৬৮ হাদীস নং ১/১২৬৪ ও ২/১২৬৪ (দারুল ওয়াতন, রিয়াদ)

উপরোক্ত হাদীস দু'টিই সহীহ।

হাফেয বৃসীরী রহ. হাদীস দু'টি বর্ণনা করে বলেন:

إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرِ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَى

شَرْطِ مُسْلِمٍ. (২)

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ এবং দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে দু'টি অভিযোগ খণ্ডন হয়ে যায়।

প্রথমত: কারো কারো ধারণা যে, উক্ত হাদীসটি সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের মধ্য থেকে একমাত্র ইমাম আবু হানীফা রহ.-ই মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য ইমামরা হাদীসটিকে মাওকুফ তথা জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে আবু হানীফা রহ. এর বর্ণনাটি সঠিক নয়। কিন্তু উপরের হাদীস দু'টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. একা নন; বরং তাঁর সমসাময়িক ইমামদের মধ্য থেকে ইমাম সুফইয়ান সাওরী রহ., ইমাম শরীক রহ., ইমাম জারীর রহ.-সহ প্রমুখ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইমাম আবু যুবাইর রহ.ও এটি জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদের সনদ ও মতনের ভাষ্যটি নিম্নরূপ:

ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. (৩)

অর্থাৎ আবুয যুবাইর রহ. সূত্রে জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার ইমাম থাকবে তার জন্য ইমামদের কিরাতই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত: অনেকের ধারণা মতে এ হাদীসটিকে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা রহ.-ই মুত্তাসিল মুসনাদে তথা নিরবচ্ছিন্ন সূত্রপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটিকে মুরসাল তথা তাবেয়ী সূত্রে সাহাবীর নাম উহ্য রেখে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামদের বিপরীত মুত্তাসিল মুসনাদ তথা তাবেয়ী সূত্রে সাহাবীর নাম উল্লেখ করতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বলে বর্ণনা করায় ভুল করেছেন। যেহেতু এ দাবিতে তিনি একা, তার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। তাই খুব সম্ভবত তিনি অন্যান্য ইমামদের মতো এ হাদীসটিকে মুরসাল না বলে মুত্তাসিল মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করায় ভুল করেছেন।

কিন্তু উক্ত হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হলো যে, শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ. একাই হাদীসটিকে মুত্তাসিল মুসনাদ বলেননি; বরং ইমাম সুফইয়ান সাওরী রহ., ইমাম শরীক রহ. এর মতো জলীলুল কদর ইমামদ্বয়ও হাদীসটিকে মুত্তাসিল মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই উক্ত হাদীসটিকে শায কিংবা গরীব (নির্ভরযোগ্য রাবীর এককভাবে বর্ণিত হাদীস) বলে চালিয়ে দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

এছাড়াও জেনে রাখা উচিত যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. উক্ত হাদীসকে যেমন মুত্তাসিল মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তেমনি মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদীরে বলেন:

وَقَدْ أَرْسَلَهُ مَرَّةً أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ. (১)

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা রহ.ও কখনো (অন্যান্য ইমামদের মতো) উক্ত হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এতে প্রতিভাত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট হাদীসটির সনদ মুসনাদ এবং মুরসাল উভয় তরীকায় ছিলো। এর বিপরীত কারো কাছে শুধু মুরসাল সনদ ছিলো আর কারো কাছে শুধু মুসনাদ ছিলো। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, এক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ. এর জ্ঞানের পরিধি অন্যান্যদের চেয়ে একটু বেশীই।

তথাপি আমরা যদি তাদের দাবি অনুযায়ী হাদীসটিকে মুরসাল বলে মেনেও নেই তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, মুরসাল অধিকাংশ গবেষক ও মুহাক্কিকীন উলামা ও মুহাদ্দিসের নিকট প্রমাণযোগ্য হাদীস, যার স্বপক্ষে অনেক মযবুত ও শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে।

হাফেয কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ. জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত উক্ত মুসনাদ হাদীসটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন:

وهذا إسناد الصحيحين. (২)

অর্থাৎ এটার সনদ বুখারী, মুসলিমের সনদের ন্যায় (শক্তিশালী)।
মোটকথা হাদীসটির বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত।

৩ নং হাদীস:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَتْهُ لَهُ قِرَاءَةً. (৩)

অর্থাৎ (ইবনে আবী শাইবা রহ. বলেন,) আমাদেরকে মালেক ইবনে ইসমাইল রহ. বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে সালেহ রহ. থেকে, তিনি আবু যুবাইর রহ. থেকে, তিনি জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, তিনি বলেন, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার ইমাম থাকবে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট।

শাইখ আবু আওয়ামা দা. বা. বলেন:

২ আত-তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার : ১/৩৩২ হাদীস নং ১৮৩ (উম্মুল কুরা, উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রণালয়, মক্কা)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮২ হাদীস নং ৩৮২৩ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. স্বীয় আল জাওহরুননাকীতে বলেন:

وهذا إسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এটা একটি বিশুদ্ধ সনদ।

৪ নং হাদীস:

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (৩)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় ইমামকে একমাত্র অনুসরণ করার জন্যই বানানো হয়েছে। সুতরাং যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন সে কিরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে আর যখন সে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলবে তখন তোমরা আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

ইমাম মুসলিম রহ.-কে এ হাদীস সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন:

هو عندي صحيح. (৪)

অর্থাৎ এ হাদীসটি আমার নিকট সহীহ ও বিশুদ্ধ।

১ প্রাগুক্ত (তালীক)

২ আল জাওহরুননাকী মাআল বাইহাকী : ২/১৫৯ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিযামিয়া, হায়দারাবাদ)

৩ সুনানে নাসায়ী: ১/৬১৩-৬১৪, হাদীস নং ৯২০ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৪ সহীহ মুসলিম: ১/১৭৪, হাদীস নং ৪০৪ সংশ্লিষ্ট (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

https://t.me/islaMic_fdf

ইমাম আহমাদ রহ. ও ইমাম ইবনে হযম রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।^(৫)

৫ নং হাদীস:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَابٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فليؤمِّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا. (৬)

অর্থাৎ আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (নামায) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন ইমামতি করবে। আর ইমাম যখন কিরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।

ইমাম ইবনে আ. বার রহ. স্বীয় আত তামহীদে বলেন:

فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا". (৭)

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মূসা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী “আর যখন ইমাম কিরাত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে” হাদীসটিকে।

৫ আল জাওহরুল্লাকী মাআল বাইহাকী : ২/১৫৭-১৫৮ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিযামিয়া, হায়দারাবাদ), আল মুহাল্লা : ৪/১১১ মাসআলা নং ৪৪৬ (ইদারাতুত তাবাতাতিল মুনীরিয়া, মিশর)

৬ মুসনাদে আহমাদ : ৪/৪১৫ হাদীস নং ১৯৭২৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৭ আত তামহীদ : ১১/৩৪ (অযারাতু উম্মিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, মাগরিব)

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

وسنده سند مسلم إلا على بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري
ثقة مشهور. (১)

অর্থাৎ এ হাদীসের রাবীগণ সব মুসলিমের রাবী শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ব্যতীত।
তিনি হলেন ইমাম ইবনুল মাদীনী রহ., যিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ও প্রসিদ্ধ
নির্ভরযোগ্য রাবী।

এছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিস ও হুফাযে হাদীস পূর্বোক্ত হাদীস
দুটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন:

فقد صحح حديث الإنصات أحمد بن حنبل وإسحاق وصاحبه أبو بكر
الأثرم ثم مسلم ثم النسائي من حيث إخرجه إياه في مجتبه ثم ابن جرير في
تفسيره ثم أبو عمرو بن حزم ثم المنذرى ثم ابن تيمية وابن كثير في تفسيره ثم
الحافظ في الفتح وأخرون وجمهور المالكية والحنابلة. (২)

অর্থাৎ (ইমামের পিছনে) চুপ থাকার হাদীসকে সহীহ বলেছেন- ইমাম
আহমাদ বিন হাম্বল রহ., ইমাম ইসহাক রহ. ও তার ছাত্র ইমাম আবু বকর
আসরাম রহ., এরপর ইমাম মুসলিম রহ., এরপর ইমাম নাসায়ী রহ., -
হাদীসটিকে স্বীয় নির্বাচিত হাদীসগ্রন্থ নাসায়ীতে উল্লেখ করার দৃষ্টিকোণ থেকে-
এরপর ইমাম আবু আমর ইবনে হযম রহ., এরপর হাফেয মুনযিরী রহ., এরপর
হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ., এরপর হাফেয ইবনে কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীর
গ্রন্থে, এরপর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে এবং
আরো অন্যান্য ও সিংহভাগ মালেকী ও হাম্বলী উলামা ও মুহাদ্দিসগণ।

৬ নং হাদীস:

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

১ ইলাউস সুনান : ৪/৫৮ হাদীস নং ১০৪৪ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

২ হাশিয়াতু নাসবির রায় : ২/১৫ (ইসলাম ও ওয়াকফ বিভাগীয় মন্ত্রণালয়, সৌদী আরব)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمْ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَتِهَا. (৩)

অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায পড়ানোকালীন এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে সূরা আ'লা পড়তে শুরু করলো। এরপর তিনি যখন (নামায শেষে) ফিরে বসলেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে কিরাত পড়েছে? বা বললেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে কিরাত পাঠকারী ছিলো? একব্যক্তি বললো, আমি। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিলো, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার কিরাত পাঠে বিরক্ত করছে।

এ হাদীসে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট।

সুনানে বাইহাকীর একটি বর্ণনায় এসেছে:

فَنَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. (৪)

অর্থাৎ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করে দিলেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে বাইহাকীর এ বর্ণনাটিকে হাসান তথা প্রমাণযোগ্য হাদীস বলে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। (বিস্তারিত দেখুন- ইলাউস সুনান : ৪/৬৬-৬৯ হা. নং ১০৪৮ সংশ্লিষ্ট ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৭ নং হাদীস:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে:

৩ সহীহ মুসলিম : ১/১৭২ হাদীস নং ৩৯৮ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

৪ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/২৩১ হাদীস নং ২৯০৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে কিরাত পাঠ করলে তিনি বললেন, তোমরা
তো আমার জন্য কুরআন পাঠ বিভ্রান্তিকর করে ফেলেছো।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. আল জাওহারুন্নাকীতে বলেন:

هذا سند جيد. (২)

অর্থাৎ এটা ভালো একটি সনদ।

আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন:

ورجال أحمد رجال الصحيح. (৩)

অর্থাৎ আহমাদের রাবীরা সহীহ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده حسن. (৪)

অর্থাৎ এর সনদটি হাসান (উত্তম)।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

دلالة على كراهة القراءة خلف الإمام ظاهر. وهو بظاهره يعم الفاتحة

والسورة جميعًا. (৫)

১ মুসনাদে আহমাদ : ১/৪৫১ হাদীস নং ৪৩০৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

২ আল জাওহারুন্নাকী মাআল বাইহাকী : ২/১৬২ (দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ)

৩ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/২৮৩ হাদীস নং ২৬৪০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৩২ হাদীস নং ৩৬৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ ইলাউস সুনান : ৪/৭০ হাদীস নং ১০৪৯ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

অর্থাৎ ইমামের পিছনে কিরাত পড়া অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসটির ভাষ্য সুস্পষ্ট। আর এটা পরিস্কারভাবে ফাতিহা ও অন্য সূরা উভয় কিরাতকে শামিল করে।

৮ নং হাদীস:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آيَاتًا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. (৬)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হুরমুজ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, (একবার নামায শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কিরাত পাঠ করেছে? সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাই তো আমি বলি কী হলো আমার যে, আমাকে কুরআনের সাথে লড়তে হচ্ছে? যখন তিনি উক্ত কথা বললেন এরপর থেকে সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কিরাত পড়া থেকে বিরত থাকলো।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের তালীকে বলেন:

حديث صحيح. (৭)

অর্থাৎ (এটা) সহীহ হাদীস।

আল্লামা হাইসামী রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

رجال أحمد رجال الصحيح. (৮)

অর্থাৎ মুসনাদে আহমাদের (উক্ত হাদীসের) রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯ নং হাদীস:

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (২)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম অলায যাল্লীন’ বলবে তখন তোমরা ‘আমীন’ বলবে। কেননা, যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এ হাদীসের ভাষ্যের দিকে একটু গভীরভাবে তাকালে বুঝা যায়, কিরাত পড়া ইমামের দায়িত্ব আর শোনা ও চুপ থাকা মুক্তাদীর কর্তব্য। কেননা, মুক্তাদীদের যদি কিরাত পড়া আবশ্যিক হতো তাহলে তাদের আমীন বলার কাজটি ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহার শেষ করার সাথে শর্তযুক্ত করা হতো না; বরং নির্দেশ দেয়া হতো যে, ইমাম ও মুক্তাদী প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূরা ফাতিহা শেষ করে তবেই আমীন বলবে। তথাপি যদি মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে কিরাতই পড়ে তাহলে ইমামের ফাতিহা কখন শেষ হলো- তা দেখার অবকাশ কোথায় তাদের? হাদীসে বর্ণিত বিধানটি তো ঐসকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা চুপ থেকে ইমামের কিরাত শুনতে থাকে এবং এ অপেক্ষায় থাকে যে, কখন ইমামের ফাতিহা শেষ হবে।

মোটকথা, এ হাদীস থেকে পরোক্ষভাবে এটাই বুঝা যায় যে, শুধু ইমামই কিরাত পড়বে, মুক্তাদীরা নয়। অর্থাৎ ইমাম হলো পাঠকারী এবং মুক্তাদীরা হলো শ্রবণকারী অথবা নিরবতা অবলম্বনকারী।

১ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/২৮৩ হাদীস নং ২৬৩৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ সহীহ বুখারী : ১/১০৮ হাদীস নং ৭৮২ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় তো ইমামকে বিশেষভাবে القارئ তথা পাঠকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বুখারীর কিতাবুদ্দাওয়াতের ‘আমীন’ বলা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمُّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (৩)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কীরাত পাঠকারী অর্থাৎ ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে।

এ হাদীসে ইমামকে কীরাত পাঠকারী বলে অভিহিত করায় এটাই প্রমাণ হয় যে, কীরাত পাঠের দায়িত্ব একমাত্র তারই। বিষয়টি বিবেকবান লোকদের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস ও ইমাম ইবনে আ. বার রহ., খাতামুল মুহাক্কিকীন ইমামুল আসর শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ.-সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম উক্ত হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কীরাত না পড়ার মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন : মাআরিফুস সুনান।^(৪)

১০ নং হাদীস:

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

৩ প্রাপ্ত : ২/৯৪৭ হাদীস নং ৬৪০২

৪ মাআরিফুস সুনান : ২/৪২৪-৪২৭ আমীন বলার ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায় (এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী)

وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা নামাযে এসে দেখো আমরা সিজদারত অবস্থায় আছি তখন তোমরাও সিজদা করো এবং এটাকে কোনো রাকআত বলে গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি (ইমামকে) রুকুতে পেলো সে নামাযের উক্ত রাকআতই পেয়ে গেলো।

ইমাম হাকিম রহ. স্বীয় মুত্তাদরাকে বলেন:

هذا حديث صحيح الإسناد. (২)

অর্থাৎ এটা সহীহ সনদবিশিষ্ট একটি হাদীস।

হাফেয যাহাবী রহ.ও বলেন:

صحيح. (৩)

অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীস।

শাইখ আলবানী রহ. বলেন:

حديث حسن. (৪)

অর্থাৎ উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস।

মুসনাদে আহমাদে ভিন্ন সূত্রে আরো বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (৫)

১ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৯৪ হাদীস নং ৮৯৩ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৩৩৬ হাদীস নং ৭৮৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ প্রামাণ্য (তালীক)

৪ সহীহ আবী দাউদ : ৪/৪৬ হাদীস নং ৮৩২ (দারুল গিরাস, কুয়েত)

৫ মুসনাদে আহমাদ : ২/২৭১ হাদীস নং ৭৬৬৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে রুকু পেলো সে উক্ত রাকআতই পেলো।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের টীকায় বলেন:

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (৬)

অর্থাৎ বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটা বিশুদ্ধ হাদীস।

মোটকথা, এ হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশুদ্ধতাও সন্দেহাতীত।

এ হাদীস থেকে পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামের পিছনে যারা ইজ্জিদা করবে তাদের জন্য সূরা ফাতিহা বা কোনো ধরনের কিরাত পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, কিরাত পাঠ নামাযের অন্যতম একটি রুকন, যা আদায় না করলে নামাযই হবে না। তথাপি যেহেতু একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত নেই; বরং ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বিধায় মুক্তাদীর সাথে কিরাত পাঠের কোনো সম্পর্কই নেই। এমতাবস্থায় মুক্তাদী শুধু ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হতে পারলেই উক্ত রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

এর বিপরীত যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠকে আবশ্যিক বলে মনে করে তাদের উচিত, ইমামকে রুকুতে পেলোও সরাসরি ইমামের সাথে রুকুতে শরীক না হয়ে প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা তারপর রুকু করা। অথচ এমনটি কেহই করে না, না লা-মাযহাবীগণ আর না অন্যান্যরা। বুঝা গেলো, ইমামের পিছনে ইজ্জিদা করলে ইমামের কিরাতই মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীগণ সরাসরি স্বীকার না করলেও কাজে-কর্মে পরোক্ষভাবে মেনে নেয়।

মোটকথা, মুক্তাদী ইমামের সাথে শুধু রুকুতে শরীক হলেই সে উক্ত রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হওয়ার মাসআলাটি সবার ঐক্যমত সমর্থিত। এতে কারো ইখতিলাফ বা মতানৈক্য নেই। আর এ মাসআলাটির বিশুদ্ধতা ও যৌক্তিকতা একমাত্র নির্ভর করে এ কথার উপর যে, ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাতের জন্য যথেষ্ট।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত না পড়ার মতের পক্ষে দশটি সহীহ মারফূ হাদীস উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে না সূরা ফাতিহা পড়তে পারবে আর না অন্য সূরা; বরং ইমামের কিরাত শোনা গেলে মনোযোগ সহকারে সে তা শুনবে আর শোনা না গেলে নিরবতা অবলম্বন করবে।

মূলত এ মতের পক্ষে আরো অনেক সহীহ মারফূ হাদীস রয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সবগুলো হাদীস উল্লেখ করা হলো না। তথাপিও আশা করা যায়, উপরোক্ত দশটি সহীহ হাদীস সচেতন বিবেকবান লোকদের অমূলক সন্দেহ নিরসনের জন্য যথেষ্ট।

এ পর্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এবং তাঁদের সুযোগ্য অনুসারী তাবেয়ীন রহ. এর আমল ও ফতোয়া দেখবো যে, এ ব্যাপারটিতে তাঁদের মত ও অবস্থান কেমন ছিলো? যাতে আমরা তদানুযায়ী আমল করতে পারি।

৩য় ভাগ:

সাহাবা ও তাবেরীনের মত ও কর্মপন্থা:

এ ভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিখ্যাত কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এর ফতোয়া ও আমল বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও তাবেরীদের মধ্য থেকে অনুসরণীয় কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফতোয়াও সহীহ সনদে নকল করার চেষ্টা করবো। এগুলোর দ্বারা মারফু হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা আরো শক্তিশালী হবে।

১ নং আসর:

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ..... إلخ (১)

অর্থাৎ আতা বিন ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে ইমামের সাথে কিরাত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোনো নামাযেই ইমামের সাথে কিরাত পাঠ নেই।

২ নং আসর:

মুআত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ
يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ
الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ
الْإِمَامِ. (২)

১ সহীহ মুসলিম : ১/২১৫ হাদীস নং ৫৭৭ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ মুআত্তা মালেক : ১/২০৯ হাদীস নং ১৯০ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ ইমাম মালেক রহ. নাফে রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ কি ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে পারে? তখন তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়বে তখন তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। আর যখন একাকী নামায পড়বে তখন তার পড়া লাগবে। নাফে রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না।

এ আসরটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কেননা, ইমাম মালেক রহ. নাফে রহ. সূত্রে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর সনদকে মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায় সোনালী চেইনের সনদ বলা হয়।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

৩ নং আসর:

মুআত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে:

مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ. (২)

অর্থাৎ ইমাম মালেক রহ. ওয়াহাব বিন কাইসান রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কোনো একটি রাকআত পড়লো, যাতে সে ফাতিহা পাঠ করেনি তাহলে সে নামাযই পড়লো না, তবে ইমামের পিছনে হলে এর ব্যতিক্রম (ফাতিহা পাঠ করতে হবে না)।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

১ আসারুস সুনান : পৃষ্ঠা নং ১৩৪ হাদীস নং ৩৬৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

২ মুআত্তা মালেক : ১/১৯৯ হাদীস নং ১৮৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ ইলাউস সুনান : ৪/৮৬ হাদীস নং ১০৫৭ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

(৪) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থাৎ এটা হাসান সহীহ হাদীস।

৪ নং আসর:

শরহ্ মাআনিল আসার তথা তাহাবীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا الْحُصَيْبُ قَالَ: ثنا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ. (৫)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিরাতের জন্য চুপ থাকো। কেননা, নামাযে কিছু কাজ ও ব্যস্ততা রয়েছে, যার জন্য তোমার ইমামই যথেষ্ট হবে।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

(৬) وإسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

ইমাম তাবরানী রহ. স্বীয় মু'জামে কাবীরে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ. (৭)

৪ সুনানে তিরমিযী : পৃষ্ঠা নং ৭২ হাদীস নং ৩১৩ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৫ শরহ্ মাআনিল আসার : ১/২১৯ হাদীস নং ১৩০৭ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৬ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৩৫ হাদীস নং ৩৬৯ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ মু'জামে কাবীর, তাবরানী : ৯/৩০৩ হাদীস নং ৯৩১১ (মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

অর্থাৎ আবু ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে এসে বললো, হে আবু আ. রহমান! (এটা তাঁর উপনাম) আমি কি ইমামের পিছনে কিরাত পড়বো? তিনি বললেন, কুরআনের জন্য চুপ থাকো। নিশ্চয়ই নামাযে কিছু ব্যস্ততা রয়েছে, যার জন্য তোমার ইমামই যথেষ্ট হবে।

এ আসরটির সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং এর সনদ সহীহ।

আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য।

এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ রহ.ও উক্ত আসরটি স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন। এর সনদের ব্যাপারে আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

بسند رجاله رجال الصحيح. (২)

অর্থাৎ এটা এমন একটি সনদে বর্ণিত, যার সবগুলো রাবীই সহীহ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

৫ নং আসর:

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: لَا. (৩)

অর্থাৎ আবু হামযা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সামনে ইমাম থাকাকালীন কি কিরাত পড়বো? তিনি বললেন, না।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده حسن. (৪)

১ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/২৮৫ হাদীস নং ২৬৪৭ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ ইলাউস সুনান: ৪/৮৯ হাদীস নং ১০৫৯ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৩ শরহু মাআনিল আসার: ১/২২০ হাদীস নং ১৩১৬ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

৬ নং আসর:

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে সহীহ মুরসাল সনদে প্রথম তিন খলীফার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. (৫)

অর্থাৎ মূসা বিন উকবা রহ. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

هذا مرسل صحيح. (৬)

অর্থাৎ এটা বিশুদ্ধ মুরসাল। পূর্বে গত হয়েছে যে, মুরসাল বর্ণনা অধিকাংশ মুহাক্কিক ও গবেষক উলামার নিকট প্রমাণযোগ্য। সুতরাং সনদ বিশুদ্ধ হলে কোনো বর্ণনা মুরসাল হলেও অসুবিধা নেই।

৭ নং আসর:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حَدَّثَنَا عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْخَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ. (৭)

৪ আসারুস সুনান: পৃ. নং ১৩৫, হাদীস নং ৩৭১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ২/১৩৯ হাদীস নং ২৮১০ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৬ ইলাউস সুনান : ৪/৯৬ হাদীস নং ১০৬৭ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৭ মুসনাদে আহমাদ : ৬/৪৪৮ হাদীস নং ২৭৫৩০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ কাসীর বিন মুররা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু দারদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সব নামাযেই কি কিরাত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আনসারদের মধ্য থেকে একব্যক্তি বললো, এটা আবশ্যক হয়ে গেলো। এরপর আবু দারদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আমার দিকে দ্রুতগমন করলেন- আর লোকদের মধ্য থেকে আমি তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলাম- তারপর বললেন, হে আমার ভাতিজা, আমি মনে করি ইমাম যখন লোকদের ইমামতি করবে তখন সে তাদের (কিরাতের) জন্য যথেষ্ট হবে।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত দা. বা. বলেন:

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে অবশ্য এটাকে হাসান তথা উত্তম সনদ বলেছেন। (২)

আমার মনে হয়, শাইখ শুয়াইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের সনদকে সহীহ বলেছেন এবং তা আপন স্থানে ঠিক আছে। আর আল্লামা নিমবী রহ. সম্ভবত তাহাবী বা দারা কুতনী সনদকে হাসান বলেছেন। কেননা, তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে দারা কুতনী, তাহাবী ও আহমাদ তিনটির উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম দারা কুতনী রহ.ও এটাকে আবু দারদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্তি বলে স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন:

وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ. وَوَهُم فِيهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. (৩)

অর্থাৎ এবং উক্ত বর্ণনায় (যায়েদ ইবনুল হবার নামক) রাবী বলেছেন, 'এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি মনে করি

১ প্রাগুক্ত (তালীক)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৩৫ হা. নং ৩৭২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ সুনানে দারা কুতনী : ২/১৩৭ হাদীস নং ১২৮০ (মুআসসাতুর রিসালা, বৈরুত)

ইমামই মুক্তাদীদের (কিরাতের) জন্য যথেষ্ট হবে।’ এতে উক্ত রাবী ভুল করেছে। বাস্তব ও সঠিক বর্ণনা হলো, এটা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়; বরং) আবু দারদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্তি।

৮ নং আসর:

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالُوا: لَا تَقْرَأُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ. (৪)

অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ বিন মিকসাম রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, যায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সবাই বলেছেন, ইমামের পিছনে কোনো নামাযেই কিরাত পড়বে না।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৫)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (৬)

হাফেযে হাদীস আল্লামা আইনী রহ. স্বীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ নুখাবুল আফকার ফী তানকীহি মাবানীল আখবার ফী শরহি মাআনিল আসারে উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে বলেন,

وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. (৭)

অর্থাৎ মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটা সহীহ সনদ।

৪ শরহু মাআনিল আসার : ১/২১৯ হাদীস নং ১৩১২ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৩৪ হাদীস নং ৩৬৮ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ ইলাউস সুনান : ৪/৯২ হা. নং ১০৬২ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৭ নুখাবুল আফকার (শরহু মাআনিল আসারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) : ৪/১২৩ (অযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, কাতার)

৯নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ. (১)

অর্থাৎ ইবনে আবী লাইলা রহ., আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়লো সে নববী আদর্শে ভ্রষ্ট হলো।

এর সনদ হাসান হবে। কেননা, মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ব্যতীত বাকী সব রাবী সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। আর মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান সিকা রাবী না হলেও সদূক তথা সত্যবাদী।

হাফেয আইনী রহ. এ আসরটি উল্লেখ করে বলেন,

ومحمد بن سليمان الاصبهاني قال الذهبي: صدوق وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه وقواه ابن حبان وباقي السند على شرط الصحيح. (২)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান ইম্পাহানী- তার ব্যাপারে হাফেয যাহাবী রহ. বলেন, صدوق অর্থাৎ সত্যবাদী। ইমাম তিরমিযী রহ., ইমাম নাসায়ী রহ. ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. স্ব স্ব সুনানে তাঁর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে শক্তিশালী বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া বাকী সনদ সহীহ হাদীসের শর্তানুযায়ী ঠিক আছে।

১০নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي نِجَادٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ. (৩)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৭৮ হাদীস নং ৩৮০২ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ নুখাবুল আফকার : ৪/১১৮ (অযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, কাতার)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৭৮ হাদীস নং ৩৮০৩ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ সাদ (বিন ওয়াক্কাস) রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে চায় যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে তার মুখে জুলন্ত অঙ্গার (দেয়া) হোক।

এ বর্ণনাটি মুনকাতি' (সূত্রবিহীন) হলেও সাদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, তিনি ইমামের পিছনে কিরাত পড়াকে বৈধ মনে করতেন না।

ইমাম ইবনে আ. বার রহ. স্বীয় আত তামহীদে ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার মতালম্বীদের নাম বলতে গিয়ে লিখেন:

وَرُويَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَسَعْدٍ هَؤُلَاءِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُمْ

مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ. (৪)

অর্থাৎ এটা (ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার মতটি) য়ায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও সাদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সনদের বিচারে তা তাঁদের থেকে প্রমাণিত।

পূর্বোক্ত এ দশটি আসর তথা মাওকুফ হাদীস থেকে আমরা এগারো জন শীর্ষস্থানীয় জলীলুল কদর সাহাবীর নাম জানতে পারলাম, যারা ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার প্রবক্তা ছিলেন এবং তা পড়া থেকে নিষেধ করতেন।

এগারোজন সাহাবীগণ হলেন: (১) আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (২) উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৩) উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৪) আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৬) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৭) আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৮) সাদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (৯) য়ায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (১০) আবু দারদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (১১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু

এখন পাঠকবর্গ নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এদের অনুসরণে হিদায়াত রয়েছে নাকি গোমরাহী?

এ পর্যায়ে আমরা বিখ্যাত কতিপয় তাবেয়ীর বর্ণনা উল্লেখ করবো, যারা ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না বা অন্যদেরকে তা পড়তে নিষেধ করতেন।

১১নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لَا. (১)

অর্থাৎ অলীদ বিন কাইস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুয়াইদ বিন গাফালা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি যোহর ও আসরের নামাযে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করবো? তিনি উত্তর দিলেন, না।

এর সনদ বিশুদ্ধ। আল্লামা নিমবী রহ. আত তা'লীকুল হাসান আলা আসারিস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

১২নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. قَالَ: لَيْسَ خَلْفَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ. (৩)

অর্থাৎ আবু বকর রহ. সাঈদ বিন জুবাইর রহ. এর ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি তাঁকে ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইমামের পিছনে কোনো কিরাত পাঠ নেই।

এ বর্ণনার সবগুলো রাবীই সিকা তথা নির্ভরযোগ্য; বরং এরা বুখারী, মুসলিমের রাবী। সঙ্গত কারণেই হাদীসটি সহীহ হওয়ার ছিলো, কিন্তু এতে

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৭ (দারুল কিবলা, জেদা)

২ আত তা'লীকুল হাসান আলা আসারিস সুনান : পৃষ্ঠা নং ১৩৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৩ (দারুল কিবলা, জেদা)

হুশাইম নামক রাবীটি মুদাল্লিস (ক্ষেত্রবিশেষ সনদে লুকোচুরিকারী) হওয়ায় এর সনদটি হাসান হবে। আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে হাদীসটি হাসান হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।^(৪)

১৩নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ. (৫)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. বলেন, ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত বলে আমি জানি না।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৬)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

১৪নং আসর:

মুসান্নাফে আবী শাইবাত্তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ. (৭)

অর্থাৎ কাতাদা রহ. সূত্রে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ইমামের পিছনে নামায পড়াকালীন) ইমামের জন্য চুপ থাকো।

এ বর্ণনাটির সবগুলো বর্ণনাকারী অত্যন্ত উচ্চমাপের সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবী।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আত তা'লীকুল হাসানে বলেন:

وإسناده صحيح. (৮)

৪ ইলাউস সুনান : ৪/১০৩-১০৪ হা. নং ১০৭৭ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৬ আত তা'লীকুল হাসান আলা আসারিস সুনান : পৃষ্ঠা নং ১৩৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৪ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৮ আত তা'লীকুল হাসান : পৃষ্ঠা নং ১৩৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

১৫নং আসর:

কিতাবুল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا قَرَأَ
عَلَقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَلَا فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ وَلَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ
الْأُخْرَتَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ. (১)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখরী রহ. বলেন, আলকামা বিন কাইস রহ. ইমামের
পিছনে কখনো না সূরা ফাতিহা পড়েছেন আর না অন্য কোনো সূরা, না জেহরী
কিরাতবিশিষ্ট নামাযে আর না সিররী কিরাতবিশিষ্ট নামাযে, (না প্রথম
দু'রাকআতে) আর না শেষোক্ত দু'রাকআতে।

এ বর্ণনাটির সবগুলো রাবী অত্যন্ত উচ্চমানের নির্ভরযোগ্য এবং সবাই স্ব স্ব
যুগের ইমাম ছিলেন। তাই এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো
সন্দেহ নেই।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আত তালীকুল হাসানে বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

১৬নং আসর:

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي
يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِيٌّ فَاهُ ثُرَابًا. (৩)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে চায়, যে
ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখ মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হোক।

১ কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ : ১/১৬৩ হাদীস নং ৮৪ (ইহইয়াউল মাআরিফিনুমানিয়া,
হায়দারাবাদ)

২ আত তালীকুল হাসান : পৃষ্ঠা নং ১৩৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ২/১৩৮ হাদীস নং ২৮০৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

سند صحيح رجاله رجال الجماعة. (৪)

অর্থাৎ সহীহ সনদ। এর রাবীগণ মুহাদ্দিসদের বড় এক জামাআতের রাবী।
মূলত এরা সবাই হাদীসশাস্ত্রের বরণ্য ও স্বীকৃত ইমাম।

১৭নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ لَا أَذْرِي
كَمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ مِنْهُمْ
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ. (৫)

অর্থাৎ মালেক বিন উমারা রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কতোজন সঙ্গী ও শাগরিদকে যে জিজ্ঞাসা করেছি বলতে পারবো না- তাঁরা সবাই বলেছেন ইমামের পিছনে কিরাত পড়া যাবে না।
তন্মধ্যে থেকে একজন হলেন আমর বিন মাইমুন রহ.।

এ সনদের মধ্যে মালেক বিন উমারা সম্বন্ধে অনেক তালাশ ও খোঁজ করা সত্ত্বেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বিধায় নির্দিষ্টভাবে এ সনদের মান নিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। তবে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সঙ্গী-সাথীগণ যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না, তা অন্য একটি সহীহ বর্ণনায় প্রমাণিত।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا
يَقْرَأُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ. (৬)

অর্থাৎ আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সঙ্গী-সাথীরা ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করতেন না।

৪ ইলাউস সুনান : ৪/১০৫ হাদীস নং ১০৭৯ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৬ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ২/১৪০ হাদীস নং ২৮১৩ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

এ বর্ণনাটির সবগুলো রাবী সিকা ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম । তাছাড়া এ সনদের বিশুদ্ধতায় প্রভাব ফেলে এমন কোনো ত্রুটি ও সমস্যাও পরিলক্ষিত হয় না । বিধায় এটা সহীহ একটি আসর ।

১৮ নং আসর:

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْجُزِي عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ فِيمَا يَرْفَعُ

بِهِ الصَّوْتُ وَفِيمَا يُخَافُتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (১)

অর্থাৎ ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, আমি আতা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইমামের পিছনে থাকা মুক্তাদীদের জন্য কি ইমামের কিরাত যথেষ্ট হবে- উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে হোক বা নিম্নস্বরে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (যথেষ্ট হবে) ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বর্ণনার সনদের রাবী দু'জন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও হাদীসশাস্ত্রের বরেন্য ইমাম এবং এতে সনদগতও কোনো সমস্যা নেই । সুতরাং আসরটি সহীহ ।

১৯ নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

وَكَانَ يَقُولُ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. (২)

অর্থাৎ মুগীরা রহ. ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইমামের পিছনে কিরাত পড়া অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, তোমার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট ।

এ বর্ণনাটির সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য হলেও হুশাইম যেহেতু মুদাল্লিস রাবী, যার বর্ণনা কবুল হওয়া না হওয়া নিয়ে ইখতিলাফ ও মতভেদ আছে । তাই উলূমে হাদীসের উসূল ও মূলনীতি অনুসারে এটা হাসান পর্যায়ের হাদীস বলে বিবেচিত হবে, যা প্রমাণযোগ্য ।

১ প্রাণ্ড : ২/১৪১ হাদীস নং ২৮১৮

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/২৮০ হাদীস নং ৩৮১৬ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২০ নং আসর:

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ أَبِي كَبْرَانَ قَالَ: قَالَ الضَّحَّاكُ: يُنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ
الإمام. (৩)

অর্থাৎ আবু কাবরান রহ. থেকে বর্ণিত, যাহহাক রহ. বলেন, ইমামের পিছনে (মুজ্তাদীদের) কিরাত পড়তে নিষেধ করা হবে।

এ বর্ণনার দু'জন রাবী ফযল এবং আবু কাবরান উভয়ে নির্ভরযোগ্য। এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতা বা অন্য কোনো ত্রুটিও নেই। তাই এটাও সহীহ সনদ।

পূর্বোক্ত এ আসরগুলো তথা মাকতু হাদীসগুলো থেকে আমরা দশজন শীর্ষস্থানীয় জলীলুল কদর তাবেয়ীর নাম জানতে পারলাম, যারা ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার প্রবক্তা ছিলেন এবং মুজ্তাদীদের ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।

তাঁরা হলেন- (১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. (২) আলকামা রহ. (৩) আসওয়াদ রহ. (৪) মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. (৫) সাঈদ বিন জুবাইর রহ. (৬) সুওয়ায়িদ বিন গাফালা রহ. (৭) ইবরাহীম নাখয়ী রহ. (৮) আতা রহ. (৯) আমর বিন মাইমুন রহ. (১০) যাহহাক রহ.।

এতোক্ষণ এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সহীহ মারফু হাদীসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও তাবেয়ীন রহ. এর ফতোয়া ও আমলেরও বিপরীত। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও আমল অনেক কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাবেয়ীন রহ. সাহাবায়ে কিরামের সোহবত পেয়ে তাঁদের পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। বিধায় তাঁদের আমল ও ফতোয়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই কর্ম ও বাণীরই প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায়, মারফু হাদীসগুলোর পাশাপাশি এসব আসার তথা মাওকুফ হাদীসগুলো থাকা যে কোনো আমল ও বিধান প্রমাণে অত্যন্ত শক্তিশালী সহায়ক।

৪র্থ ভাগ: কিয়াস ও যুক্তি

এ ভাগে আমরা কিয়াস ও যুক্তির আলোকে এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পাবো যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া শুধু কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিকই নয়; বরং যুক্তির নিরিখেও তা সঠিক নয়।

আমরা এখানে দু'ধরনের যুক্তি পেশ করবো। প্রথমত: ইলমী যুক্তি, যা ইলমী একটি মাসআলার সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত: সামাজিক যুক্তি, যা সমাজ ও সাধারণ নলেজের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম যুক্তিটি অবশ্য ইমামের পিছনে কিরাত পড়া নিষেধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না; বরং কিরাত পড়ার আবশ্যকীয়তাকে খণ্ডন করে। অর্থাৎ লা-মায়হাবী ও অন্যান্য যেসব লোক ইমামের পিছনে কিরাত পড়াকে জরুরী ও আবশ্যিক মনে করে এ যুক্তিটি তাদের বিপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ।

প্রথম যুক্তি: আমরা জানি, মুক্তাদী যদি এসে দেখে ইমাম রুকুতে চলে গেছে তাহলে সে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলে হাত বেঁধেই রুকুতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয় এবং সে উক্ত রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা বা কোনো ধরনের কিরাত পড়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। এ মাসআলাটি একটি ঐক্যমত সমর্থিত বিধান। যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যিক মনে করে এবং যারা আবশ্যিক মনে করে না উভয় দলই এ মাসআলাটির ব্যাপারে একমত যে, এমতাবস্থায় মুক্তাদীর ফাতিহা পড়তে হবে না।

এখন আমরা এমতাবস্থায় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়া আবশ্যিক না হওয়ার দু'টি কারণ দর্শাতে পারি। এক: জরুরতের কারণে, অর্থাৎ মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হলেও সময় সংকীর্ণতায় উক্ত রাকআত ছুটে যাওয়ার ভয়ে তার জন্য ফাতিহা পড়ার আবশ্যকীয়তা তুলে নেয়া হয়েছে। দুই: ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা মুক্তাদীর জন্য পড়া আবশ্যিক না হওয়ার কারণে। অর্থাৎ মুক্তাদীর জন্য যেহেতু কিরাত পড়া জরুরী নয় বিধায় কাওমা (দাঁড়ানো) ও তাকবীরে তাহরীমা -এ দু'টি ফরয আদায় করেই রুকুতে ইমামের সাথে শরীক হতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন হলো, এ দু'টি কারণ থেকে কোনটি বাস্তব ও সঠিক কারণ? আমরা বলবো যে, দ্বিতীয় কারণটিই মূল ও সঠিক, প্রথমটি নয়। কেননা, যদি সময় সংকীর্ণতার জরুরত বলে মুক্তাদীর জন্য কিরাত পড়ার আবশ্যকীয়তা তুলে নেয়া হয় তাহলে তো সময় সংকীর্ণতার দোহাই দিয়ে মুক্তাদীর জন্য কাওমা (দাঁড়ানো) এবং তাকবীরে তাহরিমা বলার আবশ্যকীয়তাও তুলে নেয়া যায়। অর্থাৎ মুক্তাদী এসে ইমামকে এমন সময়ে রুকুতে পেলো যে, যদি সে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলে তাহলে সে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হতে পারবে না। এ সময় সংকীর্ণতার জরুরতে যদি সে বাস্তবেই দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা না বলে সরাসরি রুকুতে চলে যায় তাহলে লা-মাযহাবী এবং হানাফীসহ সবার নিকটে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কেননা, সে শুধুমাত্র উক্ত রাকআতকে পাওয়ার জন্য সময় সংকীর্ণতার অযুহাত দেখিয়ে কাওমা (দাঁড়ানো) ও তাকবীরে তাহরিমা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ ফরয এমন একটি বিধান, যা সময় সংকীর্ণতার জরুরতে রহিত হতে পারে না। তাই বলা যায়, মুক্তাদীর কিরাত বা ফাতিহা পড়া যদি ফরয তথা আবশ্যকই হতো তাহলে শুধুমাত্র সময় সংকীর্ণতার অযুহাতে তা রহিত হতো না, যেমনিভাবে রহিত হয় না কাওমা ও তাকবীরে তাহরিমার ফরযিয়াত (আবশ্যকীয়তা)।

তাছাড়া এটাকে মূলত সময় সংকীর্ণতার জরুরতও বলা চলে না। কেননা, জরুরত বলা হয়, যা না হলেই নয়। অথচ মুক্তাদীর জন্য ইমামের সাথে উক্ত রাকআত পাওয়া কোনো জরুরতের মধ্যেই পড়ে না। উক্ত রাকআত না পেলে পরে তা আদায় করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এটা যখন জরুরতের অন্তর্ভুক্তই না তখন মুক্তাদীর জন্য এমতাবস্থায় কিরাত বা ফাতিহা না পড়ে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়ার অবকাশের কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কোনো ধরনের কিরাত পড়াই আবশ্যক নয়।

আর সময় সংকীর্ণতার জরুরতের কারণেই যদি মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়ার আবশ্যকীয়তা রহিত হতো তাহলে সময় সংকীর্ণতা না থাকলে তা রহিত হবে না এবং তা পড়া আবশ্যক হবে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ একজন মুক্তাদী গুরু থেকে মসজিদে ছিলো। এরপর ইকামাত হলে ইমাম নামায গুরু করলো, কিন্তু মুক্তাদী এমনি এমনি বসে রইলো

বা কারো সাথে গল্প করলো। এরপর ইমাম যখন রুকুতে গেলো তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলে ইমামের সাথে রুকুতে গিয়ে शामिल হলো। এখন লা-মাযহাবী ও হানাফীসহ সবার নিকটই তার নামায শুদ্ধ হয়েছে এবং সে উক্ত রাকআত পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। দেখা গেলো, এখানে সময় সংকীর্ণতার জরুরত না থাকলেও মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়ার আবশ্যকীয়তা থাকলো না। বুঝা গেলো, এখানে জরুরতের কারণে মুক্তাদীর কিরাত পাঠের আবশ্যকীয়তা রহিত করা হয়নি; বরং ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য কিরাত পড়া যেহেতু ফরয ও আবশ্যক না বিধায় তার কিরাত পাঠের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। চাই সে ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাক বা রুকু অবস্থায় পাক। সুতরাং ইলমী এ যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হলো যে, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরাত পড়া কোনো অবস্থাতেই আবশ্যক নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি: নামায হলো আল্লাহর প্রার্থনা। আর কুরআন আল্লাহর বাণী ও কালাম, যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর সাথে কথা বলে। জামাত হলো একতা, সংঘবদ্ধতা। ইমাম ও মুক্তাদীরা মিলে জামাতের সহিত নামায পড়ার অর্থ হলো- সংঘবদ্ধ কিছু লোক মিলে আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও তার কাছে কিছু চাওয়া, আবেদন করা।

এখন দেখার বিষয় বড় কারো কাছে সংঘবদ্ধভাবে কোনো কিছু চাওয়ার নিয়ম কী? সবাই একসাথে আওয়ায করে চাইবে, নাকি একজন দলপতি হয়ে সবার পক্ষ থেকে আবেদন জানাবে? আমরা সামাজিকভাবে দুনিয়ার নিয়মে দেখি, কোনো এলাকাবাসী বা কোনো দল তাদের নেতা বা সরকারের কাছে কোনো কিছুর আবেদন করতে চাইলে প্রথমত তারা নিজেদের মধ্য থেকে বাকপটু ও অভিজ্ঞ বিচক্ষণ একজন লোককে নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ঠিক করে, যে তাদের সবার পক্ষ থেকে তাদের নেতা বা সরকারের কাছে নিজেদের প্রয়োজন তুলে ধরে তা পূরণের আবেদন জানায় আর বাকীরা তাকে সমর্থন করে। আর এটাই মূলত সঠিক নিয়ম। কেননা, সবাই একসাথে কথা বললে তা যেমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তেমনি তা নেতার প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের জন্য অসম্মানীর একটি কারণ হয়ে দেখা দিবে। সঙ্গত কারণেই সংঘবদ্ধভাবে কারো কাছে কিছু চাইলে বা কথা বলতে চাইলে একজনের মাধ্যমেই তা সম্পাদন করা উচিত ও যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং একসাথে সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে এ নীতি ও পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। যেনো কুরআনের মাধ্যমে ইমাম মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলছে। এমতাবস্থায় অন্যরাও যদি ইমামের মতো কথা বলতে শুরু করে তাহলে তা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাশাপাশি -যেমনটি কিছু কিছু হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়- কুরআন তথা কালামুল্লাহর অবমাননারও কারণ হয়। তাই ইমাম কিরাত পড়াবস্থায় মুক্তাদীদের কিরাত পড়া সম্পূর্ণ অনুচিত ও অযৌক্তিক।

এতোক্ষণ পর্যন্ত এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা চারটি ভাগ তথা সহীহ তাফসীর, সহীহ মারফু হাদীস, সহীহ ও প্রমাণযোগ্য আসার ও সঠিক যুক্তির আলোকে এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীরা কোনো ধরনের কিরাত পড়বে না। সুতরাং যারা বলে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয এবং তা না পড়লে মুক্তাদীর নামাযই হবে না তাদের কথা ঠিক নয়। পূর্বোক্ত প্রমাণগুলো দেখে পাঠক নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার প্রমাণগুলো বহু শক্তিশালী।

১৬তম পাঠ:

(এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং অন্যান্য সূরা পাঠ কারীকে তারাহুরা করে নামাজ পড়া কারীকে রাসূল (সাঃ) নামাজ চোর বলেছেন। দুই সিজদার মাঝে দোয়া পরতে হবে। পর পর দুটো সেজদা দেওয়া যাবে না। দেখুনঃ বোখাঃ ইসঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪০ পৃঃ ৭৮১ নং হাদীস।

জবাব:

এ অভিযোগটিতে তিনটি জালিয়াতি করা হয়েছে।

এক: এখানে এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা এবং অন্যান্য সূরা পাঠকারীকে তাড়াহুড়াকারী বলা হয়েছে। আর এমন তাড়াহুড়াকারী নামাযীকে নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায চোর বলেছেন। অথচ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বা বাণী নয়।

দুই: অভিযোগটিতে দাবি করা হয়েছে দু'টি জিনিসের; কিন্তু বুখারীর উদ্ধৃতি এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, দেখে মনে হয় উভয় দাবিটির প্রমাণ বুখারীতে রয়েছে। অথচ প্রথম দাবিটির সাথে উক্ত উদ্ধৃতির কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিন: 'দুই সিজদার মাঝে দুআ পড়তে হবে' এমন কথা দ্বারা বুঝা যায় এ সময় দুআ পড়া জরুরী ও আবশ্যিক। অথচ বুখারীর ৭৮১ নং হাদীসে দুই সিজদার মাঝে দুআ পড়ার আবশ্যকীয়তার প্রমাণ তো দূরে থাক সাধারণ কোনো দুআর কথাও উল্লেখ নেই।

আমরা একটু বিস্তারিতভাবে উপরের কথাগুলোর ব্যাখ্যা করছি।

এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পাঠকারীকে তাড়াহুড়াকারী বলে তাকে নামায চোর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও বলেননি। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে রুকু-সিজদা আদায় না কারীকে নিকৃষ্ট চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يُسَمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. (১)

قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. (২)

অর্থাৎ আবু কাতাদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম বলেন, কিভাবে সে নামায চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু এবং সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না। (ইমাম হাকিম রহ. বলেন,) এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস এবং তারা এটা বর্ণনা করেননি।

হাফেয যাহাবী রহ. তালখীসে বলেন, এটা বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী ঠিক আছে।

মূলত কিরাত, মদ ও মাখরাজ ঠিক রেখে একটু দ্রুততার সাথে পড়লে কোনো সমস্যা নেই। যেমন সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ. (৩)

১ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৩৫৩ হাদীস নং ৮৩৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ প্রাণ্ডক্ত (তালীক)

৩ সহীহ বুখারী : পৃষ্ঠা নং ১১৬ হাদীস নং ৭০৮ (দারুস সালাম, রিয়াদ)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে (কিরাতেব দিক থেকে) সংক্ষিপ্ত-দ্রুত এবং (রুকু-সিজদা আদায়েব দিক দিয়ে) পরিপূর্ণ নামায আর কোনো ইমামেব পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনে পেতেন এবং তার মায়ের দুঃশ্চিন্তায় পড়ার আশংকায় (নামায) সংক্ষেপ করতেন।

সহীহ বুখারীবি অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (১)

অর্থাৎ আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের নামাযে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামাতে) নামাযকে খুব দীর্ঘায়িত করেন। আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নসীহত করতে গিয়ে সে দিনেব ন্যায় এতো বেশী রাগান্বিত থেকে আর কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, তোমাদেব মধ্যে কিছু লোক বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদেব মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে নামায আদায় করে সে যেনো (নামায) সংক্ষেপ ও একটু দ্রুত করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমান্দ লোকও থাকে।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়, সূরা-কিরাত একটু সংক্ষিপ্ততার সহিত পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এতো দ্রুত পড়া ঠিক নয় যে, মদ-মাখরাজই ঠিক থাকে না। তবে স্বাভাবিক কিরাতেব আদব হলো ওয়াকফ করে ধীরে ধীরে পড়া। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে খুব দ্রুততার সহিত সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়া একেবারেই অনুচিত।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

ورتل القرآن ترتيلاً^(২)

অর্থাৎ আর আপনি কুরআনকে সুন্দরভাবে ধীরস্থিরভাবে স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করুন।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও নিয়ম হলো, থেমে থেমে ওয়াকফের স্থানে ওয়াকফ করে স্পষ্টভাবে পড়া। তবে সূরা ফাতিহায় যেহেতু লাযেম তথা আবশ্যিক কোনো ওয়াকফ নেই বিধায় কেউ যদি এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা পুরাটা পাঠ করে তাহলে তা খুবই অনুচিত কাজ হলেও তার নামায হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বান্দার এরূপ তাড়াহুড়া করে কুরআন পড়া কিছুতেই শোভনীয় নয়।

তথাপি এটাও মনে রাখা উচিত যে, এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা পড়া হানাফী উলামায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়। তাঁদের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে এরকম কথা বলা হয়নি; বরং আমরাও বলি যে, সূরা ফাতিহা ওয়াকফ করে প্রত্যেক আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়া সুন্নাত। এর বিপরীত করা অনুচিত। কিন্তু লা-মায়হাবীরা লিফলেটে যেভাবে বিকৃতির সহিত মাসআলাটিকে উত্থাপন করেছে আমরা শুধু সে বিকৃতি ও ভুল ধারণাকে খণ্ডন করার প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। নতুবা আমরাও তাড়াহুড়া করে কিরাত পড়ার প্রবক্তা নই।

লিফলেটে উল্লেখিত দ্বিতীয় দাবি অর্থাৎ দুঃসিজদার মাঝে থেমে দুআ পড়তে হবে- এটা ১৬ নং অভিযোগে থাকা সত্ত্বেও ১৭ নং অভিযোগে পুনরায় একই অভিযোগ করা হয়েছে। এটাও মূলত অভিযোগ সংখ্যা সাধারণ মানুষের চোখে একটু বেশী করে দেখানোরই একটি অপপ্রয়াস। আমরা এ অভিযোগের খণ্ডন ১৭তম পাঠেই করবো, ইনশাআল্লাহ।

১৭তম পাঠ:

(দু'সিজদার মাঝে দুআর আবশ্যকীয়তা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

দুই সিজদার মাঝে থেমে দোয়া পড়তে হবে। পর পর দুটি সিজদা দেওয়া যাবে না। বোঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪০ পৃঃ ৭৮১ নং হাদীস।

জবাব:

দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা আবশ্যিক- এটা ঠিক আছে, তবে দুআ পড়ার বিষয়টি এমন আবশ্যিক কিছু নয়। অথচ লিফলেটের ভাষ্য হলো, দুই সিজদার মাঝে থেমে দুআ পড়তে হবে, যার দ্বারা বুঝা যায় তা পড়া আবশ্যিক। কিন্তু এ দাবিটি সঠিক নয়। কেননা, এমন অনেক সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, যেথায় দু'সিজদার মাঝে শুধু সোজা হয়ে বসার কথা এসেছে, দুআর কথা নয়।

এখন প্রথমে আমরা দেখবো, লিফলেটে বুখারীর যে উদ্ধৃতি দিয়ে দু'সিজদার মাঝে থেমে দুআ পড়া আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ দেয়া হয়েছে, তাতে কী লিখা আছে?

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বুখারীর ২য় খন্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় ৭৮১ নং হাদীস এভাবে লিখা আছে:

(৭৮১) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيْئَةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا... إلخ^(১)

(৭৮১) আবু নূমান (রহ.)..... আবু কিলাবা (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইবন হুয়াইরিস (রা.) তাঁর সাথীদের বললেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না? (রাবী) আবু কিলাবা

১ বুখারী শরীফ : ২/১৪০ হাদীস নং ৭৮১ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা)

(রহ.) বলেন, এ ছিল সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন, তারপর রুকু করলেন এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজদা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এ ভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইবন সালামার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন.....।

বি. দ্র.: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বুখারীতে এমনই লিখা আছে। তবে উপরের দাগটানা যে অংশটি রয়েছে তা অনুবাদে লিখা হলেও মূল বুখারীর আরবীতে এ অংশ নেই। অর্থাৎ এ অংশটি হাদীসের অনুবাদের অংশ নয়। বিষয়টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেনো পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদ থেকে এ অংশটি বাদ দিয়ে দেয়।

পাঠকবর্গ, একটু খেয়াল করে দেখুন এ হাদীসটির সাথে তাদের দাবির কোনোই মিল নেই। এ বর্ণনায় দু'সিজদার মাঝে না দুআ পড়ার কথা আছে আর না তা আবশ্যিক হওয়া বুঝায় এমন কোনো কথা আছে। তাতে শুধু এতোটুকু আছে যে, সিজদায় গিয়ে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। আমরাও তো এটাই বলি যে, দু'সিজদার মাঝে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসাটা আবশ্যিক। সুতরাং হাদীসটি আমাদের পক্ষের প্রমাণ বহন করে, তাদের নয়।

সম্মানিত পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন- এ লা মাযহাবীরা কতোবড় জালিয়াতি ও ধোকাবাজির আশ্রয় নিয়েছে! বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে মিথ্যার আশ্রয় নিতেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। এরা মূলত আহলে হাদীস নয়; বরং হাদীসের ব্যবসায়ী।

এখন আমরা এমন কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করবো, যাতে দুই সিজদার মাঝে শুধু স্থির হয়ে বসার কথা এসেছে, দুআ পড়ার কথা বলা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের বিবরণ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ

يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبْهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রমযান মাসেৱ নামায হোক বা অন্য কোনো সময়েৱ, ফরয নামাযে হোক বা অন্য কোনো নামায, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সিজদার জন্য অবনত হওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। আবার সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। এরপর (দ্বিতীয়) সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এৱ নামাযেৱ সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এৱ নামায এমনই ছিলো।

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়েৱ জন্য এভাবে শিরোনাম বেঁধেছেন:

باب المكث بين السجدةتين. (২)

অর্থাৎ দু'সিজদার মাঝে অপেক্ষা করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।

এ অনুচ্ছেদে তিনি মালেক বিন হুয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এৱ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা এ পাঠেৱ শুরুতে আরবী পাঠসহ উল্লেখ করেছি।

১ সহীহ বুখারী : পৃষ্ঠা নং ১৩০ হাদীস নং ৮০৩ (দারুস সালাম, রিয়াদ)

২ প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ১৩৩ হাদীস নং ৮১৮ (দারুস সালাম, রিয়াদ)

নামায শিক্ষাপ্রদান সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রাম্য এক সাহাবীকে নামায শিক্ষা দিয়েছিলেন-বুখারীর বর্ণনায় তা এভাবে এসেছে:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.... الخ (৩)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়া শুরু করলো। তৃতীয়বারে সে ব্যক্তি বললো, তাহলে আমাকে (নামায) শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন পূর্ণরূপে অযু করবে। তারপর সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা আদায় করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসবে। তারপর (দ্বিতীয়) সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা আদায় করবে।.....

এ ধরনের আরো অনেক সহীহ হাদীস আছে, যেগুলোতে শুধুমাত্র দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে স্থিরতার সহিত বসার কথা এসেছে, দুআর কথা নেই। এজন্য আমরা দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসাকে ওয়াজিব তথা আবশ্যিক বলি, দুআ পড়াকে নয়।

তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু বর্ণনায় অবশ্য দু'সিজদার মাঝে বিভিন্ন ধরনের দু'আ পড়ার কথাও পাওয়া যায়।

যেমন মুত্তাদরাকে হাকিমের একটি বর্ণনায় এসেছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (১)

অর্থাৎ হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ‘রাব্বিগফিরলী’ অর্থাৎ হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, অবশ্য তাঁরা হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

সুনানে তিরমিযীর একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي. (২)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে বলতেন, ‘আল্লাহ্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন এবং সাহায্য করুন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং রিযিক দান করুন।

১ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৪০৫ হাদীস নং ১০০৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ সুনানে তিরমিযী : ২/৬২ হাদীস নং ২৮৪ (দারুল হাদীস, কায়রো)

মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে প্রায় অনুরূপ দুআই বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে *وارفعني* (ওয়ারফানী) একটি শব্দ অতিরিক্ত এসেছে,^(৩) যার অর্থ আমাকে উঁচু করুন অর্থাৎ সম্মানিত করুন।

এসকল বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, দু'সিজদার মাঝে কিছু দুআ পড়ার কথা পাওয়া যায়। আর পূর্বের বর্ণনাগুলোতে এ ধরনের কোনো দুআর কথা আমরা দেখতে পাইনি। ফুকাহায়ে কিরাম ও প্রাজ্ঞ মুহাদিসগণ এ সাংঘর্ষিকতার সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, যেসকল হাদীসে দু'সিজদার মাঝে দুআ পড়ার কথা এসেছে, তা নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যেসব হাদীসে কোনো দুআ পড়ার কথা আসেনি তা ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত নফল ও একাকী নামাযে অনেক ধরনের দুআ পড়তেন এবং কিরাত, রুকু, সিজদা সবই দীর্ঘায়িত করতেন। পক্ষান্তরে ফরয নামাযে সাধারণত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে সূরা, কিরাত, দুআ-কালাম ইত্যাদি নফল নামাযের মতো অতো বেশী পড়তেন না। বরং ক্ষেত্র বিশেষ ফরয নামাযকে খুবই সংক্ষেপে শেষ করতেন, যা বুখারীর অনেক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

এছাড়াও সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, দু'সিজদার মাঝে কিছু দুআ পড়া শুধু রাতের নফল নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হাদীসটি হলো:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجُعْدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي
رَبِّ اغْفِرْ لِي. (৪)

৩ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৪০৫ হাদীস নং ১০০৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৮৭ হাদীস নং ৮৭৪ (দারুল হাদীস, কায়রো), সুনানে নাসায়ী : ২/৬৪ হাদীস নং ১১৪৪ (দারুল হাদীস, কায়রো)

অর্থাৎ হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতের নফল নামায পড়তে দেখেছেন। আর তিনি দু'সিজদার মাঝে সিজদার সময়ের মতো বসে থাকতেন এবং বলতেন, 'রাব্বিগফিরলী রাব্বিগফিরলী' অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার প্রভু! আমাকে মাফ করুন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এসব বিভিন্ন দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু নফল নামাযে; বিশেষত রাতের নফল নামাযে পড়তেন আর ফরয নামায যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। এ ব্যাখ্যানুসারে হাদীসগুলোর মধ্যে আর কোনো সাংঘর্ষিকতা বাকী থাকে না।

পূর্বের আলোচনার সারকথা হলো, দু'সিজদার মাঝে ধীরস্থির হয়ে বসাটা জরুরী, কিন্তু এসময়ে কোনো ধরনের দুআ পড়াটা আবশ্যিক নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি পড়তে চায় তাতে কোনো সমস্যা ও বাধাও নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নফল নামাযে দু'সিজদার মাঝে কিছু দুআ পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এতে কারোরই বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

১৮তম পাঠ:

(তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও দু'হাত উত্তোলন সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

প্রত্যেক রাকাতে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে হাজার হাজার সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একবার হাত উঠাতে হবে আর হবে না বলে তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসাইতে হাদীসটি বর্ণিত আছে, তা উনারা হাদীসটি সহীহ নয় বলেছেন। রাফইল ইয়াদাইন করতে হবে। বোঃ ইঃ ২য় খন্ড ১০০ পৃঃ ৭০১ নং হাদীস।

জবাব:

একাধিক সহীহ মারফু তথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ও অধিকাংশ মাওকুফ হাদীস তথা সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও তাবেরীন রহ. এর আমল ও ফতোয়া প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়ই হাত উঠানো সূনাত, অন্যান্য সময় নয়। সাহাবায়ুগে মদীনা ও কূফা নগরীতেই অধিকাংশ সাহাবীর অবস্থান ছিলো। কূফা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাঁচশ সাহাবাসহ মোট পনেরশ সাহাবী থাকতেন। এদের মধ্য থেকে আমীরুল মুমিনীন আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও মুজতাহিদ সাহাবী আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন নসর রহ. বলেন:

لَا نَعْلَمُ مَصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ تَرَكُوا بِإِجْمَاعِهِمْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ

إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ. (১)

১ আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুআত্তা মুহাম্মাদ : পৃ. নং ৯১ হাদীস নং ১০৪ সংক্রান্ত আলোচনা (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

অর্থাৎ আমরা কূফার অধিবাসী ছাড়া এমন কোনো শহর সম্পর্কে জানি না, যার অধিবাসীরা সকলে ঐক্যবদ্ধতার সহিত নামাযে ঝোঁকা ও সোজা হওয়ার সময় হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন।

এ থেকে বুঝা যায়, অন্যান্য শহরে তাকবীরে তাহরিমার সময় ছাড়া অন্য সময়ে হাত তোলা ও না তোলা উভয় মতের লোক ছিলো। একমাত্র কুফাই এমন নগরী, যার অধিবাসীদের সবাই রাফউল ইয়াদাইন তথা তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টিও পাঠকের জানা থাকা দরকার যে, কূফা নগরী অন্যান্য শহরের মতো শুধু সাধারণ একটি শহরই ছিলো না; বরং তা ছিলো হাদীস ও ফিকহ চর্চার অন্যতম একটি প্রাণকেন্দ্র ও ইলমী শহর, যার অধিবাসীদের আমল অনেকাংশে দলীল ও প্রমাণোপযোগী।

ইমাম বুখারী রহ. এর একটি মন্তব্য থেকে কূফা নগরীর মর্যাদা ও ইলমী অবস্থান পরিষ্কার হয়। তিনি তাঁর ইলম অন্বেষণের সফর সম্বন্ধে বলেন:

دَخَلْتُ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْجَزِيرَةَ مَرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَأَقَمْتُ بِالْحِجَازِ سِتَّةَ أَغْوَامٍ وَلَا أَحْصِي كَمْ دَخَلْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِينَ. (১)

অর্থাৎ আমি (ইলম অন্বেষণে) সিরিয়া ও মিসরে প্রবেশ করেছি দু'বার, বসরায় চারবার, হিজায়ে অবস্থান করেছি ছয় বছর আর মুহাদ্দিসদের সাথে কূফা ও বাগদাদ নগরীতে কতোবার যে প্রবেশ করেছি তার কোনো ইয়াক্তা নেই!

আরেক ইলমী শহর মদীনা শরীফেও তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্য সময়ে হাত উঠানোর তেমন একটা প্রচলন ছিলো না।

মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম মালেক রহ., যিনি মদীনাবাসীদের আমল ও প্রচলন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা দলীল হিসেবেও পেশ করতেন- রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কে বলেন:

لَا أَعْرِفُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لَا فِي خَفْضٍ وَلَا فِي رَفْعٍ
إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ شَيْئًا خَفِيفًا. (২)

অর্থাৎ নামাযের সূচনালগ্ন তথা তাকবীরে তাহরিমার সময় হালকাভাবে দু'হাত উঠানো ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর বলার সময় -না ঝাঁকার সময় আর না উঠার সময়- দু'হাত উঠানোর নিয়মের কথা আমি জানি না।

এতে বুঝা যায়, সাহাবা ও তাবেয়ীযুগে মদীনা শরীফে তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্যান্য সময় তথা রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় বা নামাযের অন্যান্য সময় দু'হাত উঠানোর তেমন কোনো প্রচলন ছিলো না। যদি তা প্রচলনই থাকতো তাহলে মদীনার ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মালেক রহ. এ ক্ষেত্রে لَا أَعْرِفُ (অর্থাৎ আমি জানি না) বলতেন না।

যাই হোক আমরা এখন মৌলিক আলোচনা তথা দলীল ও প্রমাণাদি নিয়ে কথা বলবো।

প্রথমত: লিফলেটটিতে উল্লিখিত দাবি থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক রাকআতে রাফউল ইয়াদাইন করা আবশ্যিক। যেনো তা না করলে নামাযই হবে না। কিন্তু এটা একটি ভুল দাবি। কেননা, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করা নিয়ে পূর্বের ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতবিরোধ থাকলেও কেউ এ দাবি করেননি যে, তা করা ফরয বা আবশ্যিক। বরং তাঁদের কারো মতে তা করাটা সুন্নাত আর কারো মতে তা না করাটাই সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত: লিফলেটে দাবি করা হয়েছে যে, রাফউল ইয়াদাইন হাজার হাজার সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এটাও একপ্রকার ধূর্তামি। কেননা, বিধি-বিধান সংক্রান্ত সব হাদীসের সমষ্টিগত সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার) এর মতো। এর মধ্যে আবার কিছু হাদীস আছে সহীহ, কিছু হাসান এবং কিছু যঈফ। এখন যদি রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষেই হাজার হাজার সহীহ হাদীস থাকে তাহলে শরীয়তের বাকী হাজারো বিধি-বিধানের পক্ষে হাদীস অবশিষ্ট থাকলো কোথায়? আর এ তিন হাজার হাদীসেও যেহেতু সহীহ, হাসান ও যঈফ রয়েছে তাই রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাজার হাজার সহীহ হাদীস থাকার দাবি করা যে কতো বড় ধূর্তামি ও ভ্রান্তি -তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

তৃতীয়ত: লিফলেটের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, লেখকের আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী ছাড়া অন্য কোনো হাদীসগ্রন্থের নাম জানা নেই। এদের অবস্থা মূলত এমনই। এরা শুধু সিহাহ সিত্তা তথা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এ ছয়টি গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো হাদীসগ্রন্থের তেমন খবর রাখে না। অথচ এর বাইরে আরো কতো শত যে হাদীসের গ্রন্থ রয়েছে, তার কোনো ইয়াত্তা নেই! তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্যান্য সময়ে দু'হাত না তোলার হাদীস যে আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী ছাড়াও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে তা হয়তো এসব লা-মাযহাবীরা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই তাদের স্বভাবসুলভ শ্লোগানে এ দাবি করে বসলো যে, এ সংক্রান্ত হাদীসটি যঈফ।

এ পর্যায়ে আমরা এখন দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এক: প্রত্যেক রাকআতে রাফউল ইয়াদাইন করা যে ফরয ও আবশ্যিক নয়, তা তাঁদেরই কতিপয় ইমাম ও মান্যবর ব্যক্তিত্বের বাণী ও উক্তি দ্বারা প্রমাণ করা। দুই: সহীহ প্রমাণযোগ্য হাদীস ও আসারে সাহাবা থেকে এ প্রমাণ পেশ করা যে, তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'হাত তোলা সুন্নাত নয়; শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমার সময়ই দু'হাত উঠানো সুন্নাত।

লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন বড় একজন ইমাম আল্লামা ইবনে হযম রহ. রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করা উভয় প্রকারের হাদীস সহীহ মেনে নিয়ে বলেন:

فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ
الْإِحْرَامِ وَلَا يَرْفَعُ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحًا لَا فَرَضًا، وَكَانَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَذَلِكَ.
فَإِنْ رَفَعْنَا صَلَاتِنَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ
نَرْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي. (১)

অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরিমার পর প্রত্যেক উঠাবসায় দু'হাত উঠিয়েছেন

১ আল মুহান্না, ইবনে হযম : ৩/২৩৫ মাসআলা নং ৩৫৮ (ইদারাতুত তাবাতাতিল মুনীরিয়া, মিসর)

এবং (এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, দু'হাত আর) উঠাননি তখন উভয় পদ্ধতিই বৈধ, (কোনোটিই) ফরয বা আবশ্যিক নয়। আর আমাদের এ অবকাশ রয়েছে যে, আমরা অনুরূপ (দু'পদ্ধতিতেই) নামায পড়বো। সুতরাং যদি আমরা (তাকবীরে তাহরিমা পরবর্তী) দু'হাত উঠাই তাহলে আমরা তেমনই নামায পড়লাম যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন। আর যদি আমরা (তাকবীরে তাহরিমা পরবর্তী) রাফউল ইয়াদাইন না করি তাহলেও আমরা তেমনই নামায পড়লাম যেমনটি পড়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

লা-মাযহাবীদের আরেক বড় ইমাম অন্যতম আস্থাভাজন আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহ. রাফউল ইয়াদাইনের মতভেদ সম্পর্কে বলেন:

وَمِنْ هَذَا أَيْضًا جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَهَذَا مِنَ الْإِخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُعْتَفُ فِيهِ مَنْ فَعَلَهُ وَلَا مَنْ تَرَكَهُ وَهَذَا كَرَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرْكِهِ..... (২)

অর্থাৎ উচ্চস্বরে ইমামের আমীন বলাও এ জাতীয় মতভেদের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা এমনই বৈধ এক মতানৈক্য, যাতে আমলকারী ও বর্জনকারী কাউকেই ভৎসনা করা যাবে না। এটা তেমনই যেমন রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করার মতভেদ।

লা-মাযহাবীদের সবচেয়ে আস্থাভাজন ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ জাতীয় ইবাদাতের প্রকারভেদের মতভেদ সম্পর্কে বলেন:

وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْمَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إِذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ. كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي نَوْعِي الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ وَتَرْكِهِ وَنَوْعِي الْإِقَامَةِ شَفْعِيهَا وَإِفْرَادِهَا وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّسْهُدَاتِ وَأَنْوَاعِ الْإِسْتِغْثَاخَاتِ وَأَنْوَاعِ الْإِسْتِعَاذَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

وَبَعْدَهُ وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ
هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفْضَلُ عَلَى بَعْضٍ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ
الْآخِرُ. (১)

অর্থাৎ এ বিষয়ে আমাদের সবচে বিশুদ্ধ নীতিমালা হলো- উক্তিমূলক হোক বা কার্যমূলক ইবাদাতের সবগুলো পদ্ধতিই যখন প্রমাণযোগ্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হবে তখন এ পদ্ধতিগুলোর কোনোটিই অপছন্দনীয় হবে না; বরং তার সবগুলোই শরীয়াহসম্মত হবে। যেমনটি আমরা বলেছি, সালাতুল খাওফের পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে, আযানের দু'টি প্রকার তারজী' করা ও তা বর্জন করার ব্যাপারে, ইকামাতের দু'টি পদ্ধতি জোড়সংখ্যার ইকামাত ও বিজোড় সংখ্যার ইকামাতের ব্যাপারে এবং যেরকমভাবে আমরা বলেছি তাশাহহুদ, সানা, আউযু, কিরাত, ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, জানাযার নামায, সিজদায়ে সাহু, রুকূর আগে বা পরে দুআ কুনূত পড়া, 'রাব্বানালাকাল হামদ' বাক্যে (ওয়া) শব্দটি রেখে ও না রেখে পড়া এবং আরো ইত্যাদির প্রকারগুলোর ব্যাপারে। হ্যাঁ, কখনো এ বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর কোনোটি মুস্তাহাব ও (বেশীর চেয়ে বেশী) অন্য পদ্ধতি থেকে উত্তম হতে পারে যখন তা উত্তম হওয়ার উপযোগী প্রমাণযোগ্য কোনো দলীল থাকবে, কিন্তু অপরটি অপছন্দনীয় হবে না।

এটাই মূলত ইনসাফভিত্তিক কথা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাই একটাকে সুন্নাহর স্বীকৃতি দিয়ে অপর পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বা বিদআত ও পরিত্যাজ্য বলা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ও সহীহ হাদীসকেই অবজ্ঞা করার শামিল, যা সঠিক পথের অনুসারী কোনো মুসলিম থেকে কল্পনাও করা যায় না। আমাদের পূর্ববর্তী আসলাফ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। এমনকি বর্তমান লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের অন্যতম আস্থাভাজন বড় তিন ইমাম আল্লামা ইবনে হযম রহ., আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওয়ী রহ. পর্যন্ত এ সত্য ও বাস্তবতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১ মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া : ২৪/১৩২ সালাতুল ঈদাইন অধ্যায়- তাহকীক: আল জাযযার ও আনওয়ার আল বায (দারুল অফা, কায়রো) মূল নুসখার পৃষ্ঠা নং ২৪/২৪২-২৪৩

এখন আমরা ঐসকল বিশুদ্ধ হাদীস ও আসারে সাহাবা উল্লেখ করবো, যেগুলো থেকে এ প্রমাণ মিলে যে, নামাযে তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্যান্য স্থানে দু'হাত উঠানো সুন্নাত নয়। পূর্বে নামাযের বিভিন্ন স্থানে হাত উঠানোর নিয়ম থাকলেও পরে তা রহিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আলোচনা ইনশাআল্লাহ হাদীস ও আসারে সাহাবা উল্লেখ করে তারপর করবো।

১ নং হাদীস :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ إلخ (২)

অর্থাৎ জাবের বিন সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, আমার কী হলো যে আমি তোমাদেরকে নামাযে বেয়াড়া ঘোড়ার মত হাত উত্তোলনরত দেখি? নামাযে তোমরা স্থিরতা অবলম্বন করো।

সহীহ মুসলিমের এ হাদীস থেকে রাফউল ইয়াদাইন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি দু'ভাবে প্রমাণিত হয়। এক: নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাগান্বিত হওয়া হাদীসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। দুই: নামাযে স্থির থাকার নির্দেশ প্রদান। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করাটা নামাযের স্থিরতা পরিপন্থী। কুরআনেও নামাযের মধ্যে স্থিরতা অবলম্বনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নামাযীদের লক্ষ্য করে বলেন:

وقوموا لله قانتين. (৩)

অর্থাৎ আর আল্লাহর সামনে একান্ত আনুগত্য ও আদবের সহিত দণ্ডায়মান হও।

২ সহীহ মুসলিম : ১/১৮১ হাদীস নং ৪৩০ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

৩ সূরা বাকারা : আয়াত নং ২৩৮

বিবেকবান লোকদের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, মহান কোনো ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বার সামনে খুব বেশী নড়াচড়া না করে স্থির ও চুপ থাকাটাই তাঁর প্রতি আনুগত্য ও আদবের বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া নামাযে বারবার রাফউল ইয়াদাইন করাটা অন্যান্য সাধারণ নড়াচড়ার চেয়ে একটু বেশীই আদব পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়। মোটকথা মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসের স্পষ্টপ্রায় ভাষ্য এবং পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের সারমর্ম থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নামাযে বারবার রাফউল ইয়াদাইন করাটা স্থিরতা পরিপন্থি হওয়ার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও পছন্দ ছিলো না। রাফউল ইয়াদাইন একবার শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় করা সুন্নাত, এর বেশী নয়। নামাযে আল্লাহর সামনে খুবই আদব ও আনুগত্যের সহিত দাঁড়াবে এবং যথাসম্ভব ধীরস্থির থাকবে।

বি. দ্র.: এখানে একটি সংশয়ের নিরসন ও বিষয়টির অবতারণা না করলেই নয়। বিষয়টি হলো, মুসলিম শরীফের উপরোক্ত হাদীসের পরে আরো একটি হাদীসের উল্লেখ আছে। বাহ্যিকভাবে চিন্তা করলে দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা বলে ভ্রম হয় এবং রাফউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে প্রথম হাদীসটির প্রামাণ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত হয়। তাই এর নিরসন অত্যাৱশ্যকীয়।

প্রথমত আমরা উক্ত দ্বিতীয় হাদীসটি উল্লেখ করছি:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقُبَيْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ تُؤْمِنُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. (১)

অর্থাৎ জাবের বিন সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত নামায পড়তাম তখন (সালাম ফিরানোর সময়) বলতাম, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম এবং তিনি (অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) স্বীয় হাত দ্বারা (ডান-বাম) দু'দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। এরপর (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হাতের ইশারায় সালাম ফিরানোর বিষয়টি বুঝতে পেরে) বললেন, তোমরা স্বীয় হাত দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করো? যেনো তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজ! তোমাদের জন্য শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট যে, স্বীয় হাত নিজ রানের উপর রাখবে এরপর নিজের ডানদিকের ও বামদিকের (মুসলিম) ভাইদের দিকে লক্ষ্য করে সালাম ফিরাবে।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কারো কারো ধারণা, এটা প্রথম হাদীসের জন্য তাফসীর ও ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, উভয় হাদীসে হাত উঠানোকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের সহিত তুলনা করা হয়েছে। তবে প্রথম হাদীসে হাত কোন সময় উঠানো হতো তার কোনো উল্লেখ নেই আর দ্বিতীয় হাদীসে তা সালাম ফিরানোর সময় করা হতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথমটার জন্য ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস। উভয় হাদীসের সমষ্টিতে বুঝা যায়, নামাযে শুধুমাত্র সালামের সময় রাফউল ইয়াদাইন নিষিদ্ধ, অন্যান্য সময় করার ব্যাপারে হাদীসটি নিরব।

আমরা বলি, এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত। কারণ, উপরোক্ত হাদীস দু'টির সনদ তথা বর্ণনাসূত্র ভিন্ন হওয়া ছাড়াও আরো অনেকগুলো কারণে তা আলাদা আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ দু'টি হাদীসের মর্যাদা রাখে। যার একটি অপরটির ব্যাখ্যা কিছুতেই হতে পারে না। কারণগুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি:

এক: প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযীদেরকে রাফউল ইয়াদাইন করা দেখে প্রচ্ছন্নভাবে রাগ প্রকাশ করে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা নামাযে স্থির থাকো'। দ্বিতীয় হাদীসে যেহেতু সালাম ফিরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা নিষেধ করা হয়েছে তাই স্থির থাকার নির্দেশটি দ্বিতীয় হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, কেউ সালাম ফিরানোর সময় হাত উঠালে তাকে 'নামাযে স্থির থাকো' বলে নির্দেশ দেয়া হয় না। যেহেতু সে তো সালামের মাধ্যমে নামায থেকে ফারেগই হয়ে যাবে, তাকে আবার নামাযে স্থির

থাকার নির্দেশ দেয়া হয় কিভাবে? হ্যাঁ, এ নির্দেশ তার জন্যই প্রযোজ্য হয়, যে নামাযের ভিতরে যথা রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ও পরে কিংবা সিজদায় যাওয়ার আগে বা পরে রাফউল ইয়াদাইন করে। তাকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত যে, 'নামাযে স্থির থাকো'। কিন্তু যে ব্যক্তি সালামের সময় হাত উঠায় তাকে একথা বলা কিছুতেই যুক্তসঙ্গত থেকে পারে না। তাকে বরং এরকম করা থেকে নিষেধ করে সঠিক পদ্ধতিতে সালাম ফিরানোর নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাই করেছিলেন। এজন্য নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীস থেকে ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি ঘটনা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে।

দুই: প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁর কতিপয় সাহাবীকে নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছিলেন। এতে বুঝা যায় তিনি তাদের সাথে নামাযে শরীক ছিলেন না। সম্ভবত তাঁরা একাকী নফল বা সুন্নাত নামায পড়ছিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জামাতে নামায পড়ছিলেন। অর্থাৎ এ হাদীসের বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম ছিলেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পিছনে ইক্তিদা করছিলেন এবং তাঁরা সালাম ফিরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন। তাহলে দু'টি হাদীস এক হয় কী করে?

তিন: প্রথম হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় বিশেষ একটি ঘটনায় কতিপয় সাহাবীই শুধু নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করেছিলেন। অর্থাৎ ঐসকল সাহাবী, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নফল বা সুন্নাত পড়ছিলেন। আর দ্বিতীয় হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালামের সময় রাফউল ইয়াদাইন করাটা সবার কাজ ছিলো। যেহেতু তখন সবাই জামাতে শরীক ছিলেন।

চার: দ্বিতীয় হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, এখানে তাঁদের হাতের ইশারাটা সালামের সময় মুসাফাহা তথা করমর্দনকারীর হাত উঠানোর মতো ছিল। আর এটা প্রথম হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, প্রথম হাদীসে সবাই নামায একাকী পড়ছিলো বিধায় এখানে একজন অপরজনের প্রতি হাত দিয়ে ইশারা করার অবকাশই নেই।

পাঁচ: প্রথম হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন তথা নামাযে দু'হাত উত্তোলনের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এরপর তা আম (ব্যাপক অর্থবোধক) একটি শব্দ তথা 'নামাযে স্থির থাকো' বলে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসে রাফউল ইয়াদাইনের কথা বলাই হয়নি; বরং তথায় 'হাত দিয়ে ইশারার কথা' বলা হয়েছে এবং এরপর তা নিষেধ করে এমন এক পদ্ধতি শিখানো হয়েছে, যা শুধু সালাম ফিরানোর সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।^(১)

সুতরাং এতোগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার পরও যদি দু'টি হাদীসকে এক ভেবে দ্বিতীয় হাদীসকে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা দাবি করা হয় তাহলে এর চেয়ে হঠকারিতা এবং বে-ইনসাফী আর কী হতে পারে? মোটকথা, এখানে ঘটনা দু'টি আলাদা এবং ভিন্ন সময়ের। উভয় ঘটনার সাক্ষী হযরত জাবের বিন সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু একজন হলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি দুই ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী।^(২) তাই উভয় ঘটনা তাঁর থেকে বর্ণিত হওয়ায় তা একই ঘটনা বলে ভ্রম হওয়ার সংশয়টা সম্পূর্ণই অমূলক। এতে মূলত আশ্চর্যের কিছু নেই।

এছাড়াও আমরা যদি এ কথা মেনেও নেই যে, প্রথম হাদীসে সালাম ফিরানোর সময়ই হাতের মাধ্যমে ইশারা বা হাত উঠানোকে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে (তথা দালালাতুন নস হিসেবে) আমাদের দাবিটি আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, সালাম হলো নামাযের শেষাংশ, যার মাধ্যমে মানুষ নামায থেকে বের হয়ে যায়। এক কথায় সালাম হলো একটি দরজা, যার এ পিঠ নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট আর অপর পিঠ নামাযের বাহিরের সাথে সম্পর্কিত। শরীয়ত যখন সালামের মতো একটি দু'মুখী বিধান পালনকালে হাত দিয়ে কোনো প্রকারের ইশারা ইঙ্গিত করতে নিষিদ্ধ করেছে তখন নামাযের ভিতরের বিধান (যা দু'মুখী নয়, বরং সম্পূর্ণই নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট) যথা রুকু, সিজদা ইত্যাদি পালনকালে হাত দ্বারা কোনো ধরনের ইশারা, ইঙ্গিত বা বারবার তা উত্তোলন করাকে অবশ্যই আরো কঠোরভাবে নিষেধ করবে। এজন্যই হাদীসের শেষাংশে *أسكنوا في الصلاة* (নামাযে স্থির

১ এ পাঁচটি কারণসহ বিস্তারিত দেখুন- নাসবুর রায়া (তালীক): ১/৩৯৩-৩৯৪ শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

২ প্রাপ্ত

থাকো) বলে এদিকে প্রায় স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযের মধ্যে ছিন্ন থাকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামাযে একাধিকবার রাফউল ইয়াদাইন করাটা এ নির্দেশের সরাসরি পরিপন্থী। তবে তাকবীরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন করাটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এতে উক্ত হাদীসের বিরোধিতা হবে না। কেননা, হাদীসে নামাযের ভিতরে ছিন্ন থাকার কথা বলা হয়েছে অথচ তাকবীরে তাহরিমা নামাযের আভ্যন্তরীণ কোনো বিধান নয়, বিশেষত হানাফীদের নিকটে। তাই এখানে রাফউল ইয়াদাইন করলে উক্ত হাদীসে ছিন্নতা থাকা নির্দেশের পরিপন্থী কিছু হবে না। তথাপি তাকবীরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা মতানৈক্য ছাড়া ঐক্যমত সমর্থিত একটি বিষয়। সুতরাং সবধরনের নিষেধের বিধান থেকে এটা মুক্ত ও উদ্ধৃত।^(১)

মোটকথা, যেভাবেই বলা হোক না কেনো, সহীহ মুসলিমের উক্ত হাদীসটি রাফউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে একটু চতুর্মুখী স্পষ্ট প্রমাণ এবং সব দৃষ্টিকোণ থেকেই তা কার্যকর।

২ নং হাদীস :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.^(২)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায পড়ে দেখাবো না? রাবী (আলকামা রহ.) বলেন, এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং (তাকবীরে তাহরিমার সময়) একবার ছাড়া আর দু'হাত উঠালেন না।

নির্ভরযোগ্য ইমামরা সবাই এ হাদীসটিকে সহীহ ও প্রমাণযোগ্য বলেছেন।

ইমাম ইবনে হযম রহ. বলেন:

১ ইলাউস সুনান : ৩/৫৬-৫৭ হা. নং ৮১২ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

২ মুসনাদে আহমাদ : ৬/২০৩ হাদীস নং ৩৬৮১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

ان هذا الخبر صحيح. (৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ হাদীসটি সহীহ।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন:

واسناده صحيح. (৪)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وهو حديث صحيح. (৫)

অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীস।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত রহ. বলেন

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كلب، فمن رجال مسلم. (৬)

অর্থাৎ এর রাবীগণ সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। সবাই বুখারী, মুসলিমের বর্ণনাকারী শুধুমাত্র আসেম বিন কুলাইব ছাড়া। তিনি হলেন সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী (বুখারীর নয়)।

ইমাম ইবনুল কাত্তান রহ. বলেন;

وهو عندى صحيح. (৭)

অর্থাৎ এটা আমার নিকটে সহীহ হাদীস।

মোটকথা এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অনেকে অবশ্য এখানে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এর একটি উক্তি দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালান।

তিনি বলেন:

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. (৮)

৩ আল মুহাল্লা : ৪/৮৮ মাসআলা নং ৪৪২ (ইদারাতুত তাবাতিল মুনীরিয়া, কায়রো)

৪ ইলালু দারা কুতনী : ৫/১৭২ প্রশ্ন নং ৮০৪ (দারু তাইবা, রিয়াদ)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৫২ হাদীস নং ৪০২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ মুসনাদে আহমাদ : ৬/২০৩ হাদীস নং ৩৬৮১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৭ আদিরায়্যা : ১/১৫০ হাদীস নং ১৮১ সংশ্লিষ্ট (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

৮ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৬৩ হাদীস নং ২৫৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযে) প্রথমবার ছাড়া আর দু'হাত উঠাননি' এটা (মুহাদ্দিসীন কিরামের নিকট বিশুদ্ধ সূত্রে) প্রমাণিত নয়।

মূলত এখানে বিভ্রান্তির কিছু নেই। কেননা, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে রাফউল ইয়াদাইনের ব্যাপারে দু'ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক: ফেলী (কর্মসূচক) হাদীস, অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো করে নামায পড়ে দেখান। দুই: কওলী (উক্তিমূলক) হাদীস, অর্থাৎ তিনি নিজে নামায পড়ে দেখাননি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে নামায পড়তেন তা মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় বলেছেন, প্রথম হাদীসটিকে নয়। তার উক্তিটি দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

এজন্যই ইমাম তিরমিযী রহ. প্রথমে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এর উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি **بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ^(১)** ('রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে প্রথমবার ছাড়া আর দু'হাত উঠাননি'-সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসমূহের অধ্যায়) বলে আলাদা একটি শিরোনাম এনেছেন এবং এখানে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ফেলী হাদীস (যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের স্বরূপ নিজে পড়ে দেখান) উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটিকে হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত) বলে অভিহিত করেছেন।

এতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ফেলী হাদীসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি, যাকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান ও অন্যান্যরা সহীহ বলেছেন।

স্মর্তব্য যে, উপরোল্লিখিত ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসটি বাহ্যতঃ মাওকুফ (সাহাবীর হাদীস) মনে হলেও বাস্তবে তা মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস)। কেননা, তিনি স্বীয়

নামাযকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের দিকে সম্বোধিত করেছেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

ولا يخفى أن الحديث بالوجه الأول أيضاً مرفوع ولو حكماً. فإن قول الصحابي "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" في حكم الرفع كما ثبت في الأصول. (২)

অর্থাৎ এটা অস্পষ্ট নয় যে, হাদীসটি প্রথম দৃষ্টিকোণ (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ফেলী হাদীসটির দৃষ্টিকোণ) থেকেও মারফু। যদিও তা হুকমীভাবে তথা কার্যতভাবেই হোক না কেনো। কেননা, সাহাবীর উক্তি 'আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায পড়ে দেখাবো না?' কথাটি মারফু হাদীসের অন্তর্ভুক্ত- যেমনটি হাদীসের মূলনীতি অনুসারে প্রমাণিত।

৩ নং হাদীস :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ حَدَّثَنَا سَالِمُ الْبَرَّادُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَأَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ وَجَأَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا. (৩)

অর্থাৎ সালেম বাররাদ রহ. বলেন, (একবার) আমরা আবু মাসউদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট প্রবেশ করলাম। এরপর আমরা

২ ইলাউস সুনান : ৩/৫৮ হাদীস নং ৮১৩ (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

৩ মুসনাদে আহমাদ : ৩৭/৪৩ হাদীস নং ২২৩৫৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তাকে নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নামায পড়ে দেখাবো না, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন? রাবী বলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং স্বীয় দু'হাত উঠালেন। এরপর রুকু করলেন এবং হাতের দু'তালুকে স্বীয় দুই হাঁটুর উপর রাখলেন এবং বগলদ্বয়ের মাঝে ফাঁক রাখলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (রুকু থেকে উঠে) দাঁড়ালেন; এমনকি তাঁর সবকিছু স্থির হলো। এরপর সিজদা করলেন এবং স্বীয় দু'হাতের তালু (মাটিতে) রাখলেন এবং বগলদ্বয়ের মাঝে ফাঁক রাখলেন। এরপর (সিজদা থেকে) স্বীয় মাথা উঠালেন; এমনকি তাঁর সবকিছু স্থির হয়ে গেলো। এরপর এভাবেই চার রাকআত নামায পড়লেন।

এ হাদীসটির সনদ হাসান তথা প্রমাণযোগ্য।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের তালীকে বলেন:

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب. وباقي رجال الإسناد ثقات

رجال الشيخين. (১)

অর্থাৎ আতা বিন সায়েব (নামক রাবী) থাকায় এর সনদ হাসান। এছাড়া সনদের বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য ও বুখারী মুসলিমের রাবী।

এ হাদীসটিতে বিখ্যাত সাহাবী আবু মাসউদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায বর্ণনা করে দেখান। এতে দেখা গেলো, তিনি শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমার সময়ই রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করেছেন। এরপর আর তিনি রাফউল ইয়াদাইন করেননি। বুঝা গেলো, এটাই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায, যাতে শুধু একবারই রাফউল ইয়াদাইন করা হয়।

৪ নং হাদীস

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَلَا

أَخْبِرْكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ
مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ. (২)

অর্থাৎ আলকামা সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায সম্বন্ধে খবর দিবো না? রাবী বলেন, এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। অতঃপর প্রথমবার (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়) দু'হাত উঠালেন। এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করলেন না।

ইমাম নাসায়ী রহ. হাদীসটি স্বীয় সুনানে বর্ণনা করে কোনো ধরনের মন্তব্য করেননি। এতে বুঝা যায়, তাঁর নিকট এ হাদীসটিতে সনদগত কোনো সমস্যা নেই।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আত তা'লীকুল হাসানে বলেন:

هذا إسناد صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা একটি সহীহ সনদ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

رجاله رجال الصحيحين غير سويد وهو ثقة. وإلا عاصم فهو من رجال

مسلم ثقة. (৪)

অর্থাৎ এর সব রাবী বুখারী, মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র সুইয়াইদ (নামক রাবী) ছাড়া। অবশ্য তিনিও সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবী। আর আসেম (নামক রাবীটি) শুধু মুসলিমের রাবী (বুখারীর নয়)। তিনিও নির্ভরযোগ্য।

শাইখ আলবানী রহ.ও এ হাদীসটির ব্যাপারে صحيح (৫) তথা বিশুদ্ধ হাদীস বলে অভিমত পেশ করেছেন।

৫ নং হাদীস:

২ সুনানে নাসায়ী : পৃ. নং ১২৫ হাদীস নং ১০২৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৩ আত তা'লীকুল হাসান মাআ আসারিস সুনান : পৃ. নং ১৫৩ হা. নং ৪০২ সংশ্লিষ্ট (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ ইলাউস সুনান : ৩/৬১ হাদীস নং ৮১৪ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৫ সহীহ নাসায়ী (আলবানী) : ১/৩৩৪ হাদীস নং ১০২৫ (মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু প্রথম তাকবীরে স্বীয় দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

ابن أبي داود ثقة. وقد صحح الطحاوى حديثه... ونعيم بن حماد من رجال الصحيحين وبقية رجال السندين من رجال الصحيح إلا عاصمًا فهو من رجال مسلم. (২)

অর্থাৎ ইবনে আবী দাউদ সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবী, যার হাদীসকে ইমাম তাহাবী রহ. সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। আর নুআঈম বিন হাম্মাদ হলেন বুখারী, মুসলিমের রাবী। সনদের বাকী রাবীগুলো সহীহ বুখারীর রাবীদের অন্তর্ভুক্ত শুধু আসেম ব্যতীত। তিনি হলেন সহীহ মুসলিমের রাবী।

এছাড়া তিনি হাদীসটি সহীহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন এবং এ হাদীসের উপর ইবনে মুবারক রহ. কর্তৃক অভিযোগ খণ্ডন করতঃ বলেছেন:

وقد عرفت أن الطريقة الأولى ايضًا صحيحة فإن رواها كلهم ثقات. فلا يلزم من عدم ثبوتها عند ابن المبارك عدم ثبوتها مطلقًا. وقد فرغنا من الكلام في هذا المقام أول الباب. (৩)

১ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৪ হাদীস নং ১৩৪৯ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

২ ইলাউস সুনান : ৩/৭১-৭২ হাদীস নং ৮২২ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৩ প্রাগুক্ত

অর্থাৎ আর তুমি এ কথা জেনেছো যে, (ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কওলী ও ফেলী হাদীসদ্বয় থেকে) প্রথমটি অর্থাৎ কওলী মারফু হাদীসটিও সহীহ। কেননা, এর সব রাবীই সিকা। সুতরাং ইবনে মুবারক রহ. এর নিকট তা প্রমাণিত না হওয়ায় এটার প্রামাণ্যতা একেবারেই না হওয়া আবশ্যিক নয়। এ ব্যাপারে আমরা অধ্যায়টির শুরুতে আলোচনা শেষ করে এসেছি।

৬নং হাদীস:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ
عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ
يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ. (৪)

অর্থাৎ বারা বিন আযেব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমি নামায শুরু করার সময় (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়) দু'হাত উঠাতে দেখেছি। এরপর আর তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত দু'হাত উঠাননি।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هذا الحديث ليس بصحيح. (৫)

অর্থাৎ এ হাদীসটি সহীহ নয়।

আমরাও বলি, এটি সহীহ নয়, তবে অবশ্যই তা হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত) তথা প্রমাণযোগ্য হাদীস হবে। কেননা, হাদীসের স্তরসমূহের মধ্য থেকে প্রথম অবস্থান সহীহ হাদীসের। এরপর হাসান হাদীসের। এরপর যঈফ হাদীসের। আহকাম তথা বিধি-বিধানের জন্য প্রথম দু'প্রকার হাদীস ফুকাহা ও মুহাদিসীনের কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। আর তৃতীয় প্রকারটি ফযীলত সংক্রান্ত ও উৎসাহমূলক আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়।

৪ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১০২ হাদীস নং ৭৫২ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)
৫ প্রাগুক্ত

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, কোনো হাদীস সহীহ না হলেই তা বাতিল ও পরিত্যাজ্য হয় না; বরং তা হাসান বলে প্রমাণিত হলে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে।

সুতরাং আমরা বলবো যে, মূলত এ হাদীসটিকে সহীহ না বলার পিছনে কারণ হলো এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আ. রহমান বিন আবী লায়লা নামক একজন রাবী আছে, যে বিতর্কিত রাবী। তবে সে কিছুটা বিতর্কিত হলেও মুসলিম শরীফের রাবী ইয়াযিদ বিন আবী যিয়াদ থেকে নিম্নস্তরের নয়; বরং তার সমমানের।^(১) অনেক ইমাম তার প্রশংসা করেছেন।

ইমাম ইজলী রহ. বলেন:

كان فقيهاً صاحب سنة صدوقاً جازئ الحديث.^(২)

অর্থাৎ তিনি একাধারে ফকীহ, সুন্নাহর অনুসারী, সত্যবাদী ও হাদীস বর্ণনার উপযোগী ছিলেন।

ইমাম ইয়াকুব বিন সুফইয়ান রহ. বলেন:

ثقة عدل في حديثه بعض المقال.^(৩)

অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত রাবী। অবশ্য তার হাদীসে কিছুটা বিতর্ক আছে।
ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেন:

محله الصدق كان سيئ الحفظ.^(৪)

অর্থাৎ তাঁর অবস্থান সততা ও সত্যবাদিতার। তবে সে কিছুটা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলো।

ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. বলেন:

ليس بالحافظ وإن كان فقيهاً عالماً.^(৫)

অর্থাৎ তিনি হাফেযে হাদীস না হলেও ফকীহ ও আলেম ছিলেন।

১ ইলাউস সুনান : ৩/৮৬ হা. নং ৮২৮ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

২ তাহযীবুত তাহযীব : ৩/৬২৮ জীবনী নং ৭১৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত

৫ প্রাগুক্ত

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল ছিলো বটে, কিন্তু সে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ছিলো। আর হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে বিশ্বস্ত রাবীর স্মরণশক্তি একটু কম হলে তার বর্ণিত হাদীসটি হাসান বলে বিবেচিত হয়, যা প্রমাণযোগ্য ও আমলযোগ্য। দেখুন: নুযহাতুননযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার: পৃ. নং ৬৫ তাহকীক- নূরুদ্দীন ইতর, হালব ও দামেশক।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী রহ. স্বীয় সুনানে তিরমিযীতে মুহাম্মাদ বিন আ. রহমান বিন আবী লায়লা কর্তৃক বর্ণিত একাধিক হাদীসকে হাসান বলে অভিমত পেশ করেছেন। এজন্যই আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এ হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ রহ. এর মন্তব্য (হাদীসটি সহীহ নয় কথাটি) বর্ণনা করে বলেন:

قلت: نعم، ولكنه حسنٌ كما سنذكره في الحاشية. (৬)

অর্থাৎ আমি বলি হ্যাঁ (হাদীসটি সহীহ নয় ঠিক আছে) কিন্তু তা হাসান হবে। যা কিছুক্ষণ পরেই আমরা হাশিয়াতে (বিস্তারিতভাবে) উল্লেখ করছি।

এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা ও পয়েন্ট রয়েছে, যা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করছি না। বিস্তারিত দেখতে চাইলে দেখুন- ইলাউস সুনান: ৩/৮৫ হা. নং ৮২৮ সংশ্লিষ্ট হাশিয়া (ইদারাতুল কুরআন কর্তৃক প্রকাশিত)

৭ নং হাদীস :

قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ. (৭)

৬ ইলাউস সুনান : ৩/৮৫ হাদীস নং ৮২৮ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৭ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/১১৩-১১৪ হাদীস নং ২৫৩৪ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ও উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়ই দু'হাত উঠাতেন (অন্য সময়ে নয়।)

এ হাদীসটির সনদ প্রমাণযোগ্য।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. বলেন:

هذا شاهد جيد. (১)

অর্থাৎ (অন্য হাদীস শক্তিশালী করতে) এটা একটি উত্তম ও ভালো সনদের প্রামাণিক হাদীস।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.ও স্বীয় ইলাউস সুনানে (৩/৬৮, হা. নং ৮২১) আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. এর উক্ত মন্তব্য সমর্থন করে এর সনদকে ভালো সনদ বলে অভিমত পেশ করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি হাসান বলে পরিগণিত হবে, যা মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কিরামের নিকট প্রমাণযোগ্য একটি দলিল।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা একাধিক সাহাবী থেকে সহীহ ও প্রমাণযোগ্য সনদে এ বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমার সময় একবারই দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর রাফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) করতেন না।

এ পর্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় বড় বিখ্যাত কতিপয় সাহাবা ও তাবেরীনের আমল ও ফাতওয়া উল্লেখ করবো, যাঁরা নামাযে তাকবীরে তাহরিমার সময় শুধু একবারই রাফউল ইয়াদাইনের প্রবক্তা ছিলেন। পরিভাষাগতভাবে এদের আমল ও ফতোয়াকে মাওকুফ/মাকতূ হাদীস বা আসর বলে, যার দ্বারা মূলত মারফূ হাদীসের প্রামাণ্যতা আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়।

১ নং আসর:

১ আল জাওহারুননাকী মাআল বাইহাকী : ২/৭৮ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিযামিয়া, হায়দারাবাদ)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ. قَالَ: وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. (২)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. বলেন, আমি উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে দেখেছি যে, তিনি শুধু প্রথম তাকবীরে দু'হাত উঠাতেন এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না। রাবী (যুবাইর বিন আদী) বলেন, এছাড়া আমি ইবরাহীম নাখয়ী রহ. ও শাবী রহ.-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

এ মাওকুফ হাদীসটি সহীহ। ইমাম তাহাবী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন:

وهو حديث صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীস।

আল্লামা তুরকুমানী রহ. ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. থেকে এ আসরটি উপরোক্ত সনদে উল্লেখ করে বলেন:

هذا السند أيضًا صحيح على شرط مسلم. (৪)

অর্থাৎ এ সনদটিও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. স্বীয় আদ দিরায়াতে ইমাম তাহাবীর উদ্ধৃতিতে উক্ত আসরটি উল্লেখ করে বলেন:

وهذا رجاله ثقات. (৫)

অর্থাৎ এর সবগুলো রাবীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

২ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৭ হাদীস নং ১৩৬৪ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৩ প্রাপ্ত

৪ আল জাওহারুল্লাকী মাআল বাইহাকী : ২/৭৫ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ)

৫ আদিরয়া : ১/১৫২ হাদীস নং ১৮২ সংশ্লিষ্ট (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

আল্লামা নিমবী রহ. আসারুস সুনানে ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. ও তাহাবী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে আসরটি উল্লেখ করে বলেন:

وهو أثر صحيح. (১)

অর্থাৎ এটা বিশুদ্ধ একটি আসর।

২ নং আসর:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَطَافٍ النَّهْشَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ. (২)

অর্থাৎ আসেম বিন কুলাইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন (শুধুমাত্র) তখন দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না।

হাফেয যাইলায়ী রহ. বলেন:

وهو أثر صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত একটি আসর।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

ورجاله ثقات وهو موقوف. (৪)

অর্থাৎ এর সব রাবী সিকা তথা নির্ভরযোগ্য এবং এটা মাওকূফ হাদীস।

হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন:

وإسناد حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم. (৫)

অর্থাৎ আসেম বিন কুলাইবের হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

১ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৫৫ হাদীস নং ৪০৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৬ হাদীস নং ২৪৫৭ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৩ নাসবুর বায়া : ১/৪০৬ হাদীস নং ১৭২৭ শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত-
(মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

৪ আদিরায়ী : ১/১৫২ হাদীস নং ১৮১ সংশ্লিষ্ট (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

৫ উমদাতুল কারী : ৫/৪০০ হাদীস নং ৭৩৫/১২৩ সংশ্লিষ্ট (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৬)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

৩ নং আসর:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ
يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ. (৭)

অর্থাৎ মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর পিছনে নামায পড়লাম। তখন তিনি নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কোথাও দু'হাত উঠালেন না।

হাফেয আইনী রহ. উমদাতুল কারীতে বলেন:

رواه الطحاوى بإسناد صحيح. (৮)

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী রহ. সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وسنده صحيح. (৯)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.ও ইলাউস সুনানে এর সমর্থন করে বলেন:

وسنده صحيح. (১০)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. বলেন:

৬ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৫৬ হাদীস নং ৪০৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৫ হাদীস নং ১৩৫৭ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৮ উমদাতুল কারী : ৫/৩৯৯ হাদীস নং ৭৩৫/১২৩ সংশ্লিষ্ট (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৯ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৫৭ হাদীস নং ৪০৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

১০ ইলাউস সুনান : ৩/৬৪ হাদীস নং ৮১৮ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

وهذا سند صحيح. (১)

অর্থাৎ এটা একটি সহীহ সনদ।

৪ নং আসর:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِي ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا. (২)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি (শুধু) প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরিমার সময় দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর উঠাতেন না।

হাফেয ইবনে তুরকুমানী রহ. বলেন:

وهذا سند صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা একটি বিশুদ্ধ সনদ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده مرسل جيد. (৪)

অর্থাৎ এর সনদটি ভালো একটি মুরসাল।

উল্লেখ্য যে, মুরসাল হাদীস অধিকাংশ মুহাক্কিক উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট দলীল ও প্রমাণযোগ্য হাদীস বলে বিবেচিত হলেও একটি দলের নিকট তা দলীলের উপযুক্ত নয়। তবে ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর বর্ণিত মুরসাল যদি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস সংক্রান্ত হয় তাহলে তা বিশুদ্ধ ও প্রমাণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে গিয়ে ইমাম তাহাবী রহ. বলেন:

১ আল জাওহারুল্লাকী মাআল বাইহাকী: ২/৭৪ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৬ হাদীস নং ২৪৫৬ (দারুল কিবলা, জেদা)

৩ আল জাওহারুল্লাকী মাআল বাইহাকী : ২/৭৯ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ)

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৫৮ হাদীস নং ৪০৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

فَإِنْ قَالُوا مَا ذَكَّرْتُمُوهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ. قِيلَ لَهُمْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا أُرْسِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُرْسِلْهُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ وَتَوَاتُرِ الرَّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَدْ قَالَ لَهُ الْأَعْمَشُ: إِذَا حَدَّثَنِي فَأَسْنِدْ. فَقَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِيهِ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِذَا قُلْتُ حَدَّثَنِي فَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبٌ أَوْ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ شَكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَلِكَ. (৫)

অর্থাৎ যদি আমাদের বিরোধী পক্ষ অভিযোগ করে যে, তোমরা ইবরাহীম নাখয়ী রহ. সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছো তা সূত্রবিচ্ছিন্ন। (কেননা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর সরাসরি কোনো হাদীস বর্ণনা নেই এবং তাঁদের মাঝে পারম্পারিক সাক্ষাতও হয়নি।) তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে যে, ইবরাহীম নাখয়ী রহ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যখন মুরসাল হিসেবে হাদীস বর্ণনা করেন তখন (বুঝতে হবে) তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে উক্ত বর্ণনা তাঁর নিকটে পারম্পারিক সনদে সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ হওয়ার পরই মুরসাল হিসেবে তা বর্ণনা করেছেন। (ঘটনা হলো- একবার) ইমাম আমাশ রহ. তাকে বললেন, যখন আপনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করবেন তখন তার সনদ উল্লেখ করবেন। তখন তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে বলবো ‘আব্দুল্লাহ বলেছেন’ তখন (বুঝবে) আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তা বলি না যতোক্ষণ না তা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আমার নিকট বড় একটি (মুহাদ্দিসীন ও ইমামদের) দল বর্ণনা করে। আর যখন আমি বলবো, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আমার নিকট অমুক বর্ণনা করেছে তখন শুধু সে ব্যক্তিই আমার নিকট তা বর্ণনা করেছে (অন্যরা নয়)। এরপর ইমাম তাহাবী রহ. উপরোক্ত ঘটনাটির সনদ উল্লেখ করেছেন, যা ইমাম আমাশ রহ. পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

৫ নং আসর:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِجَرَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبَا إِسْحَاقَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ. (১)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে নামায পড়লাম। তখন (দেখলাম) তিনি একমাত্র নামাযের শুরু সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় দু'হাত তুললেন না। রাবী আ. মালেক বলেন, আমি (বিখ্যাত তিন তাবেয়ী) ইমাম শাবী রহ., ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী রহ. ও ইমাম আবু ইসহাক রহ.-কে দেখেছি যে, তারা নামাযের শুরুসময় তথা তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় দু'হাত তুলতেন না।

আল্লামা ইবনে তুরকমানী রহ. বলেন:

وهذا السند ايضاً صحيح على شرط مسلم. (২)

অর্থাৎ এ সনদটিও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

ইমাম তাহাবী রহ. বলেন:

وهو حديث صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা সহীহ একটি হাদীস।

অবশ্য তাহাবী শরীফে ইমাম আবু ইসহাকের কথা উল্লেখ নেই।

৬ নং আসর:

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي جَمْعٍ وَعِنْدَ الْجِمَارِ. (৪)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৭-৪১৮ হাদীস নং ২৪৬৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ আল জাওহারুল্লাকী মাআল বাইহাকী : ২/৭৫ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিযামিয়া, হায়দারাবাদ)

৩ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৭ হাদীস নং ১৩৬৪ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৭ হাদীস নং ২৪৬৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি স্থানে হাত উঠাতে হয়। এক: যখন নামাযে দাঁড়াবে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরিমার সময়। দুই: যখন বাইতুল্লাহ শরীফ দেখবে। তিন: সাফা পাহাড়ের উপর। চার: মারওয়া পাহাড়ের উপর অর্থাৎ সাইকালীন সময়ে। পাঁচ: আরাফার ময়দানে। ছয়: মুযদালিফায়। সাত: কংকর নিষ্ক্ষেপের সময়।

এ বর্ণনাটির সবগুলো রাবীই সিকা। সুতরাং এ আসরটির সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হ্যাঁ, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হওয়া নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বাণী তথা মাওকুফ হাদীস হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এ কারণেই এটা মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস না হওয়ার প্রমাণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে দাকীক আল ইদ রহ. বলেন:

وثنانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس^(৫)

অর্থাৎ (এটা মারফু হাদীস না হওয়ার) দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, ইমাম অকী রহ. এর উক্ত হাদীসটি ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মাওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা।

অর্থাৎ সহীহ সূত্রে যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে, উক্ত কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়; বরং ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বাণী বিধায় তা মারফু হাদীস বলে দাবি করাটা ভুল। সুতরাং বুঝা গেলো যে, উপরোক্ত হাদীসটি মারফু হওয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মাওকুফ হওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ আসর থেকে প্রমাণ মেলে যে, নামাযে শুধু একবারই দু'হাত উঠানোর নিয়ম রয়েছে। আর তা হলো নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়। তাই নামাযে অন্যান্য সময়ে দু'হাত উঠানো সুনাত বলে বিবেচিত হবে না।

৫ নাসবুর রায়া : ১/৩৯১, হাদীস নং ১৬৮৮ শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত-
(মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

৭ নং আসর:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. قَالَ وَكِيعٌ: ثُمَّ لَا يَعُودُونَ. (১)

অর্থাৎ আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সঙ্গীসাথী ও শাগরিদগণ নামাযের সূচনালগ্ন ছাড়া অন্য কোনো সময় দু'হাত উঠাতেন না। ইমাম অকী রহ. (এ বাক্যটি অতিরিক্ত) বলেন, এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. বলেন:

وهذا أيضًا سنده صحيح جلي. ففي اتفاق أصحابهما على ذلك ما يدل على أن مذهبهما كان كذلك. (২)

অর্থাৎ এটা একটি সুস্পষ্ট সহীহ সনদ। সুতরাং তাঁদের দু'জনের শাগরিদদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মহান এ দু'সাহাবীর মাযহাব ও মত এরূপই ছিলো।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

৮ নং আসর:

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. (৪)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৬ হাদীস নং ২৪৬১ (দারুল কিবলা, জেদা)

২ আল জাওহারুন নাকী মাআল বাইহাকী : ২/৭৯ (মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিন্ নিযামিয়া, হায়দারাবাদ)

৩ আসারুস সুনান: পৃ. নং ১৫৮ হাদীস নং ৪০৭ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ ইমাম আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. বলেন, আমি কখনো কোনো ফকীহকে এমন করতে দেখিনি যে, প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য সময়ে দু'হাত উঠিয়েছেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

رجاله رجال الصحيح إلا ابن أبي داود وهو ثقة كما مر. (৫)

অর্থাৎ এর সব রাবী বুখারীর রাবী শুধু ইবনে আবী দাউদ ব্যতীত। আর তিনিও সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবী, যা পূর্বে গত হয়েছে।

৯ নং আসর:

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ
وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَرَأَاهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا
رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَذْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هَذَا مِنْهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ! مَا
سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ حِينَ
يُكَبِّرُونَ. (৬)

অর্থাৎ হুসাইন বিন আ. রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার বিন মুররা রহ. (একবার) ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর দরবারে প্রবেশ করলাম। (তখন) আমার রহ. বললেন যে, আলকামা বিন ওয়ায়েল রহ. তাঁর পিতা থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়তে গিয়ে দেখেছেন যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দু'হাত উঠিয়েছেন যখন তাকবীরে তাহরিমা বলেছেন এবং যখন রুকু করেছেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠিয়েছেন। ইবরাহীম নাখয়ী

৪ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৮ হাদীস নং ১৩৬৭ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৫ ইলাউস সুনান: ৩/৭৬ হাদীস নং ৮২৭ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৬ মুআত্তা মুহাম্মাদ : ১/১৩৬-১৪০ হাদীস নং ১০৭ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

রহ. বললেন, আমি বুঝি না তিনি সম্ভবত শুধু ঐ একদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায পড়া দেখে তা ইয়াদ ও আয়ত্ব করে নিলেন অথচ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সফর-হযর সর্বাবস্থার সঙ্গী ও প্রথম যামানার শীর্ষস্থানীয় সাহাবী) ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা তা ইয়াদ রাখতে পারলেন না? এরকম কথা আমি তাদের কারো থেকে শুনিনি। তাঁরা (সাহাবা ও তাবেরীন) নামাযের শুরুতে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলার সময়ই দু'হাত উঠাতেন।

এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। এর সব রাবীই নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে বলেন:

ورجاله ثقات. (১)

অর্থাৎ এর রাবীগণ সবাই সিকা (নির্ভরযোগ্য)।

১০ নং আসর:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا

يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا. (২)

অর্থাৎ ইসমাইল রহ. থেকে বর্ণিত যে, কাইস রহ. নামায শুরু করার প্রারম্ভেই শুধু দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর তা উঠাতেন না।

১১ নং আসর:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ

أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ثُمَّ لَا يَعُودَانِ. (৩)

অর্থাৎ জাবের রহ. থেকে বর্ণিত যে, বিখ্যাত তাবেরীদ্বয় আসওয়াদ রহ. এবং আলকামা রহ. যখন নামায শুরু করতেন তখন দু'হাত উঠাতেন। এরপর আর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না।

১২ নং আসর:

১ ইলাউস সুনান : ৩/৭৩ হাদীস নং ৮২৫ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৭ হাদীস নং ২৪৬৪ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৩ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ২৪৬৮

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ. (৪)

অর্থাৎ তালহা রহ. থেকে ইমাম খাইসামা রহ. ও ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি (তালহা রহ.) বলেন, তাঁরা শুধুমাত্র নামাযের শুরুতেই (তাকবীরে তাহরিমার সময়) দু'হাত উঠাতেন।

উপরোক্ত ১০, ১১ ও ১২ তিনটি আসরের সনদই হাসান প্রমাণযোগ্য।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইলাউস সুনানে বলেন:

فإن في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من التابعين، منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخيثمة وقيس بن أبي حازم والشعبي وأبو إسحاق وغيرهم. روى ذلك كله ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جيدة. (৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, যারা শুধু প্রথম তাকবীর তথা তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠানোর উপরই ক্ষান্ত করতেন, যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। আর তাবেয়ীদের মধ্য থেকে বড় একটি দল এরূপই (মতপোষণ করতেন)। তাদের মধ্যে থেকে অন্যতম হলেন- আসওয়াদ রহ., আলকামা রহ., ইবরাহীম নাখয়ী রহ., খাইসামা রহ., কাইস বিন আবী হাযেম রহ., শাবী রহ., আবু ইসহাক রহ. এবং আরো অনেকে। এসবগুলো বর্ণনা ইমাম ইবনে আবী শাইরা রহ. তাঁর মুসান্নাফে উত্তম ও ভালো সনদে উল্লেখ করেছেন।

মূলত এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়ীদের আরো অনেক আসার আছে, যা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করলাম না। তবে যে বারোটি আসার উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল ও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাঁরা শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময়ই দু'হাত উঠানোর প্রবক্তা

৪ প্রাণ্ডক্ত : ২/৪১৬ হাদীস নং ২৪৬৩

৫ ইলাউস সুনান : ৩/৮৮ হাদীস নং ৮২৯ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

ছিলেন। আর প্রামাণ্য হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট মনে করি। কেননা, পূর্বের হাদীস ও আসারগুলো থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, যেরকমভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় নামাযে তাকবীরে তাহরিমার সময় একবারের বেশী আর হাত তুলতেন না তেমনি তাঁর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা-সহ প্রমুখ সাহাবীগণও তদানুযায়ী আমল বা ফতোয়া প্রদান করেছেন। তদ্রূপ তাবেয়ীদের মধ্য থেকেও অসংখ্য তাবেয়ী-যাদের মধ্যে আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর শাগরিদগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- এ মতের উপরই আমল করেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের এ বিশুদ্ধ বর্ণনা ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীদের আমল ও ফতোয়া দেখেও যার মন ভরে না এবং প্রমাণ হিসেবে এগুলো যার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয় না তাদের জন্য আমাদের আর কিছু বলার নেই। মূলত এ ধরনের লোকদের দুনিয়ার তাবৎ দলীল এনে দিলেও নিজের মনমতো না হলে তা উপেক্ষা করে ফেলে দেয়। আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত দান করুন।

মোটকথা, উপরোক্ত মারফু ও মাওকুফ হাদীসগুলো সহীহ ও হাসান সনদে প্রমাণিত হওয়ার পর এতে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, নামাযে শুধু একবারই হাত উঠানো সূনাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এভাবে নামায পড়েছেন এবং তাঁর পরবর্তী অসংখ্য সাহাবা ও তাবেয়ীনও এভাবেই নামায পড়েছেন এবং তদানুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। তাই এ পদ্ধতিকে সুন্নাহবিরোধী ও ভুল বলা চরম হঠকারিতা ও অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে, যা কোনো আলেমের শানে শোভা পায় না।

বাকী থেকে যায়, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত নামাযে রুকূর আগে পরে রাফউল ইয়াদাইন করা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিষয়টি। এ ব্যাপারে এখন বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তবে সংক্ষিপ্তাকারে এতোটুকু জেনে রাখা দরকার যে, মূলত নামাযের ইতিহাস দেখলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গুরুত্ব দিকে নামাযে অনেক কিছুই বৈধ ছিলো। যেমন কথা বলা, সালাম

দেয়া ও উত্তর দেয়া, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি। ধীরেধীরে পরবর্তীতে এসব রহিত হয়ে গেছে এবং নামাযে স্থির থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে -যেমনটি সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।^(১) নামাযে রাফউল ইয়াদাইনের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই। প্রথম প্রথম অনেক স্থানেই রাফউল ইয়াদাইনের বিধান থাকলেও ধীরেধীরে কমতে কমতে তা একবারে এসে পৌঁছেছে।

আমরা এখানে কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করছি, যা থেকে এ কথার প্রমাণ মেলে যে, রাফউল ইয়াদাইন নামাযের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলো, যার উপর এখন কেউ আমল করে না। এবার বর্ণনাগুলো দেখুন:

কিছু হাদীসে পাওয়া যায়- নামাযের প্রত্যেক উঠাবসায় রাফউল ইয়াদাইন করার নিয়ম ছিলো। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ সনদে মুশকিলুল আসারে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

كَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.^(২)

অর্থাৎ নাফে সূত্রে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি প্রত্যেক উঠা-নামায, রুকু-সিজদায়, দাঁড়াতে ও দু'সিজদার মাঝে বসতে স্বীয় দু'হাত উঠাতেন এবং এ দাবি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় রাফউল ইয়াদাইনের ব্যবহার আরো ব্যাপক ছিলো বুঝা যায়। শাইখ আলবানী রহ. এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে صحيح বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

১ সহীহ মুসলিম শরীফ : ১/১৮১ হা. নং ৪৩০ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ শরহ মুশকিলিল আসার, তাহাবী : ১৫/৪৬ হাদীস নং ৫৮৩১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ
الْمَكْتُوبَةِ. (১)

অর্থাৎ উমাইর বিন হাবীব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের প্রত্যেক তাকবীরেই দু'হাত উঠাতেন।

এ হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণ হয় যে, একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক উঠা-বসায় এবং প্রত্যেক তাকবীরেই দু'হাত উঠাতেন। অথচ এর উপর এখন কেউ আমল করে না।

কোনো কোনো হাদীসে নামাযে তিনবার রাফউল ইয়াদাইনের বর্ণনা এসেছে। যেমন সহীহ বুখারীর ৮৪ নং অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ
مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. (২)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতে তখন স্বীয় দু'হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং রুকূর তাকবীর বলার সময়ও অনুরূপ করতেন এবং রুকূ থেকে যখন উঠতেন তখনও অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করতেন এবং বলতেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। তবে সিজদায় অনুরূপ করতেন না।

১ সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃ. নং ১০২ হাদীস নং ৮৬১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৫৪ হাদীস নং ৭৩৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

কোনো কোনো হাদীসে চারবার রাফউল ইয়াদাইনের কথা পাওয়া যায়।
হাদীসটি হলো:

حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (৩)

অর্থাৎ নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলে স্বীয় দু'হাত উঠাতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং যখন (রুকু থেকে উঠে) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত তুলতেন এবং যখন দু'রাকআত থেকে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত তুলতেন এবং ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এটা মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বলে উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এটা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামা, তিনি আইয়ুব থেকে তিনি নাফে থেকে তিনি ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে।

কোনো কোনো হাদীসে পাঁচবার রাফইল ইয়াদানের কথা এসেছে। যেমন সুনানে নাসায়ীর একটি বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং শাইখ আলবানী তা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে صحيح বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَازِيَ بِحِمَا فُرُوعِ أُذُنَيْهِ. (১)

অর্থাৎ মালেক বিন হুওয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পেয়েছেন যে, তিনি নামাযে (তাকবীরে তাহরিমার সময়) দু'হাত উঠিয়েছেন এবং যখন রুকু করেছেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠিয়েছেন এবং যখন সিজদায় গিয়েছেন এবং যখন সিজদা থেকে স্বীয় মাথা উঠিয়েছেন- এমনকি (হাত উঠানোর সময় প্রত্যেকবার) দু'হাত দু'কান বরাবর উঠিয়েছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় পূর্বের পাঁচবারের পরিবর্তে চারবারের কথা এসেছে। অর্থাৎ এতে সিজদায় যাওয়ার সময় রাফউল ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ নেই, বাকীগুলো আছে।

যেমন সুনানে নাসায়ীরই এর দু'টি পরের বর্ণনায় এসেছে এবং শাইখ আলবানী তা সহীহ বলেছেন:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ: وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ. (২)

অর্থাৎ মালেক বিন হুওয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন.....। এরপর তিনি পূর্বের মতোই উল্লেখ করেন এবং এতে তিনি অতিরিক্ত এভাবে বলেছেন যে, এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করতেন এবং যখন রুকু থেকে স্বীয় মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন।

১ সুনানে নাসায়ী : পৃ. নং ১৩১ হাদীস নং ১০৮৫ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ১০৮৭

দেখা যাচ্ছে, এ বর্ণনায় তাকবীরে তাহরিমার সময় ছাড়াও মোট তিনবার দু'হাত উঠানোর কথা এসেছে অর্থাৎ মোট চারবার, যা পূর্বের বর্ণনার চেয়ে একবার কম।

কোনো কোনো হাদীসে দু'বার রাফউল ইয়াদাইনের কথা এসেছে। সুনানে আবু দাউদের একটি বর্ণনায় এসেছে, যা শাইখ আলবানীর মতে সহীহ। হাদীসটি হলো:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. (৩)

অর্থাৎ নাফে রহ. সূত্রে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন স্বীয় কাঁধ বরাবর দু'হাত তুলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দু'হাত তার চেয়ে কম উঠাতেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ হাদীসে রুকুতে যাওয়ার সময় দু'হাত উত্তোলন করার কথা বর্ণিত হয়নি, শুধু নামাযের শুরুতে ও রুকু থেকে উঠার পর রাফউল ইয়াদাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই যে, রাবী হয়তো রুকুতে যাওয়ার সময় দু'হাত তোলার কথা এখানে এ জন্য উল্লেখ করেননি যে, তখন দু'হাত উত্তোলন নামাযের শুরুতে দু'হাত উত্তোলনের মতোই ছিলো আর রুকু থেকে উঠার সময় হাত তোলার মাত্রাটা একটু কম হওয়ায় তা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো। কেননা, আমরা বলবো, যদি বাস্তবে এটাই কারণ হতো তাহলে রুকুতে যাওয়ার সময় হাত কতোটুকু উঠাবে তা জানারও প্রয়োজন আছে। যেহেতু নামাযে তিনবার হাত উঠানোর নিয়ম থাকবে আর রাবী শুধু প্রথম ও তৃতীয়বারে হাত উঠানোর নিয়ম ও মাত্রা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে আর দ্বিতীয়বারে হাত উঠানোর কথা ও তার নিয়ম বলবে না এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং এ হাদীস থেকে শুধু দু'বারই রাফউল ইয়াদাইনের কথা বুঝা যায়, তিনবার নয়।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। কোনো হাদীসে প্রত্যেক উঠাবসায়

এবং প্রত্যেক তাকবীরের সময়, কোনো হাদীসে পাঁচবার, কোনো হাদীসে চারবার, কোনো হাদীসে তিনবার, কোনো হাদীসে দু'বার এবং কোনো হাদীসে শুধু একবার রাফউল ইয়াদাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এর সবগুলো বর্ণনাই বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত। কোনোটিকেই বাদ দেয়া যায় না। আর এ কারণেই হানাফী উলামায়ে কিরাম এখানে নুসখ তথা রহিতকরণের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, এসবই একসময় নামাযে চালু ছিলো। পরবর্তীতে তা কমতে কমতে শুধু একবার পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে কিছু প্রমাণ ও নিদর্শনও রয়েছে। কেননা, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, লা-মাযহাবীরাসহ বিশ্বের কোনো মাযহাবই নামাযে প্রত্যেক উঠাবসায় দু'হাত উঠানোর প্রবক্তা নন। তদ্রূপ দু'সিজদার মাঝে এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানোর সময়ও কেউ রাফউল ইয়াদাইন করার কথা বলেন না। অথচ এসবই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর পিছনে একমাত্র কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, তা সব রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এগুলো যখন রহিত হতে পারে তখন রুকূর আগে-পরের রাফউল ইয়াদাইনের বিধানও রহিত হতে দোষ কোথায়? বিশেষ করে যখন সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে শুধু তাকবীরে তাহরিমার সময় একবারই রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

এছাড়াও পূর্বে গত হয়েছে যে, নামাযে প্রথম প্রথম কথা বলা, সালাম দেয়া নেয়া, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাসহ অনেক কিছুই বৈধ ও চালু ছিলো। তদ্রূপ রাফউল ইয়াদাইনের বিষয়টিও প্রথম প্রথম বিভিন্ন ক্ষেত্রে চালু ছিলো, যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং নামাযে এভাবে বারবার হাত উঠানোর বিষয়টি উপলব্ধি করে একদিন তো স্পষ্টভাবেই এর প্রতি স্বীয় গোশ্বা প্রকাশ করে নামাযে ধীরস্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, নামাযে অনেক স্থানে রাফউল ইয়াদাইন ছিলো ঠিক আছে, কিন্তু তার ব্যাপকতা রহিত করে শুধু একবারই শেষ পর্যন্ত বিধান ও সুন্নাহ হিসেবে বহাল হয়েছে।

এছাড়াও মুরসাল একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত একবারই শুধু রাফউল

ইয়াদাইন করেছেন। অর্থাৎ প্রথম দিকে একাধিকবার রাফউল ইয়াদাইনের নিয়ম থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা একবারে এসে পৌঁছেছে এবং এ অবস্থায়ই তাঁর ইত্তিকাল হয়েছে। তাই তাঁর পূর্বের আমলগুলো রহিত হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে।

বর্ণনাটি হলো:

عن محمد بن أبي يحيى قال: صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن زبير قال: فجعلت أرفع يدي في كل خفض ورفع فقال: يا ابن أخي رأيتك ترفع في كل رفع ووضع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء حتى يفرغ.^(১)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রহ. এর পাশে নামায পড়াকালীন প্রত্যেক উঠাবসায় আমার দু'হাত উঠাচ্ছিলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন হে আমার ভাতিজা! আমি তোমাকে দেখতে পেলাম যে, তুমি প্রত্যেক উঠাবসায় হাত উঠাচ্ছে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন শুধুমাত্র নামাযের শুরুতেই দু'হাত উঠাতেন এরপর আর হাত উঠাতেন না, এমনকি তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। (অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে নামায পড়াই ছিলো তাঁর শেষ জীবনের আমল।)

ইমাম তাহাবী রহ. এ রহিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.... أَفْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَنْ دُونَهُ! وَمَنْ هُوَ مَعَهُ يَرَاهُ يَفْعَلُ غَيْرَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ثُمَّ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ! هَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ. وَفَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا وَتَرَكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ
خِلَافَهُ. (১)

অর্থাৎ আর ইনি হলেন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু- তিনিও এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম তাকবীর ছাড়া আর রাফউল ইয়াদাইন করতেন না এবং এটা সহীহ হাদীস। সুতরাং তুমি কি এ কথা মনে করো যে, তাঁর কাছে এটা গোপন ও অজানা থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু-সিজদায় রাফউল ইয়াদাইন করতেন অথচ তাঁর চেয়ে ছোট ও নিম্নমানের লোকেরা তা জানবে? কিংবা (তুমি কি মনে করো যে) তাঁর সঙ্গীসাথী অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলের বিপরীত আমল করতে দেখেও তাঁর উপর কোনো আপত্তি তুলবেন না? এটা আমাদের নিকট অসম্ভব একটি বিষয়। আর উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ (পদ্ধতিতে) আমল করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ কর্তৃক তাঁকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া এ কথার বিশুদ্ধ প্রমাণ যে, এটাই হক ও সত্যপন্থা, যার বিরোধিতা করা কারো জন্য শোভা পায় না।

এছাড়াও পূর্বে বর্ণিত আসার থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় বড় সাহাবায়ে কিরাম নামাযে একবারের বেশী হাত উঠাতেন না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এঁদের চেয়ে বড় ও বিজ্ঞ আর কে ছিলেন, এঁদেরকে ছেড়ে যাদের অনুসরণ করা হবে? এটা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন একবারই করা সুন্নাত। আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা যিনি রুকুর আগে-পরে রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীসের রাবী-তিনিও কিন্তু নামাযে একবারই রাফউল ইয়াদাইন করতেন, যা পূর্বে সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে আরো বেশী করে প্রমাণ হয় যে, একাধিকবার রাফউল ইয়াদাইনের বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা, এটা

১ শরহ মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২২৭ হাদীস নং ১৩৬৪ সংশ্লিষ্ট (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

অসম্ভব যে, রহিত হয়নি এমন একটি বিধান সংক্রান্ত হাদীস ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বয়ং বর্ণনা করবেন আর নিজে সে বর্ণনা অনুসারে আমল করবেন না! কেননা, তিনি খুঁজে খুঁজে ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ-সাধারণ সব ধরনের সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারেই একনিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শেষ আমরা লা-মাযহাবী ভাইদের অনুরোধ করে বলবো, একটু সংযত হোন, লাগাম ছাড়া হবেন না। রাফউল ইয়াদাইন করাটা আপনাদের ইমামরাও ফরয ও আবশ্যকীয় মনে করেন না, যা এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এরকম একটি বিষয় নিয়ে কেনো এতো ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করছেন যে, হানাফীদের নামায হয় না? এ তো গেলো আপনাদের ইমামদের কথা। আমরা কি এ অধ্যায়ে প্রমাণ করিনি যে, একাধিকবার রাফউল ইয়াদান করা ফরয তো দূরে থাক, সুন্নাতও নয়? হ্যাঁ, একসময় একাধিকবার রাফউল ইয়াদাইনের বিধান ছিলো, যা বিস্তারিতাকারে হাদীসসহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা বলি, আপনাদের যদি বেশী করে রাফউল ইয়াদাইনের এতোই আগ্রহ থাকে তাহলে দু'সিজদার মাঝখানে, দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার সময়, তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানোর সময় কিংবা প্রত্যেক উঠাবসায় ও প্রত্যেক তাকবীরের সময়গুলোতে কেনো হাত উঠান না? এগুলোও তো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

একটু ভালো করে বুঝার চেষ্টা করুন- রাফউল ইয়াদাইন হাদীসে থাকা এক কথা আর এ বিধানটি বলবৎ ও চালু থাকা ভিন্ন একটি বিষয়। হাদীসে থাকলেই তা বিধান হিসাবে বলবৎ থাকা জরুরী নয়। যেমন সহীহ হাদীসে আছে, উটের গোশত বা আগুনে রান্না করা খাবার খেলে অযু ভেঙ্গে যায়। (দেখুন মুসলিম শরীফ: ১/১৫৬ হা. নং ৩৫১ ও ৩৬০) অথচ এ হাদীস অনুসারে কেউ আমল করে না। কেননা, এটা হাদীসে আছে ঠিক, কিন্তু এর বিধান বলবৎ নেই। একাধিকবার রাফউল ইয়াদাইনের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ। এটা হাদীসে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বিধান আর বলবৎ নেই, যা মারফু হাদীসসমূহ ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রাযি ও তাবেয়ীন রহ. এর আমল থেকে প্রমাণিত। সুতরাং এতে এতো বেশী বাড়াবাড়ি করা কিছুতেই সমচীন ও শোভনীয় নয়। আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

সর্বশেষে একটি ইলমী যুক্তি দিয়ে এ অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটচ্ছি। যুক্তিটি হলো- আমরা সবাই জানি ও মানি যে, নামাযের প্রথম তাকবীর তথা তাকবীরে তাহরিমায় রাফউল ইয়াদাইন করা হয় আর দু'সিজদার মাঝের তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করা হয় না। এতে কারো দ্বিমত নেই, না আমাদের আর না লা-মাযহাবীদের। এখন আসি রুকূর তাকবীর ও তা থেকে উঠার তাকবীরে। তো একদল (তথা হানাফীরা) বলেন এতে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে না যেমনটি করতে হয় না দুই সিজদার মাঝখানের তাকবীরে। আর অন্য একটি দল (তথা লা-মাযহাবীরা) বলেন, এতে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে যেমনটি করতে হয় নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরিমায়। এখন আমরা দেখবো কোন যুক্তিটি এখানে প্রাধান্য পাবে? আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম, তাকবীরে তাহরিমা হলো ফরয, যা ছাড়া নামাযই হবে না আর রুকূর তাকবীর ও তা থেকে উঠার তাকবীর হলো সুন্নাত, যেমনটি দু'সিজদার মাঝের তাকবীরসহ নামাযের অন্যান্য সকল তাকবীর সুন্নাত। বুঝা গেলো রুকূ ও তা থেকে উঠার সময়ের তাকবীরদ্বয় তাকবীরে তাহরিমার তুলনায় দু'সিজদার মাঝের তাকবীরের সাথেই অধিক মিল ও সামঞ্জস্যতা রাখে। কারণ, এসবই হলো সুন্নাত তাকবীর, পক্ষান্তরে তাকবীরে তাহরিমা হলো ফরয। সুতরাং রুকূর তাকবীর ও তা থেকে উঠার সময়ের তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন না করাটাই যুক্তিসঙ্গত। যাতে করে সব সুন্নাত তাকবীরের একই বিধান হয়। আর তাকবীরে তাহরিমা ফরয হওয়ায় তা অন্যান্য তাকবীরের বিধান থেকে ভিন্ন হয়ে তাতে রাফউল ইয়াদাইন করাটাই যুক্তিযুক্ত।

পূর্বের আলোচনায় কুরআনের আয়াত ও তার সহীহ তাফসীর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ প্রমাণযোগ্য হাদীস, শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের ফতোয়া ও আমল, তাবেয়ীন রহ. এর কর্মপন্থা ও বাণী এবং গ্রহণযোগ্য ইলমী যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন তাকবীরে তাহরিমার সময় শুধু একবারই করা সুন্নাত। এর বেশীর কথা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নরকমভাবে থাকলেও সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে বুঝা যায় তা সব রহিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। তাই যারা বলে নামাযে রুকূ ও রুকূ থেকে উঠার সময়ও রাফউল ইয়াদাইন ফরয তারা আমাদের এসব বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী প্রমাণগুলো অস্বীকার

করার পাশাপাশি স্বয়ং তাদের অনুসরণীয় ইমামদেরও তথা ইমাম ইবনে হযম রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম ইবনুল জাওযিয়া রহ. প্রমুখদেরও বিরোধিতা করছে। কেননা, অধ্যায়টির শুরুতে আমরা তাদের থেকে এ কথা প্রমাণ করেছি যে, তারা এসকল ক্ষেত্রে রাফউল ইয়াদাইন ফরয ও আবশ্যক মনে করেন না। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

১৯ তম পাঠ: (জামাতের নামাযে পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাজে পায়ে পা মিলিয়ে নামাজ পড়া রাসূল (সাঃ) ও তার সাহাবীদের সুনাত। যা হাজার হাজার সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বর্তমান বাংলাদেশে যে নিয়ম আছে তা ভুয়া। কোন জাল হাদীসেও নাই ফাকে ফাকে দারাতে হবে। পায়ে পা মিলাতে হবে। বোঃ ইঃ ফাঃ ৯৫ পৃঃ ৯৮৯ নং হাদীস।

জবাব:

আমরা লা-মায়হাবী বন্ধুদের নিকট বিনীত আবেদন জানাই, আপনারা হাজার হাজার নয়, শুধু একটা বিশুদ্ধ স্পষ্ট হাদীস দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। আমরা জানি, আপনারা কোনোদিনও তা পারবেন না। আপনারা শুধু পারেন সরলমনা অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানদেরকে বুখারী, মুসলিমের নাম ভাঙ্গিয়ে ধোঁকা দিতে। আর পারেন শাইখ আলবানীর ভুল ও বিচ্যুতিতে ভরা গবেষণা, ইজতিহাদের উপর পূর্ণ ভরসা ও অনুসরণ করে একতাবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল সৃষ্টি ও ফেতনা-ফাসাদ করতে।

যাই হোক, আমরা এখন দেখবো, নামাযের কাতার সংক্রান্ত শরীয়াহর নির্দেশনা কী? সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। যাতে পাঠকদের এ বিষয়ে হাদীসভিত্তিক ভালো একটা ধারণা লাভ হয়। এরপর আমরা লা-মায়হাবীদের পায়ে পা মিলানো কথাটির উৎস এবং উদ্ধৃত বুখারী শরীফের হাদীসটি নিয়ে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হাদীসসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতার সোজা করার নিয়ম ও দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলানোর কথা এবং শূণ্যস্থান পূরণ করে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন, কিন্তু পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা কোথাও বলেননি।

কাতার সোজা করা সংক্রান্ত সবচে অর্থপূর্ণ, ব্যাপক ও সুন্দর হাদীস হলো আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি :

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَثَمٌ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجْرَةَ - لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَخَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَلُُّوا الْخُلُلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কাতার সোজা করো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান্তরাল করো। (কাতারের মাঝের) শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করো এবং তোমাদের (মুসল্লী) ভাইদের জন্য নমনীয় হও। আর শয়তানের জন্য (কাতারের) মাঝে ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তাকে নিজের সাথে মিলাবেন আর যে কাতার বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন।

এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। লা-মাযহাবীদের ইমাম শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (২)

এছাড়া ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. ও ইমাম হাকিম রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, যা হাফেয ইবনে হাজার রহ. স্বীয় ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন এবং তিনি এ হাদীসটিকে এ সংক্রান্ত সবচে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেন। (৩)

১ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ৯৪ হাদীস নং ৬৬৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাপ্ত

৩ ফাতহুল বারী : ২/৩৪৬ কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলানো সংক্রান্ত অধ্যায় (দারুল ফিকর, বৈরুত)

সুনানে আবু দাউদের আরেকটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُا الْحَذَفُ. (১)

অর্থাৎ আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কাতার পাশাপাশি করে কাছাকাছি দাঁড়াও এবং কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করো। ঐ জাতের শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে কাতারের মাঝের শূণ্যস্থানগুলোতে ঢুকতে দেখি; যেনো সে ছোট কালো একটি ভেড়া।

এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ, যা শাইখ আলবানীও স্বীকার করেছেন। (২)

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ.ও হাদীসটি স্বীয় সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণনা করে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (৩)

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوْوَا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. (৪)

১ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ৯৪, হাদীস নং ৬৬৭ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাগুক্ত

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৮৭-১৮৮ হা. নং ৫০২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ সহীহ মুসলিম : ১/১৮১ হাদীস নং ৯২২ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

অর্থাৎ আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধসমূহ ধরে বলতেন, সোজা হও, বাঁকা হয়ো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরও বক্র হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্য থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী লোকেরা (নামাযে) আমার নিকটবর্তী দাঁড়াবে এরপর (বয়স ও জ্ঞানে) এদের কাছাকাছি যারা এরপর যারা এদের কাছাকাছি। আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সুতরাং তোমরা আজ (কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার কারণে) সবচে বেশী মতানৈক্য ও বিভেদের শিকার।

এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস এসেছে, যার অধিকাংশগুলোতে কাতার সোজা করার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলানোর কথা বলা হয়েছে। কোনো একটি হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা বলেননি। তাছাড়া এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় যে, পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে দু'ব্যক্তির পায়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক থেকেই যায়। কেননা, মানবদেহের নিম্নাংশের চেয়ে উপরাংশ একটু বেশী চওড়া। তাই যখন দেহের উপরাংশ পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়াবে তখন প্রকৃতিগতভাবেই নিম্নাংশ পরস্পরে মিলবে না; বরং কিছুটা ফাঁক থাকবে। তাই এ ফাঁক বন্ধ করে পা অন্যের পায়ের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো মানুষের দৈহিক গঠনের ধর্মবিরোধী এবং তাকালুফী, যা ইসলাম সমর্থন করে না। যেহেতু ইসলাম বাস্তবধর্মী এক জীবনব্যবস্থার নাম, যা কখনো মানুষের জন্য প্রকৃতিবিরোধী কিছুর নির্দেশ দেয় না।

আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা মূলত সহীহ বুখারীতে একজন সাহাবীর একটি মন্তব্য পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এ কথাটির ব্যাখ্যা কী? মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন?— সে দিকে কোনো ভ্রমক্ষেপ না করেই ঢালাওভাবে এরা এ কথাটির বাহ্যিক অর্থ ধরে ফতোয়া দেয়া শুরু করেছে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত সে হাদীসটি আমরা ব্যাখ্যাসহ এখানে তুলে ধরছি:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. (৫)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো। কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক দিয়েও দেখতে পারি। (আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,) আর আমাদের একজন অন্যজনের সাথে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে।

এ হাদীসটিতে আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু মূলত কাতার সোজা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, আমরা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম। নতুবা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাঁধে কাঁধ মিলালে পুরোপুরিভাবে পায়ে পা মিলানো সম্ভব নয়; বরং এখানে খুব কাছাকাছি দাঁড়ানোকেই রূপক অর্থে ‘পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো’ বলা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উপরোক্ত কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন:

(قَوْلُهُ بَابُ إِرْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ. وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ.^(১)

অর্থাৎ তাঁর উক্তি “কাতারে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলানোর অধ্যায়”-মূলত এদ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাতার সোজা এবং ফাঁকাস্থান পূরণ করার ব্যাপারে জোরদান ও গুরুত্বারোপ। আর বহু হাদীসেই কাতারের ফাঁকাস্থান বন্ধ করার নির্দেশ ও উৎসাহপ্রদান করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারীতে হাফেয বদরুদ্দীন আঈনী রহ.ও উক্ত কথাটির অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।^(২)

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এ হাদীসে আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু উক্ত কথাটি বাস্তব অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বলেছেন।

সুনানে আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দেখলে বিষয়টি আরো বেশী পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

১ ফাতহুল বারী : ২/৩৪৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ উমদাতুল কারী : ৪/৩৬০-৩৬২ (যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزُقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. (৩)

অর্থাৎ নুমান বিন বশীর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদে সমবেত) লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বললেন, তোমরা কাতার সোজা করো। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াবে অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। (নুমান বিন বশীর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন) অতঃপর আমি মুসল্লীদেরকে পরস্পরে কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।

লক্ষ্যণীয় যে, এ হাদীসে কাতার সোজা করতে কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলানোর কথা বলা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানেও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং রূপক অর্থে কাতার সোজা করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপই উদ্দেশ্য। কেননা, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি বিষয় যে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলালে হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি পরস্পরে মিলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর কষ্ট করে মিলালেও হাঁটু ও পা পশ্চিম তথা কিবলার দিকে সোজা থাকবে না, যা নামাযের নিয়ম পরিপন্থী। এমনকি লা-মাযহাবীরাও দাঁড়ানোর সময় হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলায় না। তারা শুধু পায়ের সাথে পা মিলানোর প্রতিই গুরুত্বারোপ করে। এতে শরীর ও দেহ বাঁকা হলেও কোনো ভ্রম্ফেপ নেই। এমনকি অনেকে তো কাঁধ মিলানোকেও গুরুত্ব দেয় না। অথচ প্রায় অধিকাংশ হাদীসে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়ানোর প্রতিই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাতার সোজা করার ব্যাপারে হাদীসে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতার সোজা করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি স্বয়ং নিজে সাহাবীদের নিকট এসে কাঁধে কাঁধ এবং কোনো কোনো বর্ণনার তাঁদের সিনাগুলোও মিলিয়ে কাতার সোজা করে দিতেন। বুকা গেলো, দেহের উপরিভাগ পরস্পরে মিলিয়ে সোজা করে দাঁড়ালেই কাতার সোজা হয়ে যায়। এতে দু'পায়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকলেও সমস্যা নেই। তবে পরস্পরে কাঁধ যেনো মিলে থাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে।

২০তম পাঠ: (সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সিজদা যাওয়ার সময় আগে হাঁটু পরে হাত যাবে এই মর্মে হাদীসটি ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্য ইমামগণ যঈফ বা দুর্বল বলেছেন। সিজদা যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু যাবে অসংখ্য সহীহ হাদীসে আছে।

বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৩০ পৃঃ ৫২০ নং অনুচ্ছেদ।

জবাব:

ধোকা আর কাকে বলে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোকে যঈফ আখ্যা দিয়ে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মতানৈক্যপূর্ণ আমলকে বুখারীর উদ্ধৃতিতে হাদীস বলা হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো- সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু পরে হাত যাবে মর্মে হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান গরীব তথা এককভাবে উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস বলেছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ এ মর্মে বর্ণিত আরো কিছু হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. শুধু হাদীসটিকে হাসান বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীদের অধিকাংশ উলামা এ মতানুসারেই আমল করে থাকেন এটাও বলেছেন।

দ্বিতীয়ত: লিফলেটে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত পরে হাঁটু যাবে অসংখ্য সহীহ হাদীসে আছে দাবি করে সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ সহীহ বুখারীতে এ সংক্রান্ত কোনো মারফু হাদীস নেই। হ্যাঁ, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর আমল বর্ণিত হয়েছে বটে তবে তা সনদ সহকারে নয়; বরং তালীক স্বরূপ। আর এটাকে হাদীস বলে না; বরং বলা হয় হাদীসে মাওকুফ বা আসর। এভাবেই লা-মাযহাবীরা আমাদের সরলপ্রাণ মুসলিম ভাইদের ধোকা দেয়ার প্রচেষ্টায় লেগে আছে।

এছাড়াও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বর্ণনায় দেখা যায়, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু আগে রাখতেন এরপর হাত রাখতেন। দেখা যাচ্ছে, তার আমল ও বর্ণনায় মতানৈক্য রয়েছে।

সুতরাং এরকম মতানৈক্যপূর্ণ একটি আমল কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোর বিপক্ষে দলীল হয়?

এখন আমরা সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু এরপর হাত রাখা সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ ও হাসান হাদীস উল্লেখ করবো। এরপর সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় ও মযবুত বলে প্রমাণ করবো। পাশাপাশি সংক্ষিপ্তাকারে প্রথমে হাত এরপর হাঁটু রাখা সংক্রান্ত মারফু হাদীসটির বর্ণনাগত সমস্যা ও কারণ প্রমাণ সহকারে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.... قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.... وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (১)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন স্বীয় দু'হাঁটু দু'হাতের পূর্বে রাখতেন এবং যখন (সিজদা থেকে) উঠতেন তখন স্বীয় দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত উঠাতেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটা হাসান গরীব হাদীস। আর অধিকাংশ উলামা এ নিয়মেই আমল করেন। তাঁরা বলেন, মুসল্লী ব্যক্তি স্বীয় দু'হাতের পূর্বে দু'হাঁটু রাখবে এবং যখন উঠবে তখন দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত উঠাবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত প্রমাণযোগ্য হাদীস) বলেছেন। (২)

১ সুনানে তিরমিযী : ২/৪৭ হাদীস নং ২৬৮ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ প্রাপ্ত

ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ.^(৩) ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহ.^(৪) স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে একে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন:

على شرط مسلم.^(৫)

অর্থাৎ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।

এছাড়া ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. তো সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত পরে হাঁটু রাখার হাদীসকে মানসূখ (রহিত) বলে একটি শিরোনাম বেঁধেছেন এবং তাতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেই হাদীসটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ
مَنْسُوخٌ وَأَنَّ وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ نَاسِخٌ، إِذْ كَانَ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ
الرُّكْبَتَيْنِ مُقَدِّمًا وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُؤَخَّرًا فَالْمُقَدِّمُ مَنْسُوخٌ
وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ.

৬২৮ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ
الرُّكْبَتَيْنِ فَأَمَرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.^(৬)

অর্থাৎ অধ্যায়: এ বিষয়টির প্রমাণ বর্ণনা যে, সিজদায় (যাওয়ার সময়) দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখার নির্দেশটি রহিত এবং দু'হাতের পূর্বে দু'হাঁটু রাখা সংক্রান্ত নির্দেশটি রহিতকারী। যেহেতু দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখার নির্দেশটি

৩ সহীহ ইবনে খুযাইমা : ১/৩১৮ হা. নং ৬২৬ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৪ সহীহ ইবনে হিব্বান বিতারতীবী ইবনে বালবান : ৫/২৩৭ হা. নং ১৯১২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৫ তালখীস মাআল মুস্তাদরাক : ১/৩৪৯ হা. নং ৮২২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৬ সহীহ ইবনে খুযাইমা : ১/৩১৯ হাদীস নং ৬২৮ অধ্যায় নং ১৭২ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

ছিলো প্রথম যামানার আর দু'হাতের পূর্বে দু'হাটু রাখার নির্দেশটি পরের যামানার। সুতরাং আগের বিধানটি রহিত এবং পরের বিধানটি রহিতকারী হবে। (এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যা) সাদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (প্রথমদিকে) দু'হাটুর পূর্বে দু'হাত রাখতাম। এরপর আমাদেরকে দু'হাতের পূর্বে দু'হাটু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

এ হাদীসটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও অন্যান্য সহীহ হাদীসগুলো এর সমর্থনে থাকায় তা সহনীয়।

যেমন মুত্তাদরাকে হাকিমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

فَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ. (১)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি তাকবীর বলে দু'বৃদ্ধাঙ্গুলীকে দু'কান বরাবর করতেন। এরপর রুকু করতেন এমনকি তাঁর ধত্যেকটি জোড়া স্থির হয়ে যেতো এবং (এরপর) তাকবীর বলে (সিজদার উদ্দেশ্যে) নিচে নামতেন; এমনকি তার দু'হাটু (যমীনে নামার সময়) দু'হাতের অগ্রবর্তী হতো।

ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً. (২)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ সনদ। এতে কোনো ত্রুটির কথা আমি জানি না।

হাফেয যাহাবী রহ.-ও ইমাম হাকিমের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন:

عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً. (৩)

১ মুত্তাদরাক : ১/৩৪৯ হাদীস নং ৮২২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ (প্রাপ্ত)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী (সহীহ) এবং এতে কোনো ত্রুটি ও সমস্যা দেখি না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بَرُوكَ الْإِبِلِ. (৪)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে মারফু সূত্রে তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে তখন যেনো দু'হাতের পূর্বে দু'হাঁটু দিয়ে (সিজদা) শুরু করে এবং উটের বসার মতো (প্রথমে দু'হাত তথা সামনের দু'পা বিছিয়ে) না বসে।

এ হাদীসটির বিপরীত সুনানে আবু দাউদে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন যেনো উটের বসার মতো না বসে; বরং দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখে।

এ হাদীস সম্বন্ধে লা-মাযহাবীদের অন্যতম আস্থাভাজন ইমাম হাফেয ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়া রহ. বলেন, মূলত এখানে কোনো এক রাবী থেকে হাদীসের বাক্যস্থাপনে অগ্রপ্চাত হয়ে গিয়েছে। কেননা, এতে হাদীসের দ্বিতীয়াংশটি প্রথম অংশের বিপরীত অর্থ বহন করে। হাদীসের প্রথমাংশে উটের মতো বসতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমরা জানি উট প্রথমে সামনের দু'পা (যা চুত্পদ প্রাণীর জন্য হাত সমতুল্য) বিছিয়ে তারপর পিছনের দু'পায়ের

উপর বসে। অথচ হাদীসের দ্বিতীয়াংশে হাতের পূর্বে হাঁটু বিছিয়ে (উটের বসার মতোই) সিজদায় যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ তো সম্পূর্ণ প্রথম নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই বুঝা যায়, এখানে কোনো এক রাবীর বর্ণনায় ভুল হয়েছে। মূল হাদীস হওয়া উচিত ছিলো **وَلِيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ** বলা, কিন্তু রাবী ভুল করে বর্ণনা করেছে **وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ** আর এতে রাবী যে বাস্তবেই ভুল করেছে তা উপরোল্লিখিত মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তথাপি হাফেয ইবনুল কাইয়িম জাওয়াযীয়া রহ. আবু দাউদের এ বর্ণনাটি ভুল হওয়ার ব্যাপারে খুব জোড়ালোভাবে আরো কয়েকটি যৌক্তিক পয়েন্টে আলোচনা করেছেন। (১)

সুতরাং পূর্বে উল্লেখিত এসব সহীহ ও হাসান পর্যায়ের মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু এরপর দু'হাত রাখাই সুন্নাত ও স্বাভাবিক পন্থা। এখন আমরা কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল ও ফতোয়া দ্বারা মাসআলাটিকে আরো মযবুত ও সুদৃঢ় করবো।

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ عُلُقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَقَالَا: حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخْرُ الْبَعِيرُ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. (২)

অর্থাৎ আলকামা রহ. ও আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আমরা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নামায স্মরণ রেখেছি যে, তিনি রুকু'র পর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে (সিজদার উদ্দেশ্যে) উটের মতো নত হয়ে (যমীনে) পতিত হতেন এবং (এ সময়) হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন।

এ সনদের সবগুলো রাবীই নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

(৩) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

১ যাদুল মাআদ : ১/২২৩-২২৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

২ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৫৬ হাদীস নং ১৫২৮ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৬৯ হা. নং ৪৩২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ এর সনদ বিশুদ্ধ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে আরো সংক্ষিপ্ত সহীহ সনদে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সিজদায় যাওয়ার এ পন্থা বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. (৪)

وَأَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (৫)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত যে, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (সিজদায় যাওয়ার সময়) দু'হাতের পূর্বে দু'হাঁটু রাখতেন।

এর পরের বর্ণনায় আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বীয় দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে (সিজদায়) পতিত হতেন।

এ বর্ণনা দু'টির সবগুলো রাবীই অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের ইমাম ও মুহাদ্দিস বিধায় হাদীস দু'টির সনদ সহীহ। তবে প্রথম বর্ণনাটি মুরসাল হলেও তা যেহেতু ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর মুরসাল, যা অধিকাংশ উলামার নিকট সহীহ ও প্রমাণযোগ্য তথাপি দ্বিতীয় বর্ণনার দ্বারা তা আরো শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু এ বর্ণনায় ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর পরের রাবী আসওয়াদ রহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর আসওয়াদ রহ. হলে শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত, যিনি সরাসরি উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। বিধায় প্রথম বর্ণনার ব্যাপারে কারো সামান্য আপত্তি থাকলেও দ্বিতীয় বর্ণনাটি তা দূর করে দেয়।

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ الْحُجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُكْبَتَيْهِ كَانَتَا تَقَعَانِ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ. (৬)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪৮৯ হাদীস নং ২৭১৮ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৫ প্রাগুক্ত : ২/৪৯০ হাদীস নং ২৭১৯

৬ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৫৬ হাদীস নং ১৫২৯ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, (সিজদায় যাওয়ার সময়) তাঁর দু'হাটু যমীনে দু'হাতের পূর্বে পতিত হতো।

পূর্বে এ আলোচনা বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে যে, ইবরাহীম নাখয়ী রহ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে তখনই মুরসাল হিসেবে হাদীস বর্ণনা করেন যখন তা ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অসংখ্য রাবী বর্ণনা করে থাকেন। এজন্যই জমহুর মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কিরাম ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর মুরসালকে প্রমাণযোগ্য ও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এ বর্ণনাটির সবগুলো রাবী সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র হাজ্জাজ বিন আরতাতের ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার হাদীসকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। যেমনটি হাফেযে হাদীস যাহাবী রহ. স্বীয় আল মুকিয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা আ. হাই লাখনবী রহ. যফরুল আমানী শরহ মুখতাসারিল জুরজানীতে নকল করেছেন।^(১)

সুতরাং এ বর্ণনাটি হাসান বলে বিবেচিত হলো, যা দলীল ও প্রমাণযোগ্য।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.^(২)

অর্থাৎ নাফে সূত্রে ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি যখন সিজদা দিতেন তখন দু'হাতের পূর্বে দু'হাটু রাখতেন আর যখন (সিজদা থেকে মাথা) উঠাতেন তখন দু'হাটুর পূর্বে দু'হাত উঠাতেন। (অর্থাৎ সিজদায় যাওয়ার তারতীবের বিপরীত)

এ বর্ণনাটিরও সবগুলো রাবী সিকা। শুধুমাত্র ইবনে আবী লাইলার ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক আছে যে, তার স্মরণশক্তি একটু দুর্বল ছিলো। তথাপি সে সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই। এজন্য মুহাদ্দিসীন কিরামের নিকট সে صدوق বলে পরিচিত। আর এ জাতীয় রাবীদের বর্ণিত হাদীসও হাসানের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ হাদীসটি হাসান বলে বিবেচিত হবে।

১ যফরুল আমানী : পৃ. নং ১৪৭ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪৯০ হাদীস নং ২৭২০ (দারুল কিবলা, জেদা)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও আ. রায়যাকে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ كَثْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ ثُمَّ يَدَاهُ ثُمَّ رَأْسُهُ. (৩)

وفي روايه عبد الرزاق زيادة "فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ". (৪)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম তার পিতা মুসলিম বিন ইয়াসার রহ. এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন প্রথমে তাঁর দু'হাঁটু এরপর দু'হাত এরপর মাথা পতিত হতো।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে আরো অতিরিক্ত এসেছে যে, আর যখন (সিজদা থেকে) উঠতেন তখন প্রথমে স্বীয় চেহারা এরপর দু'হাত এরপর দু'হাঁটু উঠাতেন।

এ হাদীসটির সনদ সহীহ, এর সবগুলো রাবীই সিকা তথা নির্ভরযোগ্য।

ইমাম আ. রায়যাক রহ. হাদীসটি বর্ণনা শেষে বলেন:

وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجَبَ بِهِ. (৫)

অর্থাৎ কতোই না উত্তম ও পছন্দনীয় এ হাদীস!

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا انْحَطُّوا لِلْسُّجُودِ وَقَعَتْ رُكْبَتُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ. (৬)

অর্থাৎ আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর শাগরিদ ও সঙ্গীসাথীরা যখন সিজদার উদ্দেশ্যে নত হতেন তখন হাতের পূর্বে তাঁদের হাঁটু (যমীনে আগে) পতিত হতো।

৩ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ২৭২১

৪ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ২/১৭৭ হাদীস নং ২৯৫৮ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৫ প্রাগুক্ত

৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪৯০ হাদীস নং ২৭২৬ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

এ হাদীসটি সনদের বিচারে হাসান ও প্রমাণযোগ্য। কেননা, এখানে হাজ্জাজ বিন আরতাত নামক একজন রাবী আছেন, যিনি মুহাক্কিকীন মুহাদ্দিসীনের নিকট হাসানুল হাদীস স্তরের রাবী, যার আলোচনা কিছুক্ষণ পূর্বেই গত হয়েছে। এছাড়া বাকী সবাই সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ

قَبْلَ يَدَيْهِ. (১)

অর্থাৎ মাহদী বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ.-কে দেখেছি যে, তিনি (সিজদায় যাওয়ার সময়) দু'হাতের পূর্বে (যমীনে) দু'হাঁটু রাখতেন।

এ হাদীসের রাবীদ্বয় অকী রহ. এবং মাহদী রহ. হাদীসশাস্ত্রের ইমাম। তাই এ সনদটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয়ের অবকাশ নেই।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ

إِبْرَاهِيمُ: أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ. (২)

অর্থাৎ মামার সূত্রে ইবরাহীম নাখরী রহ. থেকে বর্ণিত, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যার দু'হাত (সিজদায় যাওয়ার সময়) দু'হাঁটুর পূর্বেই পতিত হয়- তিনি বলেন, এটা পাগল ছাড়া কি কেউ করতে পারে? (অর্থাৎ এ পদ্ধতিকে তিনি পছন্দ করলেন না।)

এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবীই হাদীস জগতের ইমাম বিধায় এর সনদও সুস্পষ্ট সহীহ।

মূলত এ সংক্রান্ত আরো অনেক মারফু ও মাওকূফ হাদীস রয়েছে, যা স্থান দ্বন্দ্বতায় ও কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করা হলো না। তথাপি উল্লিখিত বিতর্কিত মারফু হাদীসসমূহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও আমল এবং মাওকূফ হাদীসগুলো থেকে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম

১ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ২৭২৪

২ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ২/১৭৭ হাদীস নং ২৯৫৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

যথা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীন যথা আলকামা রহ., আসওয়াদ রহ., ইবনে সীরীন রহ., ইবরাহীম নাখয়ী রহ., মুসলিম বিন ইয়াসার রহ., প্রমুখের আমল ও ফতোয়া এটাই প্রমাণ করে যে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু তারপর দু'হাত তারপর চেহারা রাখাই সুন্নাত।

সুতরাং এ রকম একটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে অস্বীকার করা, পাশাপাশি এর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই দাবি করা কতো বড় ধৃষ্টতা ও সুন্নাহবিরোধী কথা! আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত করুন।

২১ তম পাঠ:

(সিজদা শেষে না বসে মাটিতে ভর না দিয়ে
সরাসরি দাঁড়ানো সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সিজদা শেষে মাটিতে ভর না দিয়ে তিরের মত দাড়াতে হবে মর্মে যে হাদীসটি আছে তা মওযু এ মর্মে সকল হাদীসই যঈফ, শেখ আলবানী বলেছেন। মাটিতে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বোঃ ইঃ ফাঃ ১৪২ পৃঃ ৭৮৬ নং হাদীস।

জবাব:

প্রথমত: বুঝা উচিত যে, মওযু ও যঈফ এক জিনিস নয়। মওযু হলো জাল ও বানানো হাদীস, যা মূলত হাদীসই নয়। মুসলমানদের ঈমান, আমল নষ্ট করার জন্য মুসলিম ছদ্মবেশী নাস্তিকগণ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে কিছু হাদীস বানিয়েছে। আবার অজ্ঞতাবশতঃ কতিপয় অদূরদর্শী মুসলিমও নেককাজে উৎসাহমূলক ও পাপকাজে শাস্তিমূলক কিছু হাদীস রচনা করেছে। এগুলোকেই মূলত মওযু বা জাল হাদীস বলা হয়। আর যঈফ বলা হয়, যা এরকম বানানো কিছু নয়; বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বলেই ধারণা, তবে উক্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে স্মরণশক্তির দুর্বলতা, উদাসীনতা, গোনাহের কাজে জড়িত হওয়া, বর্ণনায় সূত্রবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস কিনা তা নিশ্চিত নয়; বরং এতে একপ্রকারের সংশয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বুঝা গেলো, মওযু মূলত কোনো হাদীসই নয়। আর যঈফ হাদীস তো বটে, কিন্তু তা সংশয়যুক্ত; সহীহ বা হাসানের মতো সংশয়মুক্ত নয়। এজন্যই কোনো বিষয়ে শতাধিক মওযু হাদীস থাকলেও বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কেননা, তা হাদীসই নয়। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে যদি একাধিক যঈফ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে অবস্থা বুঝে ক্ষেত্রবিশেষ তা দলীলযোগ্য হয়ে যায়। কারণ, এটা যেহেতু হাদীস -যদিও তা দুর্বলই হোক না

কেনো- সেহেতু যখন একসাথে কয়েকটি দুর্বল হাদীস পাওয়া যাবে তখন তাতে এক প্রকার শক্তি তৈরি হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হওয়ার ব্যাপারে যে সংশয়টুকু ছিলো তা অনেকটা দূর হয়ে সহীহ হাদীসের মতো এটাও প্রমাণযোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং মওযু ও যঈফ হাদীসকে এক মনে করে গুলিয়ে ফেলা মস্তবড় ভুল ও মারাত্মক অপরাধ। আর অমার্জনীয় এ ভুলটিই বারবার ঘটছে আলবানী সাহেব ও তার অনুসারীদের থেকে।

দ্বিতীয়ত: এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝা উচিত যে, শাইখ আলবানী কোনো এক বিষয়ের সকল হাদীসকে যঈফ বললেই বাস্তবে তা সব যঈফ হয়ে যায় না। হাদীস সহীহ-যঈফ নির্ণয় করতে গিয়ে শাইখ আলবানীর অসংখ্য ভুল ও বিচ্যুতি হয়েছে। উলামায়ে কিরাম তার এসব ভুল নিয়ে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, তার সহীহ, যঈফ বলার উপর পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। অথচ লিফলেট প্রচারকারী এখানে একমাত্র আলবানীর ভুল ভ্রান্তিতে ভরা গবেষণার উপর আস্থা রেখে; বরং বলা ভালো তার তাকলীদ (অনুসরণ) করে ফয়সালা দিয়ে দিলেন যে, এ মর্মে সব হাদীসই যঈফ।

তৃতীয়ত: আমরা এখন সহীহ ও হাসান সনদে মারফু তথা রাসূলের হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীনের আমল ও ফতোয়া থেকে প্রমাণ করবো যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে দাঁড়ানোর সময় বসে হাতের উপর ভর দিয়ে না দাঁড়িয়ে সরাসরি দাঁড়ানোই আসল সুন্নাত। আর অসুস্থতা, শরীর ভারী হওয়াসহ বিভিন্ন অসুবিধার ক্ষেত্রে যমীনে বসে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোও বৈধ, এমতাবস্থায় এটাও সুন্নাহবিরোধী হবে না; বরং তা সুন্নাত বলেই বিবেচিত হবে।

মোটকথা, অবস্থা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে মাটিতে ভর না দিয়ে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়াই সুন্নাত। আর কোনো ওযর বা সমস্যা থাকলে তখন মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোও সুন্নাহ পরিপন্থী হবে না; বরং এটাও (সাময়িক) সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে আমরা লিফলেটে উদ্ধৃত বুখারী শরীফের হাদীসটির ব্যাখ্যা উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্তাকারে তার জবাব প্রদান করবো। তারপর আমাদের মূল মাসআলা প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে সহীহ হাদীস ও আসারে সাহাবা ও তাবেয়ীন উল্লেখ করবো।

সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (১)

অর্থাৎ আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালেক বিন হুয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখেছেন। অতঃপর যখন নামাযের বিজোড় তথা প্রথম বা তৃতীয় রাকআতে আসতেন তখন সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে তারপর (দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে মালেক বিন হুয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায পড়ার বর্ণনা দিয়েছেন, যা আমলী তথা ফেলী (কর্মবিষয়ক) হাদীস। কিন্তু এ ব্যাপারে এভাবে কোনো কওলী (মৌখিক) হাদীস পাওয়া যায় না যে, তোমরা প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে প্রথমে সোজা হয়ে বসবে তারপর দাঁড়াবে। আর আমলী তথা কর্মবিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোনো কারণে এভাবে নামায পড়েছিলেন; বিশেষ করে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই তাঁর উক্ত আমলের বিপরীত মৌখিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

এছাড়াও মালেক বিন হুয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন ঐসব সাহাবার অন্তর্ভুক্ত, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষদিকে অল্প সময় পর্যন্ত তাঁর সোহবত লাভ করেছেন। আর সে সময়টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা মায়ূর ও শারীরিকভাবে ভারী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এ সময়ের কোনো আমল যাতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় যখন তাঁর কোনো মৌখিক নির্দেশনার কিংবা অন্য সময়ের আমলের বিপরীত হবে তখন এটাই গৃহিত হবে যে, তিনি এ শেষ সময়ে এমনটি করেছেন কোনো শারীরিক অসুস্থতা কিংবা ওয়রের কারণে।

এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবী রহ. এর উদ্ধৃতিতে হাফেযে হাদীস বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য ও হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন:

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَمِيدَ جُلُوسَةِ الْاِسْتِرَاحَةِ وَسَاقَهُ بِلَفْظٍ: (فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَلَمَّا تَخَالَفَ الْحَدِيثَانِ اخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ فَقَعَدَ مِنْ أَجْلِهَا لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَنَةِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ أَيُّضًا: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُلُوسَةُ مَقْصُودَةً لَشَرَعَ لَهَا ذِكْرٌ مُخْصُوصٌ.....قَوْلُهُ: (لَا تَبَادُرُونِي فَإِنِّي قَدْ بَدَنْتُ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعِلَّةٍ. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْجُلُوسَةَ لِلَاِسْتِرَاحَةِ وَالصَّلَاةِ غَيْرَ مَوْضُوعَةٍ لِتِلْكَ. (২)

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, আবু হুমাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসে তো জালসাতুল ইস্তিরাহাত তথা প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে কিছু সময় বসার কথা নেই। এরপর তিনি এ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন, فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ অর্থাৎ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রথম রাকআত শেষে) দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। ইমাম আবু দাউদ রহ. এভাবেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, যখন দু'টি হাদীস পরস্পরে সাংঘর্ষিক হলো তখন এটাই সম্ভাব্য সমাধান হবে যে, মালেক বিন হুয়াইরিস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন (অর্থাৎ বিজোড় রাকআত শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে যে কিছু সময় বসেছিলেন) তা তাঁর কোনো সমস্যা ও ওয়রের কারণে ছিলো, যদ্বন্ধন তিনি বসেছিলেন। এটা এ কারণে নয় যে, এমনটিই সুন্নাত। তিনি আরো বলেন, শরীয়তে যদি এ বসাটা উদ্দেশ্যই হতো তাহলে এতে বিশেষ কোনো দুআ থাকতো। (কেননা নামাযের প্রত্যেক উঠা-বসাতেই কোনো না কোনো দুআ আছে। এ বৈঠকে যেহেতু বিশেষ কোনো দুআ নেই বিধায় বুঝা গেলো, এ বৈঠকটি স্বাভাবিক, সুস্বাভাবিক শরীয়তে অনুমোদিত ও সুন্নাত নয়।) হাফেয আইনী রহ. বলেন, আমি বলবো (একটি

হাদীসে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী لا تبادروني (অর্থাৎ তোমরা আমার ব্যাপারে কিছু দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়া করিও না। কেননা, আমি একটু শারীরিকভাবে ভারী হয়ে গিয়েছি) এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর উক্ত বৈঠক ওয়রের কারণেই ছিলো। (যেমনি বিশেষ এক ওয়রের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দাঁড়িয়েও পেশাব করেছিলেন।) এছাড়াও এটাকে বিশ্রামের বৈঠক বলা হয় অথচ নামায তো বিশ্রামের জন্য নয়; বরং ইবাদতের জন্য।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, বুখারীর উক্ত হাদীসটি তাদের দাবির পক্ষে পরিষ্কার কোনো দলীল নয়। এ পর্যায়ে আমরা এখন আমাদের দাবির পক্ষে হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.... قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمَنِي قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ.... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায শুরু করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর (নামায শেষে) সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়ো। কেননা, তুমি (নামাযের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করায় যেনো) নামায পড়েনি। লোকটি তৃতীয়বারে বললো, আমাকে (নামায পড়া)

শিথিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে তখন প্রথমে তুমি যথানিয়মে পূর্ণরূপে অযু করবে। এরপর তুমি সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর (দ্বিতীয়) সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলবে; এমনকি (দ্বিতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার নামাযের সকল কাজ সম্পন্ন করবে।

এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাষায় নামায শিক্ষা দিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসার কথা নেই; বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুঝা গেলো, এ সময় বসাটা নামাযের স্বাভাবিক নিয়ম নয়; বরং দাঁড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। কারণ, এটা মৌখিক নির্দেশনামূলক হাদীস, যার উপর আমল করা অপরিহার্য।

সহীহ বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً. فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ
أُحْمَقُ. فَقَالَ: تَكَلَّمَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (২)

অর্থাৎ ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে নামায পড়লাম। তিনি (চার রাকআত নামাযে মোট) বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললাম, লোকটি তো আহমক ও বোকা! (যে নামাযের নিয়ম কানুনও জানে না) তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক!) এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই সুন্নাত!

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে জালসাতুল ইস্তিরাহাত (বিশ্রামের বৈঠক) সুন্নাত নয়; বরং না করাই সুন্নাত। কেননা, যদি এটা সুন্নাতই হতো তাহলে চার রাকআত নামাযে মোট তাকবীর

সংখ্যা হতো চব্বিশটি। যেহেতু এটা সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের প্রত্যেক উঠাবসায় একবার তাকবীর বলতেন।

যেমন সহীহ বুখারীতে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ. فَأُخْبِرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَا أُمَّ لَكَ. (১)

অর্থাৎ ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাকামে ইবরাহীমের নিকট এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকার সময় এবং দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলছে। আমি ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে এ কথা জানালে তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও! এটাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায নয়?

এছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক উঠাবসায়ই তাকবীর বলতেন এবং এ মাসআলায় কারো কোনো মতভেদ নেই।

এখন আমরা মূল মাসআলা দেখি। যদি প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে দাঁড়ানোর পূর্বে বৈঠক করা স্বাভাবিক সুন্নাতই হতো তাহলে চার রাকআত নামাযে মোট তাকবীর সংখ্যা হতো চব্বিশটি। কারণ, সিজদা থেকে উঠে বসার জন্য একবার তাকবীর বলতে হবে আর বসা থেকে দাঁড়ানোর জন্য একবার। (যেখানে আমরা শুধু এক তাকবীর বলে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাই।) যেহেতু পূর্বের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নামাযের প্রত্যেক উঠাবসায় তাকবীর বলা সুন্নাত। সুতরাং লা-মাযহাবীদের দাবি অনুযায়ী যেহেতু প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে প্রথমে বসা তারপর দাঁড়ানো দু'টি কাজ বিধায় উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক তাকবীর বলা সুন্নাত হওয়া উচিত। এতে চার রাকআত নামাযে মোট চব্বিশটি তাকবীর হয়। অথচ পূর্বে বুখারীর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

নামাযে মোট বাইশটি তাকবীর ছিলো। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে বৈঠকটি স্বাভাবিক সুন্নাত নয়; বরং অসুস্থতা বা কোনো ওয়র থাকলেই কেবল এ বৈঠক করা যায়। এ ব্যাখ্যা মেনে নিলেই কেবল সবগুলো হাদীসের উপর সুন্দরভাবে আমল করা সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়।

সুনানে আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عِيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ... ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكَ، ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ. (২)

অর্থাৎ আব্বাস বা আইয়াশ বিন সাহল সাইদী থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে তার পিতা সাহল রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। এছাড়াও মজলিসে ছিলেন আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু হুমাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু উসাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু.....। (আবু হুমাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে শেষের দিকে বললেন,) এরপর তিনি তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে গেলেন, মাঝে বসলেন না। এরপর বাকী হাদীসটুকু বর্ণনা করলেন।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

২ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১০০ হাদীস নং ৭৩৩ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৭৪ হাদীস নং ৪৪৯ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

এ হাদীসটি শুধু একজন সাহাবীরই বর্ণনা নয়; বরং এতে আরো তিনজন সাহাবীর সমর্থনও রয়েছে। তাই মাসআলাটি এতে আরো বেশী মযবুত ও দৃঢ় হলো

মুসনাদে আহমাদে হাসান সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ، اجْتَمِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ أَعَلَّامَكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ بِالْمَدِينَةِ.... ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَاثْتَهَضَ قَائِمًا. (১)

অর্থাৎ আ. রহমান বিন গানাম বর্ণনা করেন যে, আবু মালেক আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, হে আশআরী সম্প্রদায়! তোমরা সবাই একত্রিত হও এবং তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকেও একত্রিত করো। আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায শিখাবো, যে নামায তিনি আমাদেরকে নিয়ে মদীনা শরীফে পড়েছেন। তারপর (রুকূর পর) তিনি তাকবীর বলে ঝুঁকে সিজদায় চলে গেলেন। তারপর তাকবীর বলে স্বীয় মাথা উঠালেন। এরপর তাকবীর বলে ফের সিজদায় গেলেন। এরপর তাকবীর বলে উঠে (দ্বিতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়িয়ে গেলেন।

এ হাদীসটির সনদের সব রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। শুধু শাহর বিন হাওশাব নামক রাবী হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী, যার বর্ণিত হাদীস হাসান ও প্রমাণযোগ্য বলে স্বীকৃত।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده حسن. (২)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

১ মুসনাদে আহমাদ : ৫/৩৪৩ হাদীস নং ২২৯০৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৭৪ হাদীস নং ৪৫০ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

এতোক্ষণ পর্যন্ত সহীহ ও হাসান সনদে প্রমাণিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশনা এটাই যে, সিজদা থেকে উঠে সরাসরি দাঁড়াবে। মাঝে বিশ্রামের জন্য বসবে না। তবে অসুস্থ ও মায়ূর হলে ভিন্ন কথা।

এখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর আমল ও ফতোয়া এবং উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের আমল বর্ণনা করবো। এতে মাসআলাটি আরো সুদৃঢ় ও মযবুত হবে এবং তা রহিত হওয়ার ক্ষীণতম সংশয়টুকুও দূরভিত হয়ে যাবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ
قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رُكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ. (৩)

অর্থাৎ নূমান বিন আবী আইয়াশ রহ. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক সাহাবীকে পেয়েছি। সুতরাং যখন তাঁরা প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে সিজদা থেকে স্বীয় মাথা উঠাতেন তখন সেভাবেই সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বসতেন না।

এ হাদীসটির সনদ ভালো ও প্রমাণযোগ্য। আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده حسن. (৪)

অর্থাৎ এর সনদটি হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত)।

মু'জামে তাবরানীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩৩২ হাদীস নং ৪০১১ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৭৫, হাদীস নং ৪৫১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُذُورٍ قَدَمَيْهِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ. (১)

অর্থাৎ আবদা বিন আবী লুবাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আ. রহমান বিন ইয়াযীদ রহ.-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নামাযে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলাম, তিনি (দ্বিতীয় সিজদা শেষে সরাসরি) উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং মাঝে বসেন না। তিনি বলেন, প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে (না বসে সরাসরি) দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম হাইসামী রহ. হাদীসটি স্বীয় মাজমাউয যাওয়ায়েদে বর্ণনা করে বলেন:

ورجاله رجال الصحيح. (২)

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবী সহীহ হাদীসের রাবী।

ইমাম বাইহাকী রহ.ও নিজ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هو عن ابن مسعود صحيح. (৩)

অর্থাৎ এটা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে সহীহ (সনদে বর্ণিত) ও বিশুদ্ধ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُذُورٍ قَدَمَيْهِ. (৪)

১ মুজামে কাবীর, তাবরানী : ৯/৩০৬ হাদীস নং ৯৩২৭ (মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/৩২৬ হাদীস নং ২৮১২ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৩ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/১৮০ হাদীস নং ২৭৬৪ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ অহাব বিন কাইসান রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে দেখলাম, যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদা করতেন তখন স্বীয় দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন অর্থাৎ মাঝে বসতেন না।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (৫)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

সুনানে বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّيُوطِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُصَلِّي مِنْ قَبْلِ أَبْوَابِ كِنْدَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ. فَلَمَّا قَامَ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ قَامَ كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُومُ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ. فَحَدَّثْتُ بِهِ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُومُ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُومُ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩৩১ হাদীস নং ৪০০৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৭৫ হাদীস নং ৪৫৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُومُونَ عَلَى صُورِ
أَقْدَامِهِمْ فِي الصَّلَاةِ. (১)

অর্থাৎ সুলাইমান আমাশ রহ. বলেন, আমি উমারা বিন উমাইর রহ.-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি কুন্দা শহরের ফটকের পার্শ্বে (একস্থানে) নামায পড়ছেন। আমাশ বলেন, আমি তাকে দেখতে পেলাম, তিনি রুকু করলেন এরপর সিজদা করলেন। এরপর যখন শেষোক্ত (দ্বিতীয়) সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন (না বসে) যেমনি ছিলেন তেমনি সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন নামায শেষে ফিরে বসলেন তখন আমি (এভাবে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার) বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আ. রহমান বিন ইয়াযীদ রহ. আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নামাযে স্বীয় দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেছেন। ইমাম আমাশ রহ. বলেন, আমি এ হাদীসটি ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমাকে আ. রহমান বিন ইয়াযীদ রহ. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে অনুরূপই করতে দেখেছেন। এরপর আমি খাইসামা বিন আ. রহমান রহ. এর নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা-কে নামাযে স্বীয় দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। এরপর আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী রহ. এর নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি আ. রহমান বিন আবী লাইলা রহ.-কে দেখেছি তিনি স্বীয় দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে। এরপর আমি তা আতিয়া আওফী রহ. এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে নামাযে স্বীয় পা'সমূহের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।

দারুল হাদীস কায়রো থেকে প্রকাশিত সুনানে বাইহাকীর তালীকে (টীকায়) আল্লামা ইসলাম মানসূর আ. হামীদ রহ. বলেন:

(২) صحيح.

অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীস।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত বর্ণনায় মোট পাঁচটি আসার তথা মাওকুফ হাদীস এসেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র পঞ্চম হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন:

(৩) وعطية العوفي لا يحتج به.

অর্থাৎ আতিয়া আউফী রহ. বর্ণিত হাদীস প্রমাণের উপযুক্ত নয়।

এতে বুঝা যায়, প্রথম চারটির ব্যাপারে ইমাম বাইহাকী রহ. এরও কোনো আপত্তি নেই যে, তা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। নতুবা হানাফীদের পক্ষের কোনো হাদীসে সামান্যতম সমস্যা থাকবে, যদিও তা বাস্তবে কোনো গ্রহণ করার মতো সমস্যা নয় অথচ ইমাম বাইহাকী এ ব্যাপারে আপত্তি তুলবেন না তা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তাই হানাফীদের পক্ষের কোনো হাদীস বর্ণনা করে ইমাম বাইহাকীর নীরবতা অবলম্বন করাও তা বিশুদ্ধ ও প্রমাণযোগ্য হওয়ার একটি প্রমাণ।

এখানে তিনি পঞ্চম বর্ণনাটির রাবী আতিয়া রহ. এর ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা ঐক্যমত সমর্থিত নয়; বরং ইমাম ইবনে সাদ রহ., ইমাম ইবনে মাঈন রহ., ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ., ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহ.-সহ জগদ্বিখ্যাত হাদীস বিশারদদের অনেকেই তাঁকে সত্যবাদী ও হাদীসের উপযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন।^(৪)

সুতরাং তার হাদীস হাসান পর্যায়ে নিচে কিছুতেই হতে পারে না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ

بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. (৫)

২ সুনানে বাইহাকী (তালীক) : ২/২৬৯ হাদীস নং ২৭৬৪ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৩ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/১৮১ হা. নং ২৭৬৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ তাহযীবুত তাহযীব : ৩/১১৪-১১৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩৩০ হাদীস নং ৪০০০ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ উবাইদ বিন আবুল জাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বীয় দু'পায়ের মাথায় ভর দিয়ে নামাযে (দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য) উঠে দাঁড়াতেন।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সিকা (নির্ভরযোগ্য) ও সাদুক (সত্যবাদী)।

প্রথম রাবী অকী রহ.। তিনি তো হাদীসশাস্ত্রের ইমাম।^(১) আর দ্বিতীয় রাবী মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল ওয়াসেতী রহ.। তিনিও সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমনটি বলেছেন ইমাম ইসহাক বিন মানসূর রহ., ইমাম ইবনে মাজীন রহ. সূত্রে ইমাম দারেমী রহ., ইমাম আবু দাউদ রহ., ইমাম নাসায়ী রহ.-সহ প্রমুখ। ইমাম অকী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন, যদি কেউ আবদালের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সে হবে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল ওয়াসেতী।^(২) তৃতীয় রাবী ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ রহ.। তিনিও সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমনটি বলেছেন ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম ইবনে মাজীন রহ., ইমাম ইজলী রহ., ইমাম ইবনে হিব্বান রহ.-সহ প্রমুখ।^(৩) চতুর্থ রাবী হলেন উবাইদ বিন আবুল জাদ রহ.। তিনিও সিকা রাবী। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে কিতাবুস সিকাত অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীদের নিয়ে লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করে সিকা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।^(৪)

প্রমাণিত হলো, এ হাদীসের সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এর সনদ সহীহ ও হাদীসটি প্রমাণযোগ্য।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَاطِلُونَ يَغْنِي إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.^(৫)

১ তাহযীবুল কামাল : ৩০/৪৭৩ জীবনী নং ৬৬৯৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

২ প্রাগুক্ত : ২৭/৩২-৩৩ জীবনী নং ৫৭০৪

৩ প্রাগুক্ত : ৩২/১৩১ জীবনী নং ৬৯৮৮

৪ প্রাগুক্ত : ১৯/১৯৫ জীবনী নং ৩৭১০

৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৩৩১-৩৩২ হাদীস নং ৪০০৯ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাশায়েখ অর্থাৎ সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণ (দ্বিতীয় সিজদার শেষে সরাসরি উঠে দাঁড়াতে) কোন সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্ধে থাকতেন না। অর্থাৎ তাদের কেউ যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে স্বীয় মাথা উঠাতেন তখন সে অবস্থা থেকে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। (মাঝে বিশ্রামের জন্য) বসতেন না।

এ হাদীসটির সনদ হাসান, যা প্রমাণযোগ্য। কেননা, ইয়াযীদ বিন হারুন রহ. (যার উপনাম আবু খালেদ ওয়াসেতী) সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী ^(৬) হলেও মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামা লাইসী রহ. ঐ পর্যায়ের সিকা নয়; বরং তার থেকে একটু নিম্নমানের। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহ., ইমাম আবু হাতেম রহ., ইমাম নাসায়ী রহ., ইমাম ইবনে আদী রহ.-সহ প্রমুখ তাঁকে হাদীসের উপযুক্ত এবং তার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই বলেছেন। বরং ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাজীন রহ., ইমাম ইবনে আবী মারইয়াম রহ. এবং এক বর্ণনায় ইমাম নাসায়ী রহ. তাকে সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী পর্যন্ত বলেছেন। ^(৭) আর ইমাম যুহরী রহ. তো যুহরীই। তার ব্যাপারে মন্তব্য করার কিছু নেই।

সুতরাং এ সনদটি সহীহ না হলেও হাসান হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ
عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. ^(৮)

অর্থাৎ আবু আতিয়া থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা ও আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা-ও তা করতেন। অর্থাৎ সিজদা শেষে না বসে প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন।

৬ তাহযীবুল কামাল : ৩২/২৬৬-২৬৯ জীবনী নং ৭০৬১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৭ প্রাগুক্ত : ২৬/২১৬-২১৭ জীবনী নং ৫৫১৩ আল কামেল, ইবনে আদী : ৬/২২৪-২২৫ জীবনী নং ৭২/১৬৯৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৮ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ২/১৭৯ হাদীস নং ২৯৬৮ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

এ হাদীসটির সনদও সহীহ। আ. রাযযাক রহ., সুফইয়ান সাওরী রহ. ও আমাশ রহ. এ তিনজন তো হাদীসশাস্ত্রের ইমাম, যাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আর আবু আতিয়া, যার নাম আমর বিন আবী জুনদুব, তিনিও সিকা রাবী। ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে সিকা ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেন, তার হাদীসে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং এ হাদীসের সনদটিও সহীহ বলে প্রমাণিত হলো।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرُّكْعَةِ
الثَّالِثَةِ..... إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي
نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ. قَالَ عَطَاءٌ: تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى
ذَلِكَ. (১)

ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আতা রহ. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুআবিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে তৃতীয় রাকআতে দেখতে পেলেন.... যখন তিনি স্বীয় মাথা সিজদা থেকে উঠালেন তখন দেরী করলেন না। তিনি বলেন, দাঁড়ানোর জন্য তাকবীর বলতে বলতে উঠে গেলেন। আতা রহ. বলেন, এতে আমি আশ্চর্যবোধ করেছিলাম। পরে আমি (হাদীস সম্বন্ধে অবগত হলে) জানতে পারলাম, সেটাই সঠিক পদ্ধতি ছিলো।

এ হাদীসটির রাবী তিনজন আ. রাযযাক রহ., ইবনে জুরাইজ রহ. ও আতা রহ. হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও ইলমী জগতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বত্রয়। সুতরাং এ সনদটিও নিঃসন্দেহে সহীহ।

আমরা আলোচনা এখানেই শেষ করছি, নচেৎ এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস ও আসার রয়েছে, যার সবগুলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পূর্ব আলোচনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ ও বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে সিজদা থেকে উঠে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও

নির্দেশ এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবা যথা আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, ইবনে যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, মুআবিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবার আমল। এছাড়াও আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু হুমাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মালেক আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ বহু সাহাবী এ পদ্ধতি ও নিয়মেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায বর্ণনা করে দেখিয়েছেন। সুতরাং লা-মাযহাবী কর্তৃক এসব প্রমাণিত সহীহ হাদীস ও আসার এবং প্রতিষ্ঠিত আমলকে ভুয়া ও মওযু বলা কতো বড় ধৃষ্টতার শামিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

২২ তম পাঠ:

(নামাযের প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে না বসে
দাঁড়ানো সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাজে ১ম ও ৩য় রাকআতে না বসে তিরের মত দাঁড়ানো পদ্ধতিটি একেবাহে ভুয়া। কোন জাল হাদীসেও নাই। ১ম ও ৩য় রাকআতে দারাবার পূর্বে বসতে হবে তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪১ পৃঃ ৭৮৫ নং হাদীস।

জবাব:

দ্বিতীয়বার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি! বুঝলাম না, ভুলকৃতভাবে নাকি ইচ্ছাকৃত? ভুলকৃত হলে তো ভুলই এবং এটাই স্বাভাবিক। তাদের তো সবকিছুতেই ভুলের ছড়াছড়ি। ভাষাগত ভুল, বানানে ভুল, বুঝা ও সমঝে ভুল, উদ্ধৃতিতে ভুল, পুরো লিফলেট জুড়ে শুধু ভুলই ভুল। আর ইচ্ছাকৃত হলে তা সম্ভবত বাংলাদেশের হুজুরদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ভুয়া মাসআলার তালিকা ও ফিরিস্তি আরো দীর্ঘায়িত করার হীন উদ্দেশ্যে। আল্লাহই ভালো জানেন। এ প্রশ্ন ও অভিযোগটির জবাব পাঠকবর্গ ২১তম পাঠ থেকে অবগত হয়েছেন।

২৩ তম পাঠ: (সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সূরা ফাতিহার শেষে নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা মুহাদ্দিসগণের নিকট যঈফ এবং অনেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, ইমাম তিরমিযি ও ইমাম দারকুতনি একই মন্তব্য করেছেন। সূরা ফাতিহা শেষে শব্দ করে আমীন বলতে হবে হাজার হাজার সহীহ হাদীস বিদ্যমান। যা এখনো মক্কা ও মদিনায় প্রচলন আছে। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১২০ পৃঃ ৫০২ নং অনুচ্ছেদ।

জবাব:

আমীন অর্থ ‘কবুল করুন’ যা একটি দুআ। আর দুআর অন্যতম একটি আদব হলো চুপিচুপি মিনতি সহকারে করা।

যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. (১)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভুকে মিনতি করে চুপিসারে ডাকো।

এ নীতি অবলম্বনেই হানাফীগণ আমীন জোরে না বলে আস্তে ও চুপিসারে বলাকে সুন্নাত বলেন। তথাপি আমীন আস্তে বলার পক্ষে অনেকগুলো সহীহ, হাসান হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এর আমল ও ফতোয়া পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সহীহ বুখারীতে আমীন বলার হাদীস আছে, কিন্তু আস্তে বা জোরে এর কোনো উল্লেখ নেই। পুরা বুখারীতে স্পষ্ট ভাষায় নিম্ন বা উচ্চ আওয়াযে আমীন বলার কোনো হাদীস নেই; বরং কিছু হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে না হলেও ইঙ্গিতে বুঝা যায় আমীন আস্তে বলাই সুন্নাত, জোরে নয়। আমরা বুখারী, মুসলিমের ইঙ্গিতবহু সেন্সকল হাদীসসহ অন্যান্য কিতাবের স্পষ্ট ভাষ্যের সহীহ, হাসান হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

এখানে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম বুখারী রহ. এর নিজস্ব ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত আর বুখারীতে বর্ণিত হাদীস এক জিনিস নয়। বুখারীর উচ্চমর্যাদা ও সাধারণভাবে বুখারী বলে বুখারীতে বর্ণিত হাদীসকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা মতবাদকে নয়। বুখারীর মান শুধু তার বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য ক্ষেত্রে নয়। ইমাম বুখারী রহ. অনেক সময় হাদীস উল্লেখ করার পূর্বে তার নিজস্ব ইজতিহাদানুসারে শিরোনাম স্থাপন করেন এবং তিনি মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার সুবাদে তাতে নিজের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেন। যদিও উক্ত শিরোনামে উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে তাঁর মত পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা এক্ষেত্রে কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ইমাম বুখারীর নিজস্ব মতবাদ নিজেদের মতের পক্ষে হলে তা বুখারীতে আছে বলে প্রচার করে। সাধারণভাবে বুখারীতে আছে বললে যেহেতু বুখারীতে বর্ণিত হাদীস বুঝায় তাই এতে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝে মনে করে যে, এ মাসআলাটি বুখারীর হাদীসে আছে। অথচ বাস্তবতা হলো, উক্ত মত বা মাসআলাটি বুখারীর হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত নেই; বরং উক্ত মতের ইঙ্গিতবহ বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কোনো হাদীস থাকে, যা থেকে ইজতিহাদ ও গবেষণা করে ইমাম বুখারী রহ. কোনো একটি মাসআলা বের করে তা শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেন। আর সে শিরোনামে উল্লেখিত মাসআলাকেই বুখারীর নামে প্রকারান্তরে বুখারীর হাদীস বলে প্রচার করা হয়।

পাঠক! ভেবে দেখুন, বুখারীর হাদীস আর বুখারীর গবেষণালব্ধ মত কি এক জিনিস? দু'টির মাঝে কতো ফারাক রয়েছে! আমীন জোরে বলা নিয়ে বুখারীর নামে এ নাটকই করা হয়েছে। আমরা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (১)

১ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৬১ হাদীস নং ৭৮২ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এ হাদীস থেকে আমীন আন্তে বলার বিষয়টি দু’ভাবে প্রমাণিত হয়।

এক: হাদীসে বলা হয়েছে যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। এতে বুঝা যায়, ইমাম সূরা ফাতিহা জেহরী কিরাতবিশিষ্ট নামাযসমূহে জোরে পড়ায় মুক্তাদীদের আমীন বলা ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এরপর ইমাম ও মুক্তাদী সবাই আন্তে আমীন বলবে। কারণ, ইমামের আমীন উচ্চস্বরে পড়া যদি অনুমোদিতই হতো তাহলে হাদীসে মুক্তাদীদের আমীন বলা ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার সাথে সম্পৃক্ত করা হতো না; বরং হাদীসের ভাষ্য ও বর্ণনামূলক হিসেবে এভাবে বলা হতো ‘আর যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে’ যেরকমভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে, ‘যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরা (মুক্তাদীরা) তাকবীর বলো এবং ইমাম যখন রুকু করে তোমরা তখন রুকু করো’ ইত্যাদি। মোটকথা ইমাম যেগুলো উচ্চস্বরে আদায় করে একমাত্র তার সাথেই মুক্তাদীর করণীয় কোনো কর্মকে সম্পৃক্ত করা যায়। সঙ্গত কারণেই ইমাম যেহেতু সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়ে বিধায় মুক্তাদীদের আমীন বলা সূরা ফাতিহা শেষ করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যদি আমীন বলা উচ্চস্বরে পড়ার নিয়ম থাকতো তাহলে উক্ত হাদীসে এভাবে নির্দেশ দেয়া হতো ‘আর ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরা তখন আমীন বলবে।’ কিন্তু সুন্নাহ যেহেতু আমীন আন্তে বলা, যা মুক্তাদীরা সবাই গুনতে পায় না বিধায় এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য যে, একটি বর্ণনায়^(২) ‘আর যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলো’ বাক্যটি থাকলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ব্যাখ্যাকারগণ তা রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ এর অর্থ হবে- আর যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ বলে আমীন বলার প্রস্তুতি গ্রহণ ও ইচ্ছাপোষণ

করবে। এটা এমনই যেমন কুরআনে বলা হয়েছে 'যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দু'হাত কুনই পর্যন্ত ধৌত করো এবং মাথা মাসেহ করো এবং সাথে দু'পা ধৌত করো।' ^(১) এখানে বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, নামাযে দাঁড়ানোর পরই অযুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকল মুফাসসিরীনের ঐক্যমতে এখানে বাহ্যিক অর্থ নয়; বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য, যার অর্থ হবে 'যখন তোমরা নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করবে.....।' এখানেও বিষয়টি এমনই। হাফেয ইবনে হাজার রহ., হাফেয সূযুতী রহ., আল্লামা নিমবী রহ.-সহ প্রমূখ হাদীস বিশারদগণ হাদীসটির এ অর্থই করেছেন। ^(২)

দুই: হাদীসে বলা হয়েছে, 'কেননা, যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' আর এটা জানা কথা যে, তাঁরা আমীন জোরে বলেন না; বরং আন্তেই বলেন। নচেৎ আমরা তাঁদের আমীন বলার আওয়ায শুনতে পেতাম। সুতরাং ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্যতা তৈরি করতে হলে তাঁদের মতো আমাদেরও আন্তেই আমীন বলতে হবে। সুতরাং এ হাদীস থেকে ইঙ্গিতে আমরা আমীন আন্তে বলার বিষয়টিই বুঝতে পারলাম, জোরে বলা নয়।

অন্য একটি হাদীসে তো ইমাম ও ফেরেশতাদের আমীন বলার কথাটি আলাদাভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

যেমন মুসনাদে আহমাদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ^(৩)

১ সূরা মায়েদা : আয়াত নং ৬

২ ইলাউস সুনান : ২/২৪৫ হা. নং ৭২০ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

৩ মুসনাদে আহমাদ : ২/২৩৩ হাদীস নং ৭১৮৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বলো। কেননা, (তখন) ফেরেশতারা আমীন বলে এবং ইমামও আমীন বলে। সুতরাং যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সনদের বিচারে হাদীসটির সনদ অত্যন্ত সহীহ।

আল্লামা শুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের টিকায় লিখেন:

إسناده صحيح على شرط الشيخين^(৪)

অর্থাৎ এর সনদ বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح.^(৫)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায়, ইমাম ও ফেরেশতারা আন্তেই আমীন বলবে। কেননা, যদি তাঁদের আমীন জোরে বলাই সুন্নাত ও নিয়ম হতো তাহলে একথার কোনো অর্থ থাকে না যে, ‘কেননা (তখন) ফেরেশতারা আমীন বলে এবং ইমামও আমীন বলে।’ যেহেতু তাঁরা জোরে আমীন বললে সবাই তা শুনতেই পেতো, আলাদাভাবে এ কথা বলার প্রয়োজনীয়তা থাকতো না যে, তাঁরা আমীন বলে। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তাঁরা আমীন আন্তে বলেন, যা সকলেই শুনতে পায় না বিধায় তাদের আমীন বলার বিষয়টি হাদীসে আলাদাভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেলো, আমীন আন্তে বলাই সুন্নাত।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرِمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلَا

الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (নামায) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, ইমামের সাথে কোনোকিছুতে তাড়াতাড়ি করো না। ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বলো। যখন সে ‘ওয়ালায যাল্লীন’ বলে তখন তোমরা আমীন বলো। যখন সে রুকু করে তখন তোমরা রুকু করো। আর যখন সে ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে তখন তোমরা ‘আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ’ বলো।

এ হাদীসে মুক্তাদীর সব কাজকেই ইমামের পরে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চাই তাকবীর হোক বা আমীন, রুকু হোক বা তাহমীদ। মোটকথা ইমামের আগে কোনো কাজ করতে পারবে না। হয় একসাথে করবে, না হয় ইমামের পরে করবে। কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুক্তাদীর কোনো একটি কর্মও উচ্চস্বরের নয়। কী তাকবীর, কী তাহমীদ, কী আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়া আর কী সালাম ফিরানো -সবগুলো কাজই মুক্তাদীকে আস্তে আস্তে করতে হয়; উচ্চস্বরে বলার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং হাদীসের নির্দেশ তাকবীর ও তাহমীদের মতো আমীনও নিম্নস্বরে বলাটাই উচিত ও যুক্তিযুক্ত। যাতে মুক্তাদীর জন্য পালনীয় সবগুলো বিধানের ক্ষেত্রে একই রূপ ও নিয়ম প্রযোজ্য হয়। আর এটাই হাদীসের ভাষ্যের দাবি।

সুনানে আবু দাউদে প্রমাণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ سَمُرَةَ
بْنَ جُنْدَبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكُرَا. فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتَيْنِ: سَكَّةٌ إِذَا كَبَّرَ وَسَكَّةٌ إِذَا فَرَعَ مِنْ
قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ

بُنْ حُصَيْنٍ. فَكُتِبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَنٍ كَعْبٍ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمْرَةَ قَدْ حَفِظَ. (২)

অর্থাৎ হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত যে, সামুরা বিন জুনদুব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু পরস্পরে আলোচনা করছিলেন। সামুরা বিন জুনদুব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (নামাযে) দু'বার কিছুক্ষণ নীরব থাকার বিষয়টি ইয়াদ রেখেছেন। এক: যখন (নামায শুরু করার সময়) তাকবীরে তাহরিমা বলেন। দুই: যখন তিনি 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন' পড়া শেষ করেন। সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এটা স্মরণ রাখলেও ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তা অস্বীকার করলেন। তখন তারা উভয়ে এ বিষয়ে (পারম্পারিক মতানৈক্যের সমাধানকল্পে) বিখ্যাত সাহাবী উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট পত্র লিখলেন। পরে তাদের জবাবে প্রেরিত চিঠিতে লিখা ছিলো যে, সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (ঠিকই) ইয়াদ রেখেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দু'বার কিছুক্ষণ চুপ ও নীরব থাকার কথাটি সঠিক, যা সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন:

حديث سمرة حديث حسن. (৩)

অর্থাৎ সামুরার হাদীসটি হাসান তথা প্রমাণযোগ্য হাদীস।

মুল্লা আলী কারী রহ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মন্তব্য নকল করে বলেন:

رواه أبو داؤد وسنده حسن بل صحيح. (৪)

অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান; বরং সহীহ।

২ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১০৫ হাদীস নং ৭৭৯ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

৩ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৬২ হাদীস নং ২৫১ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

৪ মিরকাত শরহ মিশকাত : ২/৫০২ হাদীস নং ৮১৯ সংশ্লিষ্ট (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

মুন্না আলী কারী রহ. বলেন:

وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة والأصح صحة سماعه منه... وقال

بعض الحفاظ: صح الحديث عن سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين.^(১)

অর্থাৎ সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাসান বসরী রহ. এর হাদীস শুনা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে তাঁর থেকে তাঁর (হাদীস) শ্রবণের মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কতিপয় হাফেযে হাদীস বলেন, সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু- এ তিনজন থেকে (সম্মিলিতভাবে) বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ ও সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. এ হাদীসটির ব্যাপারে বলেন:

إسناده صالح.^(২)

অর্থাৎ এর সনদ (দলীলের) উপযোগী।

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষে স্বশব্দে আমীন বলতেন না; বরং নীরবে বলতেন। কেননা, স্বশব্দে জোরে আমীন বললে তো সূরা ফাতিহা পরবর্তী চুপ ও নীরব থাকা হলো না। অথচ এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করার পর সামান্য সময় চুপ থাকতেন। আবার অন্য হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়ার পর আমীন বলতেন। সুতরাং উভয় হাদীসের সমষ্টিতে অর্থ দাঁড়ায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়ে নিঃশব্দে আমীন বলতেন। যেরকমভাবে তাকবীরে তাহরিমা পরবর্তী কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি সানা ও আউযু, বিসমিল্লাহ সব পড়তেন, কিন্তু তা হতো নিঃশব্দে। ঠিক সেরকমভাবে সূরা ফাতিহা পরবর্তী কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি আমীন বলতেন, কিন্তু তা ছিলো নীরবে ও নিম্নস্বরে।। এতে যেমন উক্ত দু'সময়ে সানা, আউযু-বিসমিল্লাহ ও আমীন পড়া হয় তেমনি আন্তে পড়ায় ঐসময় নীরব থাকাও সাব্যস্ত হয়, যা সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস থেকে প্রমাণিত।

১ প্রাণ্ড :

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৪২ হাদীস নং ৩৮২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

মুত্তাদরাকে হাকিমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمَّشٍ الْعَدْلُ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" قَالَ: آمِينَ، يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ. (৩)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়েছেন। যখন তিনি ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ বললেন তখন নিম্নস্বরে আমীন বললেন।

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. (৪)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ ও সহীহ হাদীস।

হাফেয যাহাবী রহ. এ মন্তব্য সমর্থন করে কিতাবের নিচে সংযুক্ত আত তালখীসে বলেন:

على شرط البخارى ومسلم. (৫)

অর্থাৎ (ঠিক আছে, এটা বাস্তবেই) বুখারী, মুসলিমের শর্তানুপাতে (সহীহ)।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح وفي متنه اضطراب. (৬)

৩ মুত্তাদরাকে হাকিম : ২/২৫৩ হাদীস নং ২৯১৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ প্রাণ্ড

৫ প্রাণ্ড

৬ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৪৪ হাদীস নং ৩৮৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

অর্থাৎ এর মতন তথা মূলপাঠে কিছু ইখতিলাফপূর্ণ ভাষ্য থাকলেও এর সনদ সহীহ।

ইমাম দূলাবী রহ. রচিত ‘কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَقَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: أَنبَأَ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنُ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَكْنٍ حُجْرٍ بْنِ عُنْبَسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَّغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ. وَقَرَأَ "غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَقَالَ: آمِينَ، يَمْدُ بِهَا صَوْتُهُ. مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا. (১)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যখন তিনি নামায শেষ করতেন। এমনকি আমি এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে তাঁর চোয়াল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। আর যখন ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন’ পড়ে আমীন শব্দ বলেছেন তখন তা একটু স্বশব্দে পড়েছেন। আমি মনে করি, তিনি আমাদের (এভাবে আমীন শব্দ একটু উচ্চস্বরে পড়ে) শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

فيه يحيى بن سلمة- قواه الحاكم وضعقه جماعة. أثار السنن. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وفي كتاب الضعفاء، كذا في التهذيب. وبقيّة رجاله ثقات. (২)

অর্থাৎ এ সনদে ইয়াহইয়া বিন সালামা নামক একজন রাবী আছে, ইমাম হাকিম রহ. যাকে শক্তিশালী রাবী বললেও একদল মুহাদ্দিসীন তাকে যঈফ রাবী বলেছেন। দেখুন আসারুস সুনান। আমি বলি, ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে

১ কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা : ২/৬১০ হাদীস নং ১০৯০ (দারু ইবনি হযম, বৈরুত)

২ ইলাউস সুনান : ২/২৫২-২৫৩ হাদীস নং ৭৩০ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

(যেরকমভাবে) কিতাবুস সিকাত তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (যার দ্বারা বুঝা যায়, রাবীটি সিকা) এবং (তেমনি তাকে) কিতাবুয যুআফা তথা দুর্বল রাবীদের জীবনীগ্রন্থেও (উল্লেখ করেছেন)। আর বাকী অন্যান্য রাবীগণ সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

সুতরাং ইয়াহইয়া বিন সালামা সিকা হওয়ার ব্যাপারে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় কমপক্ষে তো সাদূক (সত্যবাদী) ও হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী হবে। বিধায় তাঁর বর্ণিত হাদীসটি হাসান হবে।

এ হাদীস থেকে জোরে আমীন বলার হাদীস ও আন্তে আমীন বলার হাদীসের মাঝে বিদ্যমান সাংঘর্ষিকতার একটি সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমীন স্বশব্দে বলেছেন- এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সার্বক্ষণিকের সূনাত নয়; বরং সাহাবীদের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তা ছিলো সাময়িক একটি আমল। স্বয়ং ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মন্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমীন আন্তে পড়ার নিয়ম থাকলেও সাহাবীদের শিক্ষাদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাময়িকভাবে আমীন জোরে বলেছিলেন।

মুসনাদে আহমাদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكَتَيْنِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيْئَةً. فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ. فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَبِي أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةٌ. (৩)

অর্থাৎ সামুরা বিন জুনদুব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি যখন তাদের (মুসল্লীদের) নিয়ে নামায পড়াতেন তখন (তাতে) দু'স্থানে (কিছুক্ষণ) নীরব থাকতেন। অর্থাৎ উচ্চ আওয়ায ও স্বশব্দে কিছু পড়তেন না। (এক) যখন নামায (তাকবীরে তাহরিমা বলে) শুরু করতেন। (দুই) যখন 'ওয়ালায ফাল্লীন' বলতেন তখনও কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। লোকজন তাঁর এ কর্মের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তিনি (এর মীমাংসার লক্ষ্যে) উবাই

বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট চিঠি লিখলেন। এরপর উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তাদের (আপত্তির জবাবে) লিখে পাঠালেন যে, সামুরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু যা করেছে সেটাই সঠিক ও সুন্নাত।

আল্লামা শুয়াইব আরনাউত রহ. এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে বলেন:

رجاله ثقات رجال الشيخين. (১)

অর্থাৎ এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য ও বুখারী, মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

إسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.ও এর সনদকে সহীহ বলেছেন। (৩)

মু'জামে তাবরানী কাবীরে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُضْرَمِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِأَمِينٍ. (৪)

অর্থাৎ আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (নামাযে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আউযু ও আমীন উচ্চ আওয়াযে তথা স্বশব্দে পড়তেন না।

এ হাদীসটির সনদ হাসান। এর সব রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র আবু সাদ বাক্কাল নামক রাবী কিছুটা বিতর্কিত।

১ প্রাণ্ড

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৪৩ হাদীস নং ৩৮৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ ইলাউস সুনান : ২/২৪৯ হা. নং ৭২৬ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৪ মু'জামে তাবরানী, কাবীর : ৯/৩০১-৩০২ হাদীস নং ৯৩০৪ (মাকতাবাতুল ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

আল্লামা হাইসামী রহ. স্বীয় মাজমাউয যাওয়ায়েদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس. (৫)

অর্থাৎ এতে আবু সাদ বাক্কাল নামক এক রাবী আছে, যিনি মুদাল্লিস হলেও নির্ভরযোগ্য রাবী।

এছাড়াও ইমাম আবু যুরআ রাযী রহ. বলেন, সে সাদুক (সত্যবাদী)। ইমাম আবু হিশাম রিফায়ী রহ. বলেন, সে সিকা রাবী। ইমাম শুবা রহ. (যিনি সিকা রাবী ছাড়া কারো হাদীস গ্রহণ ও শ্রবণ করেন না) তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ ও শ্রবণ করেছেন। তদ্রূপ ইমাম সুফইয়ান সাওরী রহ., ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ., ইমাম আমাশ রহ.-সহ প্রমুখ প্রাজ্ঞ ও আইম্মায়ে হাদীস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ তাঁকে যঈফও বলেছেন। সুতরাং এ রাবী উচ্চপর্যায়ের সিকা রাবী না হলেও হাসানুল হাদীস থেকে নিম্নপর্যায়ের হবে না। বিধায় হাদীসটি সহীহ না হলেও কমপক্ষে হাসান হবে। বিস্তারিত দেখুন : ইলাউস সুনান। (৬)

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী রহ. তাহযীবুল আসারের উদ্ধৃতিতে স্বীয় আল জাওহারুল্লাকীতে হাসান সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হলো:

أَنَا أَبُو كُرَيْبٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (هُوَ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَالُ) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِأَمِينٍ. (৭)

وقد رواه الطحاوى، وفيه: وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِأَمِينٍ. (৮)

৫ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/২৮১ হাদীস নং ২৬৩২ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৬ ইলাউস সুনান : ২/২৪৯-২৫০, হা. নং. ৭২৭ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৭ আল জাওহারুল্লাকী মাআল বাইহাকী : ২/৪৮ (মাজলিসু দাইরাতিল মাআরিফিনুমানিয়া, হায়দরাবাদ)

৮ শরহ মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২০৩-২০৪ হাদীস নং ১২০৮ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

অর্থাৎ আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও আমীন উচ্চস্বরে পড়তেন না।

তাহাবী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, আউযু ও আমীন উচ্চস্বরে পড়তেন না।

এ হাদীসটির সনদেরও একই অবস্থা। এতে দু'জন রাবী আবু কুরাইব ও আবু ওয়ায়েল তো সিকা রাবী। আর আবু বকর বিন আইয়াশের ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও তিনি বুখারীর রাবী হওয়ার সুবাদে যঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন। ইমাম ইবনে মুবারক রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাসীন রহ.-সহ অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন এবং তাকে সিকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আবু সাঈদ অর্থাৎ আবু সাদ বাক্কাল (যার আলোচনা কিছুপূর্বে গত হয়েছে) হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী। আরো দেখুন : ইলাউস সুনান।^(১)

সুতরাং এ হাদীসটিও পূর্বের মতো (এতে আবু সাদ বাক্কাল নামক রাবী থাকায়) হাসান হবে।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَمْسٌ يُخْفَيْنَ:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَالتَّعَوُّدُ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِينَ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ. (২)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাঁচটি জিনিস নিম্নস্বরে পড়তে হয়। (এক) সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা অর্থাৎ সানা। (দুই) আউযুবিল্লাহ। (তিন) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (চার) আমীন। (পাঁচ) আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ।

এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবীই হাদীসশাস্ত্রের ইমাম। সুতরাং এর সনদ নিঃসন্দেহে সহীহ ও বিশুদ্ধ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

১ ইলাউস সুনান : ২/২৫০ হা. নং ৭২৮ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

২ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ২/৮৭ হাদীস নং ২৫৯৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

إسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

ইমাম তাবারী রহ. বলেন:

وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه. وروى عن النخعي والشعبي وإبراهيم التيمي كانوا يخفون بأمين. والصواب أن الخبرين بالجر والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعله جماعة من العلماء وإن كنت مختاراً خفض الصوت بها. إذ كان أكثر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على ذلك. (৪)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও তা (আমীন আন্তে বলা) বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী রহ., ইমাম শাবী রহ., ইমাম ইবরাহীম তাইমী রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা নিম্নস্বরেই আমীন বলতেন। সঠিক কথা হলো, উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে বর্ণিত উভয় হাদীসটিই সহীহ এবং উভয় পদ্ধতিতেই উলামায়ে কিরাম আমল করেছেন। যদিও আমি নিম্নস্বরে আমীন বলার পক্ষপাতি। কেননা, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবয়ীন এ মতানুযায়ীই আমল করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. স্বীয় জামে তিরমিযীতে এ সংক্রান্ত দু'টি হাদীস এনেছেন। এক: ইমাম সুফইয়ান রহ. এর সূত্রে, যাতে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন জোরে/ টেনে পড়েছেন। দুই: ইমাম শুবা রহ. এর সূত্রে, যাতে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন আন্তে পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে হাদীস দু'টির ব্যাপারে নিজে কোনো মন্তব্য না করে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম আবু যুবআ রাযী রহ. এর মন্তব্য নকল করতঃ বলেন:

حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا. (৫)

অর্থাৎ এ ব্যাপারে শুবার হাদীসের চেয়ে সুফইয়ানের হাদীস অধিক বিশুদ্ধ।

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৪৬ হাদীস নং ৩৮৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ ইলাউস সুনান : ২/২৫৫ হাদীস নং ৭৩০ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৫ জামে তিরমিযী : পৃ. নং ৬২ হাদীস নং ২৪৮ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

লক্ষ্যণীয় যে, তাঁরা এ মন্তব্য করে এটা মেনে নিয়েছেন যে, সনদের বিচারে উভয় হাদীসই সহীহ। কেননা, কোনো সনদেই দুর্বল রাবী নেই। বিধায় এর কোনোটিই যঈফ নয়। আর হ্যাঁ, এটা একটা ইজতিহাদী ও গবেষণালব্ধ মাসআলা যে, কারো নিকট সুফইয়ানের হাদীস অধিক বিশুদ্ধ আর কারো নিকট শুবার হাদীস অধিক বিশুদ্ধ। হানাফী উলামায়ে কিরাম শুবার হাদীসকে অধিক বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়ে এর উপর আরোপিত সকল অভিযোগ সুন্দরভাবে খণ্ডন করে উল্টো সুফইয়ানের হাদীসের উপর অনেক আপত্তি তুলে ধরেছেন। বিস্তারিত দেখুন: আসারুস সুনান ও ইলাউস সুনান।^(১)

সবচে মজার ব্যাপার হলো, যে সুফইয়ান সাওরীর হাদীস নিয়ে এতো কথা ও মাতামাতি তিনি কিন্তু আমীন উচ্চস্বরে নয়; বরং নিম্নস্বরেই বলার প্রবক্তা।

ইমাম ইবনে মুনযির রহ. স্বীয় আল আওসাতে বলেন:

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: فَإِذَا فَرَّغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْ: آمِينَ

تُخَفِّئُهَا. (২)

অর্থাৎ ইমাম সুফইয়ান সাওরী রহ. বলেন, যখন তুমি সূরা ফাতিহা শেষ করবে তখন নিম্নস্বরে আমীন বলবে।

রাবী (বর্ণনাকারী) ফকীহ ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও যখন নিজ বর্ণনানুসারে আমল না করে; বরং এর বিপরীত আমল করেন বা ফতোয়া দেন তখন স্বভাবতই বুঝা যায় যে, এতে অবশ্যই কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ও কারণ আছে। এটাই প্রবল ধারণা যে, বিধানটি ছিলো সাহাবীদের শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে সাময়িক একটি আমল, স্থায়ী কোনো সুন্নাত নয়। যেমনটি ইমাম দূলাবী রহ. রচিত ‘কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। (বর্ণনাটি পূর্বে গত হয়েছে) অথবা এটাও হতে পারে, যে বর্ণনায় ۞ শব্দ এসেছে এর অর্থ যেমন একটু জোরে পড়া ব্যবহৃত হয় তেমনি টেনে পড়া অর্থাৎ মদ সহকারে পড়াও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখানে এ দ্বিতীয় অর্থটিই হয়তো উদ্দেশ্য হবে,

১ ইলাউস সুনান : ২/২৫১-২৫৯ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী) আসারুস সুনান : পৃ. নং ১৪৪-১৪৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

২ আল আওসাত, ইবনে মুনযির : ৩/২৯৫ হাদীস নং ১৩৬৫ সংশ্লিষ্ট (দারুল ফালাহ, ফাইয়ুম)

যার অর্থ দাঁড়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন শব্দকে টেনে পড়লেন অর্থাৎ আমীন এর হামযাকে এক/তিন আলিফ মদসহ টেনে পড়লেন।

যাই হোক, আমীন আস্তে পড়া ও জোরে পড়া নিয়ে মতভেদ আছে ঠিক, কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী সালাফদের মধ্যে এ নিয়ে বিভেদ ছিলো না। বর্তমান লা-মাযহাবীদের মতো বিষয়টিকে এতো জটিল ও ঘোলাটে কেউ বানাননি। তাদের মতে আস্তে আমীন বলার হাদীসকে কেউ মানার অনুপোষিত ও পরিত্যক্ত বা যঈফ বলেননি; বরং উভয় ধরনের হাদীসগুলোকে সহীহ বা মানার উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে একদল উলামায়ে কিরাম সুফইয়ান সাওরীর হাদীস গ্রহণ করেছেন আর অন্যদল শুবার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

শেষকথা হলো, আমীন একটা দুআ। আর দুআ নিম্নস্বরে করা যে উত্তম এতে বোধহয় কারো মতভেদ নেই। তাই দুআর এ গুরুত্বপূর্ণ আদবের দিকে লক্ষ্য করে আমরা আমীন আস্তে বলাকেই উত্তম মনে করি।

২৪ তম পাঠ:

(তাশাহুদে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

বৈঠকে বসে সাহাদাত আঙ্গুল উঠানো এবং নামানো ভুল পদ্ধতি। কোন জাল হাদীস দারাও প্রমাণিত নয়। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে তাশাহুদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে হবে।

তিরমিযী মিনা প্রঃ ১৩৯ পৃঃ ২৭৫, ২৭৬ নং হাদীস।

জবাব:

এটা একটি ভুল ও মিথ্যা অপবাদ। পাঠক, আপনি বরং খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, এ লা-মাযহাবীরাই বৈঠকে বসে শাহাদাত আঙ্গুলি ধীরে ধীরে উঠানামা ও নাড়াচাড়া করায়। আর এর বিপরীত হানাফীগণ শুধু তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে বলেন। আর এটা সবাই জ্ঞাত যে, ইশারা (ইঙ্গিত) ও হরকত বা তাহরীক (নাড়াচাড়া করা) এক জিনিস নয়। হরকত হলো যা একমুহুর্তে শেষ হয়ে যায় না; বরং বারবার ক্রিয়াটি ঘটতে থাকে। আর ইশারা বা ইঙ্গিত হলো, যা দ্বারা কোনো কিছু দিকে একমুহুর্তে ইশারা করে বুঝানো হয়। সহজ কথায়, হরকত হলো দীর্ঘ সময়ব্যাপী আর ইশারা হলো মুহুর্তকাল বা স্বল্প সময়ব্যাপী। সুতরাং তাশাহুদে শুরু থেকে নিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি পর্যন্ত আঙ্গুল নাড়ানোকে ইশারা বলা যায় না, একে বলে হরকত। আর লা-মাযহাবীরা এ হরকতেরই নাম দিয়েছে ইশারা এবং এভাবে বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানোকেই ইশারা মনে করে। অথচ হরকত ও ইশারার মাঝে কত বিস্তর ব্যবধান! হাদীসে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা এসেছে, হরকত (যার অর্থ নাড়াচাড়া) করার কথা আসেনি; বরং তা নিষেধ করা হয়েছে।

হানাফী মাযহাব মতে তাশাহুদে মধ্যে কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথমংশ তথা ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা’ বলার সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আর দ্বিতীয়াংশ তথা ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় ইশারা বন্ধ করতঃ আঙ্গুল নামিয়ে নিবে। মূলত এক আঙ্গুল দ্বারা আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এ কথা বুঝানোর জন্যই ইশারা করা হয়। ইশারা করার সময় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির

সাথে মধ্যমাঙ্গুলি মিলিয়ে গোল বৃত্ত বানাবে। তারপর শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচিয়ে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এ দিকে ইঙ্গিত করতঃ ইশারা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও তাবেয়ীদের বাণী ও কর্মপন্থা থেকে এমনটাই প্রমাণিত হয়। নিম্নোক্ত হাদীস ও আসারসমূহ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট ও সুদৃঢ় হবে ইনশাআল্লাহ।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুআ করার জন্য (তাশাহুদদের বৈঠকে) বসতেন তখন ডান হাত স্বীয় ডান উরুর উপর এবং বাম হাত স্বীয় বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। (এ সময়) তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন এবং বাম হাতের তালু (বাম) হাঁটুর উপর রাখতেন।

সহীহ মুসলিমে এর পরবর্তী বর্ণনায় এসেছে:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسِطِهَا عَلَيْهَا. (২)

১ সহীহ মুসলিম : ১/২১৬ হাদীস নং ৫৭৯ (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা)

২ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৫৮০

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় যখন বসতেন (বৈঠক করতেন) তখন স্বীয় দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর আলতোভাবে ছড়িয়ে রাখতেন।

সুনানে আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَّتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ تَنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرُ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. (১)

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায দেখবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন? তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন। এরপর তাকবীরে তাহরিমা বললেন। এরপর তিনি বসলেন ও বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বাম হাতকে বাম রানের উপর এবং ডান হাতকে ডান রানের উপর রাখলেন এবং দু'আঙ্গুল তথা কনিষ্ঠ ও অনামিকাকে মুঠিবদ্ধ করে (বাকী আঙ্গুলগুলো দ্বারা) একটা বৃত্ত বানালেন।

(রাবী বলেন) আর আমি তাঁকে এভাবে করতে দেখেছি (বলে) বিশর নামক রাবীটি বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা দ্বারা একটা গোল বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।

লা-মাযহাবীদের বড় ইমাম শাইখ আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ। হাদীসটির গুরুতে (২) صحيح (বিশুদ্ধ) বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا إِذَا رَأَوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِأَصْبَعِيهِ ضَرْبُوا إِحْدَاهُمَا وَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. (৩)

অর্থাৎ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, সাহাবায়ে কিরাম যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখতেন যে, (নামাযে) সে দু'আঙ্গুল দ্বারা (ইঙ্গিত করতঃ) দু'আ করছে তখন তাঁরা একটা আঙ্গুলে আঘাত করে বলতেন, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) এক ইলাহ।

এ হাদীসের সনদে সব রাবীই সিকা ও ইমাম হওয়ায় সনদটি সহীহ ও বিশুদ্ধ। এ হাদীস থেকে জানা যায়, এক আঙ্গুলে ইশারা করার হাকীকত হলো, আঙ্গুলের ইঙ্গিতের দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِأَصْبَعِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ وَهُوَ التَّوْحِيدُ. وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِأَصْبَعِيهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ. (৪)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো (মুসল্লী) ব্যক্তি যখন নামাযে স্বীয় (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে তখন তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আর এটা হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি। তবে সে (দু'হাতের) দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে না। কেননা, তা মাকরুহ ও অপছন্দনীয়।

এ সনদের সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং সনদটি সহীহ ও বিশ্বস্ত। এটা বাহ্যতঃ একজন বিখ্যাত তাবেয়ীর বাণী হলেও তিনি যেহেতু অধিকাংশ সময় সাহাবীদের, বিশেষ করে আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ফতোয়াই বর্ণনা করেন বিধায় তা হাদীসে মাওকুফ তথা সাহাবীদের হাদীসের মর্যাদা রাখে। পূর্বের হাদীসে ইবনে সীরীন রহ. এর বর্ণনা থেকে এমনটাই বুঝা যায়।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يُحَرِّكُهَا. (১)

অর্থাৎ হিশাম বিন উরওয়া রহ. থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (উরওয়া রহ. যার আপন খালা হলেন আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা এবং যার অধিকাংশ ইলম শিক্ষা তাঁর খালা থেকেই অর্জিত) স্বীয় (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা (নামাযের) দুআয় অর্থাৎ শেষ বৈঠকে ইশারা করতেন, কিন্তু নড়াচড়া করাতেন না।

এ হাদীসের রাবীদ্বয় সিকা ও বিশ্বস্ত। সুতরাং সনদটি নিঃসন্দেহে সহীহ ও বিশ্বস্ত।

এ হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইশারা করার কথা এসেছে এবং হরকত তথা (আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীদের মতো) আঙ্গুল না নাড়ানোর কথা এসেছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَا هَكَذَا وَأَشَارَتْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ. (২)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এভাবে ডাকা পছন্দ করেন এবং তিনি এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।

এ সনদটির সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। অকী রহ. এবং মিসআর রহ. তো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম বলে স্বীকৃত। আর আবু আলকামা, যিনি ছিলেন আফ্রিকার বিচারক ও বনী হাশেমের আযাদকৃত দাস- তিনিও সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী।^(৩)

পূর্বোল্লিখিত হাদীস ও আসারগুলো থেকে প্রতীয়মান হলো যে, তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করা সুন্নাত। আর এ ইশারার হাকীকত ও বাস্তবতা হলো আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ইঙ্গিত করা। কিন্তু লা-মাযহাবীরা তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নাড়াচাড়া ও উঠানামা করতে থাকে- মূলত শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। হাদীসে আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদ বুঝানোর জন্য ইশারার কথা এসেছে, আঙ্গুল বারবার উঠানামা করার কথা নয়।

উল্লেখ্য যে, তাশাহহুদে যখন ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা’ পড়বে তখন স্বীয় আঙ্গুল উঠাবে এবং যখন ‘ইল্লাল্লাহ’ বলবে তখন আঙ্গুল নামিয়ে নিবে। কারণ, এটিই হলো একত্ববাদ ও তাওহীদের কালিমা। এজন্য ইশারা করার উপযুক্ত স্থান এটাই।

৩ তাকরীবুত তাহযীব : পৃ. নং. ৬৫৯ জীবনী নং ৮২৬২ শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত- (দারুল রশীদ, হালব)

২৫তম পাঠ

(দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

বেতের নামাযে উল্টা তাকবীর দেয়া ভুয়া পদ্ধতি। কোন সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। উল্টা তাকবীর দিতে হবে না।

জবাব:

প্রশ্নে উল্টা তাকবীর বলে দুআ কুনূত পড়ার পূর্বের তাকবীর বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, এ তাকবীরকে উল্টা তাকবীর নাম দিলো কে? প্রবল ধারণা এটাই যে, এটা লা-মাযহাবী কর্তৃক প্রদত্ত নাম। কেননা, এ নাম ও পরিভাষা না পূর্বের কোনো কিতাবে পাওয়া যায় আর না কখনো শ্রুত হয়েছে। অথচ দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর দেয়া বহু শীর্ষস্থানীয় অনুসরণীয় সাহাবা ও তাবেরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। মূলত দুআ কুনূত পড়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর দিয়েছেন কি দেননি তা পরিস্কারভাবে বর্ণিত না হলেও তাঁর অনুসরণীয় বিজ্ঞ সাহাবায়ে কিরামের আমলই এ ক্ষেত্রে মারফু হাদীসের (তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের) মর্যাদা ও মান রাখে। কেননা, উসূলে হাদীসের স্বীকৃত মূলনীতি হলো, সাহাবায়ে কিরামের কোনো আমল বা বাণী যখন কিয়াস ও ইজতিহাদ সম্পর্কিত হবে না এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো আমল কিংবা বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না এবং উক্ত সাহাবী ইসরাঈলী রেওয়াত বর্ণনা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হবে না তখন সাহাবীর উক্ত আমল বা বাণী মারফু হাদীসের মর্যাদা রাখবে। অর্থাৎ এটা যেনো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই আমল বা বাণী। কেননা, সাহাবীগণ হলেন সত্য-ন্যায়ের মাপকাঠি। সুতরাং তাঁদের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রকাশ পাওয়া অকল্পনীয়। আর তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণকারী। তাই এটা অসম্ভব একটি ব্যাপার যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোনো একটি আমল করতে দেখবেন বা তাঁর কোনো বাণী শুনবেন অথচ সে অনুপাতে আমল করবেন না!

কিন্তু সাহাবীর আমল বা বাণী মারফু হাদীসের মর্যাদা পাওয়ার জন্য তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে। কারণ, যদি তাঁর আমলটি এমন পর্যায়ে হয়, যাতে ইজতিহাদ ও কিয়াস করার অবকাশ থাকে তাহলে তাঁর উক্ত আমল বা বাণীটি মারফু হাদীসের মর্যাদা রাখবে না। কেননা, হতে পারে তা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ ও কিয়াস থেকে নির্গত বিধান। তদ্রূপ তাঁর বাণী বা আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও তা মারফু হাদীসের মর্যাদা রাখবে না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক উক্ত সাহাবীর আমল ও বাণীর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত হাদীস পৌঁছেনি; নতুবা হাদীস পৌঁছা সত্ত্বেও তার বিপরীত আমল কোনো সাহাবী থেকে কল্পনাও করা যায় না। তদ্রূপ যে সাহাবী ইসরাঈলী রিওয়ায়াত তথা তাওরাত-যাবূরের মাসআলা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হবেন তাঁর আমল ও বাণীও মারফু হাদীসের মর্যাদা রাখবে না। কারণ, হতে পারে তিনি কোনো উক্তি বা আমল ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে বলে তা বর্ণনা করবেন। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আমল বা উক্তি না করে থাকেন।

এখন আমরা তিনটি শর্ত পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়েছে এমন কয়েকটি সহীহ, হাসান সূত্রে সাহাবীদের আমল ও উক্তি বর্ণনা করবো, যাতে এ কথার প্রমাণ মিলে যে, দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা সুন্নাহসম্মত ও সাহাবীদের আমল, যা প্রকারান্তরে রাসূলেরই আমল। সাথে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের কিছু আসারও উল্লেখ করবো, যাতে বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হয়।

উল্লেখ্য যে, নামাযে তাকবীর বলা একটি ইবাদাত। আর ইবাদাতের মধ্যে কোনো কিয়াস ও ইজতিহাদ করা যায় না। আর দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর এ তাকবীর বলার বিষয়টি যেসকল সাহাবী (তথা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে তাঁরা কেউই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত বর্ণনা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। এখন আমরা সহীহ ও হাসান সূত্রে মারফু হাদীসের মর্যাদাপ্রাপ্ত মাওকুফ হাদীস ও আসারগুলো উল্লেখ করছি:

মুজামে কাবীরে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ
الْقِرَاءَةِ ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ وَرَكَعَ. (১)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (বিতরের নামাযে) যখন কিরাত পড়া শেষ করতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর যখন দুআ কুনূত পড়া শেষ করতেন তখন তাকবীর বলে রুকু করতেন।

আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন:

وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة لكنه مدلس. (২)

অর্থাৎ এ সনদে লাইস বিন আবী সুলাইম নামক একজন রাবী আছেন, যিনি মুদাল্লিস হলেও সিকা তথা নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

أخرج له مسلم واستشهد به البخارى فهو حسن الحديث. (৩)

অর্থাৎ ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ ইনি সহীহ মুসলিমের রাবী, যার মান সিকা বা কমপক্ষে হাসানুল হাদীস তথা সাদূক) আর ইমাম বুখারী রহ. তার হাদীস শাহেদ (অন্য হাদীসের সমর্থক ও সমর্থনকারী হাদীস) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ রাবীটি হাসানুল হাদীস পর্যায়ে রাবী হবে।

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ
طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ. فَلَمَّا
فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. (৪)

১ মুজামে কাবীর, তাবরানী : ৯/২৭৮ হাদীস নং ৯১৯২ (মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/৩২৯ হাদীস নং ২৮২৫ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৩ ইলাউস সুনান : ৬/৮৫ হাদীস নং ১৭০২ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

অর্থাৎ তারেক বিন শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআতে কিরাত শেষ করলেন তখন তাকবীর বলে দুআ কুনূত পড়লেন। এরপর (পুনরায়) তাকবীর বলে রুকু করলেন।

এ হাদীসের সনদটি সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

رواه الطحاوى، وإسناده صحيح. (৫)

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে দুআ কুনূত ফজরের নামাযে পড়ার কথা বলা হলেও মৌলিক ইখতিলাফ ও মাসআলা যেহেতু দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা যাবে কিনা- এ নিয়ে বিধায় হাদীসটি এ অধ্যায়ের উপযুক্ত।

এতে প্রমাণিত হলো যে, দুআ কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলা সুন্নাত। চাই তা বিতরের নামাযে পড়া হোক কিংবা ফজরের নামাযে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ. (৬)

অর্থাৎ আ. রহমান সুলামী রহ. থেকে বর্ণিত যে, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ফজরের নামাযে দুআ কুনূত পড়ার সময় তাকবীর বলতেন এবং রুকু করার সময় (পুনরায়) তাকবীর বলতেন।

এ হাদীসটির সনদ হাসান।

ইলাউস সুনানের হাশিয়ায় মুহাক্কিক বলেন:

وسنده حسن. وقد تكلم في عبد الأعلى بن عامر، قال الدار قطنی: يعتبر به. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه لين وهو ثقة صحيح له الطبري حديثا وحسن له الترمزي وصحيح له الحاكم وهو من تساهله، كذا في التهذيب. (৭)

৪ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৫০ হাদীস নং ১৪৮১ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৪২ হাদীস নং ৬৩৮ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্ত : ৫/৩৮ হাদীস নং ৭১০৮ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৭ ইলাউস সুনান (হাশিয়া) : ৬/৮৬ হাদীস নং ১৭০৩ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল করআন, করাচী)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান। (রাবীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র) আব্দুল আলা বিন আমের এর ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক আছে। ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায়। আর ইমাম ইয়াকুব বিন সুফইয়ান রহ. বলেন, তার হাদীসে সামান্য শিথিলতা আছে। তবে সে সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম তাবারী রহ. তার বর্ণিত একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান বলেছেন আর ইমাম হাকিম রহ.ও (তার বর্ণিত হাদীসকে) সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। যদিও ইমাম হাকিম রহ. এর উক্তি ও মন্তব্যে কিছুটা শিথিলতা আছে। তাহযীবুত তাহযীবে এমনই বলা হয়েছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجُهْمِ قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقُتَّ. (১)

وفي رواية بعدها: وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ. (২)

অর্থাৎ আবু জাহম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা (বিন আযেব) রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু দুআ কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর বলতেন। পরের বর্ণনায় আছে- এবং রুকূর সময় তাকবীর বলতেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দু'টিই সহীহ ও বিশুদ্ধ। প্রথম বর্ণনার রাবী ইবনে ফুযাইল, মুতাররিফ ও আবুল জাহম তিনজনই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। তদ্রূপ দ্বিতীয় বর্ণনার রাবী চতুষ্টয় তথা তাকী, সুফইয়ান, মুতাররিফ ও আবুল জাহম সিকা ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম। দেখুন: তাকরীব ও তাহযীব

কিতাবুল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْوُتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُتَّ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا. (৩)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/৩৮ হাদীস নং ৭১০৮ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৭১০৯

৩ কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ : ১/৫৭৯, হাদীস নং ২১২ আবুল অফা আফগানী কত্বক তাহকীককৃত-(দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, রমযান ও অন্যান্য মাসে রুকু পূর্বে বিতরের নামাযে দুআ কুনূত (পড়া) ওয়াজিব। সুতরাং যখন তুমি দুআ কুনূত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলো এবং যখন রুকু করার ইচ্ছা করবে তখনও তাকবীর বলো।

এ হাদীসটির সনদ নিঃসন্দেহে সহীহ। হাদীসটির রাবী চতুষ্ঠয় তথা ইমাম মুহাম্মাদ রহ., ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম হাম্মাদ রহ. সবাই হাদীস ও ফিকহশাফের ইমাম এবং সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৪)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

উল্লেখ্য যে, নামাযে যতো স্থানে রাফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) আছে ততোস্থানে তাকবীর আছে। এতে কারো মতভেদ নেই। কিন্তু যতোস্থানে তাকবীর বলা হয় তার সব জায়গাতেই রাফউল ইয়াদাইন নেই। বুঝা গেলো, যেখানে রাফউল ইয়াদাইন পাওয়া যাবে সেখানে তাকবীর অবশ্যই থাকবে, কিন্তু কোথাও তাকবীর বলা প্রমাণিত হলে তথায় রাফউল ইয়াদাইন থাকাটা আবশ্যিক নয়। তাই কোথাও রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণিত হলে আবশ্যিকীয়ভাবে তথায় তাকবীর বলা প্রমাণিত হয়ে যায়। এখন আমরা এ জাতীয় কতিপয় আসার উল্লেখ করছি, যেথায় দুআ কুনূতে রাফউল ইয়াদাইন করার কথা এসেছে।

ইমাম বুখারী রহ. রচিত জুযউ রাফইল ইয়াদাইনে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ بَيَّاعٌ

الْأَنْمَاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ. (৫)

অর্থাৎ আবু উসমান রহ. বলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু দুআ কুনূতে দু'হাত উত্তোলন করতেন।

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৪০ হাদীস নং ৬৩৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ জুযউ রাফইল ইয়াদাইন, বুখারী : পৃ. নং ১৪৬ হাদীস নং ১৬২ (দারু ইবনি হযম, বৈরুত)

আল্লামা নিমবী ৱহ. স্বীয় আসারুস সুনাৱেৱ হাশিয়া আত তা'লীকুল হাসানে বলেন:

رواه البخارى فى جزئه بإسناد حسن. (১)

অৰ্থাৎ ইমাম বুখাৰী ৱহ. হাদীসটিকে স্বীয় জুযউ রাফইল ইয়াদাইনে হাসান তথা প্রমাণযোগ্য সনদে বর্ণনা কৰেছেন।

এছাড়াও স্বয়ং ইমাম বুখাৰী ৱহ. এ হাদীসেৱ পৰে আৰেকটি হাদীস বর্ণনা কৰে বলেন:

هذه الأحاديث كلها صحيحة. (২)

অৰ্থাৎ এ সবগুলো হাদীসই সহীহ।

জুযউ রাফইল ইয়াদাইনে আরো বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوُتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكْعَةِ. (৩)

অৰ্থাৎ আসওয়াদ সূত্ৰে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এৱ ব্যাপাৰে বর্ণিত যে, তিনি বিতৰেৱ শেষ ৱাকআতে সূৱা ইখলাস পড়তেন। এৱপৰ ৱুকূৱ পূৰ্বে দু'হাত উত্তোলন কৰতেন এৱং দুআ কুনূত পড়তেন। (এৱপৰ তাকবীৱ বলে ৱুকূ কৰতেন)।

ইমাম বুখাৰী ৱহ. এ হাদীসটি বর্ণনা কৰে বলেন:

هذه الأحاديث كلها صحيحة. (৪)

অৰ্থাৎ এ (হাদীসসহ পূৰ্বেৱ) সবগুলো হাদীসই সহীহ।

আল্লামা নিমবী ৱহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৫)

১ আত তা'লীকুল হাসান মাআ আসারিস সুনাৱ : পৃ. নং ২৪১ হাদীস নং ৬৩৫ সংশ্লিষ্ট (আল মাকতাবাতুল বুশরা, কৱাচী)

২ জুযউ রাফইল ইয়াদাইন : পৃ. নং ১৪৮ হাদীস নং ১৬৪ (দাৱু ইবনি হযম, বৈৱত)

৩ প্রাণ্ডক্ত : পৃ. নং ১৪৬-১৪৭ হাদীস নং ১৬৩

৪ প্রাণ্ডক্ত : পৃ. নং ১৪৮ হাদীস নং ১৬৪

৫ আসারুস সুনাৱ : পৃ. নং ২৪১ হাদীস নং ৬৩৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, কৱাচী)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

এ আসারগুলোতে দুআ কুনূতের সময় রাফউল ইয়াদাইনের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আর পূর্বে গত হয়েছে যে, প্রত্যেক রাফউল ইয়াদাইনের সহিত তাকবীর আছে বিধায় যখন প্রমাণিত হলো যে, দুআ কুনূতে রাফউল ইয়াদাইন করা হয় তখন তাকবীর বলাও প্রমাণিত হয়।

এছাড়াও দুআ কুনূত পড়ার সময় রাফউল ইয়াদাইন ও তাকবীর বলার বিষয়টি ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও বারা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ একাধিক শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও বহু তাবেরীর আমল ও সুন্নাত। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের মর্যাদা রাখে। তাই এমন একটি সুন্নাহসম্মত আমলকে ‘উল্টা তাকবীর’ বলে বিদ্রূপ ও পরিহাস করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই বিদ্রূপ ও বেআদবির নামান্তর। আল্লাহ আমাদের এসব গোস্তাখীপূর্ণ উক্তি করা থেকে বিরত রাখুন।

২৬তম পাঠ (তিন রাকআত বিতর নামাযে দুই বৈঠক করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

বেতের নামাযে দুই বৈঠক দেয়া ভুয়া পদ্ধতি নবী ও সাহাবীদের আমল নয়। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে ১, ৩, ৫, ৭ রাকাত নামাজ রাসূল (সাঃ) এক বৈঠকে পড়তেন। তিরমিযী মিনা প্রঃ ১৩৯ পৃঃ ২৭৫, ২৭৬ নং হাদীস।

জবাব:

বিতর নামাযে দুই বৈঠক করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের আমলের বিপরীত নয়; বরং তা ওয়াজিব। কেননা, প্রত্যেক দুই রাকআত অন্তর আতাহিয়্যাতু অর্থাৎ তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. (১)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর বলে সূরা ফাতিহা পড়ে নামায শুরু করতেন। আর তিনি যখন (প্রথম) সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজদা করতেন না। তিনি প্রত্যেক দু'রাকাত অন্তর আতাহিয়্যা তু পড়তেন। আর তিনি (নামাযের বৈঠকে) বাম পা বিছিয়ে ডান পা (এর পাতা) সোজা করে খাঁড়া রাখতেন। এবং তিনি সালাম বলে নামায শেষ করতেন।

এ হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা দুই রাকআত পর আতাহিয়্যা তু তথা তাশাহুদ পড়তেন। যেহেতু كَانَ يَقُولُ হলো মাযী ইস্তিমরারীর সীগা, যা নিয়মিত ও সদাসর্বদার সহিত কোনো কাজ করাকে বুঝায়। আর বিতর যেহেতু তিন রাকআত বিধায় এতেও দু'রাকআত পর বৈঠকে বসে তাশাহুদ পড়াটা সাব্যস্ত হয়। তাহলে বিতর নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে এক বৈঠক এবং শেষ তথা তৃতীয় রাকআতে এক বৈঠক, মোট দু'টি বৈঠক হলো।

এছাড়াও আরো একাধিক সহীহ হাদীস ও আসার রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাবে না। এতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করতে হবে, কিন্তু সালাম ফিরানো যাবে না। কেননা, দ্বিতীয় রাকআতে যদি বৈঠক না থাকতো তাহলে এভাবে বলা হতো যে, 'এবং দ্বিতীয় রাকআতে বসবে না'। কিন্তু যখন বলা হবে, 'এবং দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাবে না' তখন বুঝতে হবে, এখানে অবশ্যই বৈঠক আছে। কারণ, বৈঠক করার পরই সালাম ফিরানো না ফিরানোর বিষয়টি সামনে আসে। যেমন অন্ধ ব্যক্তি, যে চোখে দেখতে পায় না- তাকে এ কথা বলা অনর্থক যে, তুমি এটা দেখো না। এটা তো একমাত্র তাকেই বলা যায়, যে চোখে দেখে। কেননা, চোখ থাকলেই তো দেখা না দেখার বিষয়টি আসে। সুতরাং কাউকে যদি বলা হয় তুমি এটা দেখবে না তখন এটা বুঝতে হবে যে, তার চোখ ও দৃষ্টিশক্তি আছে। তদ্রূপ যখন বলা হবে যে, বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাবে না তখন বুঝতে হবে এখানে অবশ্যই বৈঠক আছে। দেখা না দেখার জন্য যেরকমভাবে চোখ ও দৃষ্টিশক্তি থাকা পূর্বশর্ত তেমনি সালাম ফিরানো না ফিরানোর জন্য বৈঠক করা পূর্বশর্ত।

এখন আমরা এ সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ, হাসান সূত্রে মারফু হাদীস তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস এবং আসার তথা সাহাবা, তাবেয়ীনের আমল ও ফতোয়া বর্ণনা করবো।

সহীহ সনদে সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَيِ الْوُتْرِ. (১)

অর্থাৎ সাদ বিন হিশাম রহ. থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা তাকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের দুই রাকআতে (বসলেও) সালাম ফিরাতেন না।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

মুসনাদে আহমাদে গ্রহণযোগ্য একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْفَرَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رُكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ فِيهِنَّ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَرْكَعُ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ جَالِسٌ. (৩)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইশার নামায পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। এরপর দু'রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। এরপর আরো দীর্ঘ

১ সুনানে নাসায়ী : পৃ. নং ১৯৮ হাদীস নং ১৬৯৮ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩২ হাদীস নং ৬১৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ মুসনাদে আহমাদ : ৪২/১২৬ হাদীস নং ২৫২২৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

দু'রাকআত নামায পড়তেন। এরপর তিন রাকআত বিতর পড়তেন, (কিন্তু) এতে (দ্বিতীয় রাকআতে সালামের মাধ্যমে তিন রাকআত বিতরকে) আলাদা করে পড়তেন না। এরপর বসে দু'রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। (এতে) বসেই রুকু করতেন এবং বসেই সিজদা করতেন।

এ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ও হাসান পর্যায়ে।

আল্লামা গুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের তালীকে বলেন:

يزيد بن يعفر... قال الدار قطنى: يعتبر به. وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة. ومحمد بن راشد وهو الخزاعي المكحول وثقه أحمد وابن معين وابن المبارك والنسائي وغيرهم... وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.^(৪)

অর্থাৎ (হাদীসটির রাবীদের মধ্য থেকে একজন হলেন) ইয়াযীদ বিন ইয়াকুব। ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায়। (অবশ্য) হাফেয যাহাবী রহ. স্বীয় মীযানুল ই'তিদালে বলেন, সে প্রমাণযোগ্য নয়। আর (দ্বিতীয় আরেকজন রাবী) মুহাম্মাদ বিন রাশেদ, যিনি হলেন খুযায়ী মাকহুলী। ইমাম আহমাদ রহ., ইবনে মাজীন রহ., ইবনে মুবারক রহ., নাসায়ী রহ.-সহ প্রমুখ ইমামগণ তাকে সিকা ও নির্ভরযোগ্য রাবী বলে অভিহিত করেছেন। আর বাকী সব রাবী সিকা ও নির্ভরযোগ্য তথা সহীহ বুখারী, মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, জরাহ-তা'দীলের মূলনীতি অনুসারে হাফেয যাহাবী রহ. এর জরাহ তথা সমালোচনামূলক উক্তি যেহেতু মুফাস্সার (ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) নয় বিধায় এখানে ইমাম দারা কুতনী রহ. এর তা'দীল তথা প্রশংসামূলক উক্তিই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং রাবীটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বলে গণ্য হবে।

আর এজন্যই আল্লামা নিমবী রহ. উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

رواه أحمد بإسناد يعتبر به.^(৫)

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ রহ. হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য একটি সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে:

৪ প্রাপ্ত : (তালীক)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩২ হাদীস নং ৬১৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُثْرِ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" وَفِي الثَّالِثَةِ بِ"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ: -يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ- سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثًا. (১)

অর্থাৎ উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের (প্রথম রাকআত) নামাযে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন। আর বিতরের তিন রাকআতের মধ্য থেকে (দ্বিতীয় রাকআতে বসলেও সালাম ফিরাতেন না; বরং) শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন।

হাদীসটিকে লা-মাযহাবীদের মান্যবর ইমাম শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে (২) صحيح বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাফেয ইরাকী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৪)

অর্থাৎ (এটা) সহীহ সনদে (বর্ণিত)।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده حسن. (৫)

১ সুনানে নাসায়ী : পৃ. নং ১৯৮ হাদীস নং ১৭০১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাপ্ত

৩ ইলাউস সুনান : ৬/৪২ হাদীস নং ১৬৬১ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৪ প্রাপ্ত

অর্থাৎ এর সনদ হাসান তথা উত্তম।

মুত্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوُتْرِ. (৬)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের প্রথম দু'রাকআতে (বসলেও) সালাম ফিরাতেন না।

ইমাম হাকিম রহ. বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. (৭)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস।

হাফেয যাহাবী রহ. মুত্তাদরাকে হাকিমের তালীকে সংযোজিত স্বীয় তালখীসে তার বক্তব্য সমর্থন করে বলেন:

على شرطهما وله شواهد

অর্থাৎ (এটা) বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী (সহীহ হাদীস)। আর এর স্বপক্ষে অনেক সমর্থক হাদীস রয়েছে।

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিন রাকআত বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাবে না; বরং বৈঠক করে দাঁড়িয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়) পূর্বে গত হয়েছে যে, প্রত্যেক দু'রাকআত অন্তর বসে তাশাহুদ পড়া আবশ্যিক। সুতরাং এখানে এ সন্দেহ অমূলক যে, দ্বিতীয় রাকআতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩১ হাদীস নং ৬১১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৪৪৬ হাদীস নং ১১৩৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৭ প্রাগুক্ত : ১/৪৪৭

যেরকমভাবে সালাম ফিরাতেন না তদ্রূপ হয়তো তিনি এতে বৈঠকও করতেন না। এখন আমরা কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর আমল দেখাবো যে, তাঁরাও বিতর নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করলেও সালাম ফিরাতেন না।

শরহু মাআনিল আসার তথা তাহাবীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. (১)

অর্থাৎ মিসওয়ার বিন মাখরামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে রাতে দাফন করলে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি (এখনও) বিতর পড়িনি। এরপর তিনি (নামাযের জন্য) দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে তিন রাকআত বিতর পড়ালেন, (মাঝে বৈঠক করলেও সালাম না ফিরিয়ে) শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই সালাম ফিরালেন।

এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও এর সব রাবী বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا شُجَاعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوُتْرُ ثَلَاثٌ كَوُتِرَ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. (৩)

১ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৯৩ হাদীস নং ১৭৪২ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩৪ হাদীস নং ৬১৮ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৯৪ হাদীস নং ১৭৪৪ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিতর হলো তিন রাকআত, দিনের বিতর (বলে পরিচিত) মাগরিব নামাযের মতো।

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন:

هَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. (৪)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ মাওকুফ হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (৫)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এ বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিতরের নামাযকে মাগরিবের নামাযের মতো বলা হয়েছে। এমনকি বিতর ও মাগরিবের নামাযের মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান থাকায় মাগরিবের নামাযকে দিনের বিতর বলা হয়েছে।

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিতর নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করা আবশ্যিক, যেরকমভাবে মাগরিব নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করা আবশ্যিক। হ্যাঁ, এ দু'নামাযের মধ্যে তৃতীয় রাকআতে শুধু কিরাত পড়া না পড়ার একটি পার্থক্য রয়েছে, যা অন্য একটি বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সে বর্ণনাটিও এখানে উল্লেখ করছি।

শরহু মাআনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ فَهَذَا وَتْرُ اللَّيْلِ وَهَذَا وَتْرُ النَّهَارِ. (৬)

অর্থাৎ আবু খালদা রহ. বলেন, আমি আবুল আলিয়া রহ.-কে বিতরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

৪ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ৩/৪৫ হাদীস নং ৪৮১২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩৪ হাদীস নং ৬১৯ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/২৯৩ হাদীস নং ১৭৪৩ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

সাল্লাম এর সাহাবীগণ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, বিতর হলো মাগরিবের নামাযের মতো তিন রাকআত। ব্যতিক্রম হলো, আমরা (বিতরের) তৃতীয় রাকআতে (সূরা ফাতিহার পর) কিরাত পড়ি (যা মাগরিবের নামাযে পড়া হয় না)। সুতরাং এটা হলো রাতের বিতর আর ওটা (মাগরিবের নামায) হলো দিনের বিতর।

এ হাদীসটির সনদও বিশুদ্ধ এবং এর সব রাবী নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

সুনানে কুবরা বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيَّ أَنبَأَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ تِرُوا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ. (২)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মাগরিব নামাযের সাথে মিল রেখে তিন রাকআত বিতর পড়ো না, (বরং আগে পরে বিতরের সাথে দু'চার রাকআত নফল মিলিয়ে) পাঁচ বা সাত রাকআত বিতর পড়ো।

এ হাদীসটিকে ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনা করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. (৩)

১ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩৪ হাদীস নং ৬২১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

২ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ৩/৪৬ হাদীস নং ৪৮১৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৪৪৬ হাদীস নং ১১৩৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস।
হাফেয যাহাবী রহ. স্বীয় তালখীসে উক্ত মন্তব্য সমর্থন করে বলেন:
(৪) *على شرطهما.*

অর্থাৎ (হ্যাঁ) এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।
আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:
(৫) *وإسناده صحيح.*

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এ মারফু সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতর ও মাগরিবের নামাযের মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। আর উভয় নামাযের এ সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতা দূরকরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের সাথে দুই বা চার রাকআত নফল মিলিয়ে পড়তে বলেছেন। এ কথা বলেননি যে, তোমরা বিতর নামাযে দ্বিতীয় বৈঠক করো না, যাতে মাগরিবের সাথে তা মিলে না যায়। তিনি বরং বিতর নামাযের তিন রাকআতের আভ্যন্তরীণ কোনো বিধানে পরিবর্তন না করে শুধু তার সাথে কিছু নফল নামায যোগ করতে বলেছেন। সুতরাং মাগরিবের মতো বিতরেরও দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করতে হবে।

এসব ছাড়াও এ সংক্রান্ত আরো বহু সহীহ হাদীস ও আসার পাওয়া যায়, যার দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বিতরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে অন্যান্য স্বাভাবিক নামাযসমূহের মতো বৈঠক করে তাশাহুদ পড়তে হবে।

ইমাম বাইহাকী রহ., যিনি হানাফীদের ব্যাপারে খুব কটরপন্থী বলে পরিচিত তিনিও এ বাস্তব সত্যকে লুকাননি; বরং স্বীয় সুনানে কুবরাতে এ সংক্রান্ত একটি আলাদা অধ্যায় এনেছেন, যার শিরোনাম হলো,

بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَوْصُولَاتٍ بِتَشْهُدَيْنِ وَتَسْلِيمٍ^(৬)

অর্থাৎ “অধ্যায়: যারা বিতর নামায এক সালাম ও দুই তাশাহুদে (মাঝে সালাম না ফিরিয়ে) মিলিয়ে তিন রাকআত পড়েন-”

এরপর এতে তিনি এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস ও আসার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এদের এ ইনসাফপ্রিয়তা থেকে লা-মাযহাবীদের শিক্ষা নেয়া ও বুঝার তাওফীক দান করুন।

৪ প্রাগুক্ত (আত তালখীস)

৫ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৩৫ হাদীস নং ৬২৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৬ সুনানে কুবরা, বাইহাকী ৩/৪৫ অধ্যায় নং ৬৪৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২৭ তম পাঠ: (বিতরের নামাযে আমাদের পঠিত দুআ কুনূত সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

বেতের নামাযে যে দোয়া কুনূত পড়া হয় আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাইনুকা.... পড়া হয় তা মুরসাল বা যঈফ। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে, আল্লাহুমাহদিনি ফিমান হাদাইতা বলতে হবে। বোঃ মিনা প্রকঃ ১৫৭ পৃঃ ৭৫৩ নং হাদীস।

জবাব:

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

এক: হাদীস মুরসাল হলেই তাকে যঈফ বলা হয় না, যেমনটি মনে করে লা-মাযহাবীরা।

দুই: মূলত বিতর নামাযের কোনো সুনির্দিষ্ট দুআ কুনূত নেই, যা পড়াটাই আবশ্যিক; বরং এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের দুআ বর্ণিত হয়েছে। এর যে কোনো একটি পড়লেই কুনূত আদায় হয়ে যাবে। আর এ কারণেই বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, একসাথে দুটি দুআ কুনূত পড়ার কথা এবং এতে যে কোনো দুআ নির্দিষ্টভাবে নেই- তাও বর্ণনায় এসেছে।

তিন: এখানে ‘আল্লাহুমাহদিনী ফীমান হাদাইতা....’ দুআ কুনূতটি বুখারীতে আছে দাবি করা হয়েছে। অথচ তা বুখারীতে বর্ণিত হয়নি; বরং তিরমিযী, আবু দাউদসহ অন্যান্য সুনানগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা পরে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নে মুরসাল নিয়ে দুটি ভুল উক্তি করা হয়েছে। এক: আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাইনুকা..... দুআ কুনূতটি শুধু মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। এর কোনো মারফু ও মুত্তাসিল সনদ নেই। দুই: প্রত্যেক মুরসালই যঈফ বিধায় এ দুআ কুনূতটিও যঈফ। কিন্তু বাস্তবতা হলো- এ দুটি দাবিই ভুল। কারণ, এ দুআ কুনূতটি যেমন মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তেমনি তা মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোল্লিখিত হাদীসগুলো দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো হাদীস মুরসাল হলেই তা যঈফ এমন ধারণা ভুল। অসংখ্য

মুহাদ্দিস ও ইমাম মুরসাল হাদীসকে দলীল ও প্রমাণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, এতে ইখতিলাফ ও মতভেদ আছে, এটাও সত্য। কিন্তু ইখতিলাফপূর্ণ কোনো একটি বিষয়কে স্বীয় মর্জিমতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনে করে যে অনুযায়ী ফয়সালা করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। বিশেষত সে সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবতা ও তাহকীকের বিপরীত হয়। মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ইমামদের গবেষণায় শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, তা আমল ও প্রমাণযোগ্য। বিষয়টি মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা একটি গ্রন্থ রচনার দাবি রাখে, যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

যাই হোক, আমাদের এ নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই যে, নির্দিষ্ট একটি দুআ কুনূতই পড়তে হবে; বরং আমাদের নিকট যে কোনো দুআ কুনূত পড়ারই অবকাশ আছে। যেহেতু ‘আল্লাহুমা ইন্নنا নাস্তাইনুকা.....’ দুআ কুনূত পড়া নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে বিধায় প্রথমে আমরা এ কথা প্রমাণ করবো যে, এ দুআ কুনূতটি সহীহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় দুআ কুনূতও উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

সুনানে বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بِحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ. إِذْ جَاءَهُ جَبْرِئِيلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتْ فَسَكَتَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُخَضِّعُ لَكَ وَنُخْلَعُ وَنُشْرِكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ وَنُخَافُ عَذَابَكَ الْجِدِّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ. (১)

অর্থাৎ খালেদ বিন আবু ইমরান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মুযার গোত্রের উপর বদদুআ করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট জিবরীল আমীন আ. এসে তাঁকে চুপ হওয়ার ইঙ্গিত দিলে তিনি চুপ হলেন। তখন তিনি (জিবরীল আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে গালিদাতা ও ভৎসনাকারী করে প্রেরণ করেননি, আপনাকে তো তিনি শুধু রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, আযাব স্বরূপ নয়। (কাফেরদের ব্যাপারে) আপনার কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। হয়তো আল্লাহ তাদের (তাওবার তাওফীক দিয়ে) তাওবা কবুল করবেন কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কেননা, তারা যালিম। এরপর তিনি তাঁকে এ দুআ কুনূত শিক্ষা দিলেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নنا নাস্তাগ্গিনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা....’।

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন:

هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحًا
مَوْصُولًا. (১)

অর্থাৎ এটা মুরসাল হাদীস। অবশ্য এটা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বিশুদ্ধ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ইমাম বাইহাকী রহ. সহীহ সনদে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও এ হাদীসটি শুধু সহীহ সনদে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকেই বর্ণিত হয়নি; বরং সহীহ সনদের মারফু তথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

হাফেয কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ. আত তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. এর মারাসীলের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করে বলেন:

وأخرجه سمويه موصولاً، فقال: ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن معمر
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلاناً
وفلاناً..... (২)

অর্থাৎ ইমাম সামূইয়া রহ. হাদীসটিকে (শুধু মুরসাল নয়; বরং মারফু) মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইমাম সামূইয়া রহ.) বলেন, আমাকে নুআঈম বিন হাম্মাদ রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবনুল মুবারক রহ. বর্ণনা করেছেন মামার রহ. থেকে, তিনি যুহরী রহ. থেকে, তিনি সালেম রহ. থেকে, তিনি স্বীয় পিতা (ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মুযার গোত্রের) অমুক অমুককে (দুআ কুনূতের মধ্যে) লানত ও অভিসম্পাত করতেন.....। (বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের মতোই)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ‘আল্লাহুমা ইন্ন্য নাস্তাঈনুকা’ দুআ কুনূতটি শুধু মুরসাল হিসেবেই নয়; বরং সহীহ সনদের মারফু (রাসূলের হাদীস) ও মাওকুফ (সাহাবীর হাদীস) উভয় তরীকায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম সামূইয়া রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ।

আল্লামা মুহাম্মাদ নূর ইউসূফ এ হাদীসটির তালীকে বলেন:

رجال الإسناد كلهم ثقات والحديث صحيح. (৩)

অর্থাৎ সনদটির সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসটি সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ. (৪)

অর্থাৎ আবু আ. রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাদেরকে কুনূতে এ দুআ পড়তে শিখিয়েছেন, ‘আল্লাহুমা ইন্ন্য নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা.....’।

২ আত তা'রীফ ওয়াল ইখরার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার : ১/৩৮৬-৩৮৭ হাদীস নং ২২০ সংশ্লিষ্ট (উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা)

৩ প্রাগুক্ত (তালীক)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৫১৮ হাদীস নং ৬৯৬৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য, যা রাবীদের জীবনীগ্রন্থ থেকে প্রমাণিত এবং এর সনদে সূত্রবিচ্ছিন্নতা বা অন্য কোনো সমস্যাও নেই বিধায় হাদীস সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُوَيْدٍ الْكَاهِلِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَتَّ فِي الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِيثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيَرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. (১)

অর্থাৎ আ. রহমান বিন সুওয়াইদ কাহিলী রহ. থেকে বর্ণিত যে, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ফজরের নামাযে এ দু'টি দুআ দিয়ে কুনূত পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাজিনুকা.....' এবং 'আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসল্লী ওয়া নাসজুদু.....' (অর্থাৎ পূর্বের দুআ কুনূতগুলোর মতোই প্রায়)।

এ সনদটিতেও তেমন কোনো সমস্যা নেই। আ. রহমান বিন সুওয়াইদের নির্দিষ্ট কোনো জীবনী না পাওয়া গেলেও ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. এর মূলনীতি অনুসারে সে সিকা ও নির্ভরযোগ্য। এজন্যই আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

وسنده لا بأس به. (২)

অর্থাৎ এ সনদে কোনো সমস্যা নেই।

সুনানে বাইহাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

১ প্রাণ্ডজ : ১৫/৩৪৩-৩৪৪ হাদীস নং ৩০৩৩৫

২ ইলাউস সুনান : ৬/১০৮ হাদীস নং ১৭৪০ (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخْلَعُ وَنُتْرَكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَلَكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ وَنُخْشَى عَذَابَكَ الْجِدِّ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ. (৩)

অর্থাৎ উবাইদ বিন উমাইর রহ. থেকে বর্ণিত যে, উমার রাযিআল্লাহ তাআলা আনহু রুকু'র পর (এর পরের বিশুদ্ধ বর্ণনায় অবশ্য 'কিরাতে'র পর রুকু'র পূর্বে' উল্লেখ আছে) এ দুআ কুনূত পড়তেন- আল্লাহুমাগফির লানা ওয়া লিলমুমিনাত ওয়া ল মুসলিমীনা ওয়া ল মুসলিমাত.... আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাইনুকা..... ।

এ বর্ণনা সম্বন্ধে ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন:

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحًا مَوْصُولًا. (৪)

অর্থাৎ (আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাইনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা..... এ দুআ কুনূতটি) উমার রাযিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে মুত্তাসিল ও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

هذا موقوف صحيح. (৫)

৩ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/২৯৮-২৯৯ হাদীস নং ৩১৪৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৪ প্রাগুক্ত : ২/২৯৮ হাদীস নং ৩১৪২

অর্থাৎ এটা সহীহ মাওকুফ হাদীস।

আল্লামা আবু উসামা সালীম আসারী বলেন:

صحيح موقوف لفظا مرفوع حكماً. (২)

অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীস, যা বাহ্যত মাওকুফ (সাহাবীর হাদীস) হলেও বাস্তবে তা মারফু (রাসূলের হাদীস)।

এছাড়াও এ দুআ কুনূতটি উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং আরো শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিখেই তদানুযায়ী আমল করেছেন। এজন্যই এ হাদীসগুলোকে বাহ্যত মাওকুফ মনে হলেও তা বাস্তবে মারফু হাদীস বলেই বিবেচিত হয়ে। যেমনটি বলেছেন শাইখ আবু উসামা সালীম আসারী স্বীয় গ্রন্থ ‘নাইলুল আওতার বিতাখরীজি আহাদীসি কিতাবিল আযকার’ গ্রন্থে। আর তিনি সত্যই বলেছেন।

আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, মূলত হাদীসে দুআ কুনূত বিভিন্ন বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে থেকে ‘আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাঈনুকা’ দুআ কুনূতটিই বেশী প্রসিদ্ধি পেয়েছে, যা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম পড়তেন। আমরা এখানে হাদীসে বর্ণিত আরো কতিপয় দুআ কুনূত উল্লেখ করছি।

সুনানে তিরমিযীতে এ দুআ কুনূত বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوَّارِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُثْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ

১ নাতাইজুল আযকার : ২/১৫৮ মজলিস নং ১৫০ (দারু ইবনি কাসীর, দামেশক)

২ নাইলুল আওতার বিতাখরীজি আহাদীসি কিতাবিল আযকার : ১/১৫৬ হাদীস নং ১৫৭ (দারু ইবনি হযম, বৈরুত)

عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْتَنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أُعْطِيتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. (৩)

অর্থাৎ হাসান বিন আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতর নামাযে পড়ি। তা হলো- ‘আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিকলী ফীমা আতাইতা, ওয়া কিনী শাররামা কাযাইতা, ফাইন্নাকা তাকযী ওয়ালা ইয়ুকযা আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা’।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে এ দুআ কুনূত বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ: لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (৪)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি বিতরের কুনূতের জন্য এ দুআ পড়তেন, ‘লাকাল হামদু মালাআস সামাওয়াতিস সাবই ওয়া মালাআ আরযীনাস সাবই ওয়া মালাআ মা বাইনাহুমা মিন শাইয়িম বা’দু, আহলাস সানা-ই ওয়াল মাজদি আহাক্কু মা ক্বালাল আবদু, কুল্লুনা লাকা আবদুন লা মানিআ লিমা আ’তাইতা ওয়ালা মু’তিআ লিমা মানা’তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদি মিনকাল জাদু।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে এ দুআ কুনূতও বর্ণিত হয়েছে:

৩ সুনানে তিরমিযী : পৃ. ৯৭ হাদীস নং ৪৬৪ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৫১৭ হাদীস নং ৬৯৬২ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَيْخٍ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ:
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَى وَأَنْتَ
بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى وَإِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ
بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى. (১)

অর্থাৎ আবু মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, হুসাইন বিন আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এ দুআটি বিতরের কুনূতে পড়তেন- ‘আল্লাহুমা ইন্নাকা তারা ওয়ালা তুরা ওয়া আনতা বিলমানযারিল আ’লা ওয়া ইন্না ইলাইকার রুজআ ওয়া ইন্না লাকাল আখিরাতা ওয়াল উলা ইন্না নাউযুবিকা আন নাযিল্লা ও নাখযা’।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন শব্দে দুআ কুনূত বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কুনূতে নির্দিষ্ট কোনো দুআ পড়া ওয়াজিব নয়; বরং হাদীসে বর্ণিত যে কোনো একটি পড়লেই হয়ে যাবে। এমনকি এতে বর্ণিত দুআগুলো থেকে একাধিক দুআও পড়ার কথা পাওয়া যায়।

সহীহ সনদে বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ شَيْءٌ
مُؤَقَّتٌ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ. (২)

অর্থাৎ মুগীরা রহ. ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বিতরের কুনূতে নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই। এটা তো শুধুমাত্র প্রার্থনা ও ইস্তিগফারের নাম।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَنْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا

نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ..... قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَوْ كُنْتُ إِمَامًا
قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ. (৩)

অর্থাৎ আবু রাফে রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর পিছনে নামায পড়লে তাকে এ দুআ কুনূতটি পড়তে শুনলাম, ‘আল্লাহুমা ইন্না নাস্তাজিঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা.....’। ইমাম আ. রাযযাক রহ. বলেন, যদি আমি (নামাযে) ইমাম হই তখন (প্রথমে) এ দুআ কুনূত পড়ি এরপর এটাও বলি, ‘আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা.....’।

প্রমাণিত হলো যে, দুআ কুনূত নিয়ে কারো কোনো বাড়াবাড়ি নেই। শুধু স্বল্পজ্ঞানী এ লা-মাযহাবীরাই নির্দিষ্ট একটি দুআ কুনূত পড়াকে আবশ্যক মনে করে। অথচ তাদের এ দাবি প্রমাণ ও দলীলহীন। হ্যাঁ, বেশীর চেয়ে বেশী একটাকে অন্যটার চেয়ে উত্তম বলা যেতে পারে। কিন্তু উত্তম ও আবশ্যক এক কথা নয়।

২৮ তম পাঠ:

(নামায শেষে ইমামের মুক্তাদীদের দিকে
ফিরে বসা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাজ শেষে ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে বসতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস
দ্বারা প্রমাণিত। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৫২ পৃঃ ৮০৫ নং হাদীস।

জবাব:

এটা আবশ্যিক নয় যে, ইমাম মুক্তাদীদের দিকেই মুখ দিয়ে বসবে; বরং
ফরয নামাযের পর ইমামের চারটি কর্মের অবকাশ রয়েছে।

এক: সে সরাসরি মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে।

যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى
صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (১)

অর্থাৎ সামুরা বিন জুনদুব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন স্বীয় চেহারা
মুবারক দিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন।

দুই: ডানদিকের মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে।

যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত বারা বিন আযেব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু
সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
ابْنِ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي
عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ يَجْمَعُ - عِبَادَكَ. (২)

১ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৭২ হাদীস নং ৮৪৫ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ সহীহ মুসলিম : পৃ. নং ২৮০-২৮১ হাদীস নং ৭০৯ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ বারা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমরা তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম, যাতে আমাদের দিকে তিনি মুখ করে বসেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (নামাযের পর) এ দুআ পড়তে শুনেছি, ‘রাব্বি কিনী আযাবাকা ইয়াউমা তাবআসু অথবা (বলেছেন) তাজমাউ ইবাদাকা’।

তিন: বামদিকের মুক্তাদিদের দিকে মুখ করে বসবে।

যেমন সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ. لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. (৩)

অর্থাৎ আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো তার নামাযের কিছু শয়তানের জন্য না রাখে। তা হলো, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরে বসা আবশ্যিক মনে করা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (এক, দু'বার নয়; বরং) বহুবারই বামদিকে ফিরে বসতে দেখেছি।

চার: আর প্রয়োজন থাকলে সালাম শেষে কোনোদিকে ঘুরে না বসে সরাসরি উঠে মসজিদ থেকে বের হয়ে আপন কাজে চলে যাবে।

যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى

بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ. فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. (১)

অর্থাৎ উকবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে মদীনায নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। এরপর মুসল্লীগণকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর সহধর্মীগণের কোনো একজনের কক্ষে গেলেন। তাঁর এ দ্রুততায় মুসল্লীরা ঘাবড়ে গেলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে পড়েছে। তাই তিনি বললেন, আমার কাছে থাকা কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। আমি পছন্দ করলাম না যে, তা আমার প্রতিবন্ধক হোক। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে আসলাম।

উল্লেখ্য যে, এ চারটি নিয়ম ঐসব নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেসব নামাযের পর সুন্নাত নামায নেই। যেমন ফজর ও আসরের নামায। আর যে নামাযের পর সুন্নাত আছে (যথা যোহর, মাগরিব, এশা) সেসব নামাযের পর ইমাম পারলে নিজ স্থান থেকে সরে এসে নতুবা আপন স্থানে থেকেই পা সামান্য আগে পিছে বা ডানে বামে সরিয়ে সুন্নাত পড়বে। আপন স্থান তথা ফরয পড়ার স্থানে সুন্নাত নামায পড়বে না। আর এটাই সুন্নাহসম্মত পন্থা। একাধিক প্রমাণযোগ্য হাদীসসমূহে এর নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ: أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟ زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فِي الصَّلَاةِ يَغْنِي فِي السُّبْحَةِ. (২)

১ প্রাণ্ডক্ত : হাদীস নং ৮৫১

২ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১২৬ হাদীস নং ১০০৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি পারো না যে, (ফরয নামাযের পর) সুন্নাত-নফলের জন্য (একটু) সামনে পিছনে কিংবা ডানে বামে (স্থান পরিবর্তন) করে দাঁড়াবে?

শাইখ আলবানী রহ. এ হাদীসটির ব্যাপারে বলেন:

صحيح. (৩)

অর্থাৎ বিশুদ্ধ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের হবে।

তিনি বলেন:

وأما قول البخارى فى حديث أبى هريرة هذا "لم يصح" فلا يفيد نفي الحسن عنه. (৪)

অর্থাৎ আর আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এ হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. এর মন্তব্য যে, 'তা সহীহ নয়' কথাটি তা হাসান না হওয়াকে বুঝায় না। অর্থাৎ উক্ত কথাটির উদ্দেশ্য হবে হাদীসটি সহীহ না হলেও হাসান হবে, যা প্রমাণযোগ্য হাদীস।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ. (৫)

অর্থাৎ আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন সে ততোক্ষণ পর্যন্ত তথায় সুন্নাত, নফল পড়বে না যতক্ষণ না সে স্থান পরিবর্তন করে কিংবা কথা বলার মাধ্যমে ফরয ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে বলেন:

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ

الْإِمَامُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ. (১)

অর্থাৎ ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. (স্বীয় মুসান্নাফে) হাসান সনদে আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত হলো, আপন স্থান থেকে সরে যাওয়া পর্যন্ত ইমাম (আপন স্থানে) সুন্নাত নফল পড়বে না।

এছাড়াও এ সংক্রান্ত আরো একাধিক হাদীস ও আসার পাওয়া যায়, যার সবগুলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে এ কথার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে বা শুধু ডানদিকের মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসবে কিংবা শুধু বামদিকের মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসবে অথবা প্রয়োজন থাকলে কোনোদিকে ফিরে না বসে আপন কাজে চলে যাবে। এটা হলো যেসকল নামাযের পর সুন্নাত-নফল নেই তার বিধান। আর যে নামাযের পর সুন্নাত-নফল আছে সেসব নামাযের পর ইমাম আপন স্থান ত্যাগ করে তারপর সুন্নাত পড়বে। আর যদি আপন স্থান ত্যাগ করা কোনো কারণে সম্ভব না হয় তাহলে আপন স্থানেই একটু ডানে বামে কিংবা সামনে পিছনে সরে দাঁড়িয়ে তারপর সুন্নাত শুরু করবে। এটাই সুন্নাহসম্মত পন্থা, যে ব্যাপারে লা-মাযহাবীরা উদাসীন, অজ্ঞ।

১ ফাতহুল বারী : ২/৩৩৫ হাদীস নং ৮৫০ সংশ্লিষ্ট (দারুল মারিফা, বৈরুত)

২৯ তম পার্ট

(নামাযের মধ্যে বিভিন্ন দিকে আড়চোখে তাকানো সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

নামাযের সময় চোখের নজর বিভিন্ন স্থানে দিই তা ভুয়া। সব সময় নামাজে চোখের নজর সিজদার স্থানে থাকবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মিশকাত আলিম ক্লাস ৩৯৫ পৃঃ ৯৩১ নং হাদীস।

জবাব:

প্রথমত এটা হানাফী আলেমদের প্রতিষ্ঠিত কোনো আমল নয় যে, তা এ অভিযোগপত্রে উল্লেখ করতে হবে। অথচ লিফলেটটির শেষে এ অভিযোগ পত্রটিতে উল্লিখিত সকল মাসআলাকে বাংলাদেশের হুজুর তথা হানাফী আলেমদের কাছে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এর সবগুলোই হানাফী উলামায়ে কিরামের সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং এতে কিছু সাধারণ মানুষের আমলও অন্তর্ভুক্ত করে হানাফী আলেমদের নামে চালানো হয়েছে। তন্মধ্যে থেকে এটি একটি।। হানাফীদের কোনো কিতাবেই নেই যে, নামাযে এদিক-ওদিক তাকাতে হবে।

স্মর্তব্য যে, নামাযে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকানো ও আড়চোখে দৃষ্টিপাত করাকে ‘ইলতিফাত’ (ক্রক্ষেপ) বলে। হাদীসে এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘শয়তানের নামায ছিনতাই’ বলে অভিহিত করেছেন।

যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَافٌ يَحْتَطِلُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. (১)

১ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৫৬ হাদীস নং ৭৫১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা একটি ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায থেকে (তার খুশু-খুজুকে) আত্মসাত করে।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে অযথা এদিক-ওদিক তাকানো উচিত নয়; বরং নামাযে সিজদার দিকেই নয়র রাখবে, বিশেষ করে ফরয নামাযে।

সুনানে কুবরা, বাইহাকীতে আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي وَأَبُو صَادِقٍ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ الْعَطَّارَ الْبَغْدَادِيَّ ثنا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ بَذْرِ عَنْ عَنبُوتَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي صَادِقٍ عَنْ عَنطُوتَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَ أَضْعُ بَصْرِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: عِنْدَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ يَا أَنَسُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا شَدِيدٌ لَا أَسْتَطِيعُ هَذَا. قَالَ: فِي الْمَكْتُوبَةِ إِذَا. (২)

অর্থাৎ আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাযে আমি দৃষ্টি কোথায় রাখবো? তিনি বললেন, হে আনাস! তুমি তোমার সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। তিনি (আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা অত্যন্ত কঠিন, আমি তা পারবো না। তিনি বললেন, তাহলে (কমপক্ষে) ফরয নামাযে এটা করো।

এ বর্ণনাটি যঈফ হলেও অন্যান্য বর্ণনা এর সমর্থনে থাকায় তা হাসান লিগাইরিহী পর্যায়ের হবে, যা প্রমাণযোগ্য।

ইমাম বাইহাকী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَنُطْوَانَةَ. وَالرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ضَعِيفٌ وَفِيمَا مَضَى
كَفَايَةٌ. (১)

অর্থাৎ এটা উনতুওয়ানা থেকে রবী বিন বদর সূত্রে একদল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। আর রবী বিন বদর যঈফ রাবী হলেও পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাগুলোই (বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার জন্য) যথেষ্ট।

ইবনে হাজার মক্কী রহ. বলেন:

وله طرق تقتضى حسنه. (২)

অর্থাৎ এর সমর্থনে আরো অনেক হাদীস আছে, যা এটাকে হাসান হওয়ার দাবী করে।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

قال الشيخ: حديث حسن لغيره كذا في العزيزى. (৩)

অর্থাৎ শাইখ রহ. বলেন, এটা হাসান লিগাইরিহী পর্যায়ের হাদীস। যেমনটি বলা হয়েছে আযাযী গ্রন্থে।

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা এবং আড়চোখে দেখা শরীয়তে কাম্য নয় এবং এটা বিনা প্রয়োজনে অপছন্দনীয় ও মাকরুহ। তবে তা এ পর্যায়ের নয় যে, তা করলে নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা এমনটি করা হারাম। কেননা, সহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম থেকে তা করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তাঁরা এটা না করাকে বেশীর চেয়ে বেশী সুন্নাত-মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয় ভাবতেন, কিন্তু ফরয মনে করতেন না।

এ সংক্রান্ত আমরা এখানে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করছি।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

১ প্রাণ্ডক্ত

২ আল মিরকাত শরহুল মিশকাত : ৩/৬৯ হাদীস নং ৯৯৬ সংশ্লিষ্ট (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ ইলাউস সুনান : ২/১৮৮ হাদীস নং ৬৬৬ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبَلَ وَجْهَهُ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ. (৪)

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিয়ে (জামাতে) নামায পড়ানো অবস্থায় মসজিদের সামনের দেয়ালে থুথু দেখতে পেয়ে তা মুছে দিলেন। এরপর নামায শেষে বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনের দিকে থাকেন। সুতরাং নামাযে কেউ যেনো সামনের দিকে থুথু না ফেলে।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নামাযে সিজদার দিকে তাকিয়ে থাকা ফরয নয়, নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দেয়ালে থুথু দেখতে পেতেন না।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ هُوَ أَبُو كَبْشَةَ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ. (৫)

অর্থাৎ সাহল বিন হানযালিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) ফজর নামাযের সময় ইকামাত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ানো শুরু করলেন। আর (নামায পড়ানো অবস্থায়ই) আড়চোখে দু'পাহাড়ের মধ্যস্থিত সুরঙ্গের দিকে নযর

৪ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৫৬ হাদীস নং ৭৫৩ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৫ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১১৭ হাদীস নং ৯১৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

দিচ্ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এক অশ্বারোহী সেনাকে ঐছানে পাহারা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

এ হাদীসটি সহীহ।

মুন্না আলী কারী রহ. বলেন:

وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ يَلْتَفِتُ وَهُوَ يُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى

الشَّعْبِ لِإِرْسَالِهِ فَارِسًا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْحَرْسِ. (১)

অর্থাৎ সহীহ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, পাহারার উদ্দেশ্যে দু'পাহাড়ের মধ্যস্থিত সুরঙ্গের দিকে একজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ানো অবস্থায় বারবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন।

শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, যা হাদীসটির গুরুত্রে (২) صحيح লিখে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুনানে তিরমিযীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلْحِظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي

عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. (৩)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (স্বীয়) নামাযে (মামুলায়) ডানে বামে দৃষ্টিপাত করতেন, কিন্তু পিছনের দিকে ঘাড় ফিরাতেন না।

এ হাদীসটির সনদ সহীহ। আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

১ আল মিরকাত শরহুল মিশকাত : ৩/৫৯ হাদীস নং ৯৮২ (দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. ১১৭ হাদীস নং ৯১৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৩ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ১১৭ হাদীস নং ৫৮৭ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

(৪) وإسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

শাইখ আলবানীও এটাকে সহীহ বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে
(৫) صحيح বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লামা শাওকানী রহ. নাইলুল আওতারে ‘সুনানে সাঈদ বিন মানসূর’ এর উদ্ধৃতিতে নামাযে এদিক ওদিক তাকানোর ব্যাপারে সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতঃ বলেন:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.... وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلًّا. (৬)

অর্থাৎ প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম (মুসল্লী) ব্যক্তির জন্য এটা পছন্দ করতেন যে, সে স্বীয় দৃষ্টি নামাযের স্থান থেকে (এদিক ওদিক) সরাবে না। অর্থাৎ নামাযের স্থানের বাহিরে তাকাবে না।

এ হাদীসটির সব রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বিধায় এর সনদ সহীহ।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

ورجاله ثقات. (৭)

অর্থাৎ এর সনদের রাবীগণ সবাই সিকা ও বিশ্বস্ত।

এসকল বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, নামাযে এদিক ওদিক তাকানো নামায ভঙ্গের কারণ না। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে এমন করাটা শরীয়তে কাম্যও নয় এবং এর দ্বারা নামাযের খুশু-খুজুরও কিছুটা বিনষ্ট হয় বৈকি। তা যাই হোক নামাযে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরানো অনুত্তম হলেও এর দ্বারা নামায ভাঙ্গবে না। তবে শর্ত হলো, ঘাড় যেনো কিবলার দিক থেকে পিছন দিকে ঘুরে না যায়।

মুল্লা কারী রহ. বলেন:

৪ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২০০ হাদীস নং ৫৩৯ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৫ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ১১৭ হাদীস নং ৫৮৭ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৬ নাইলুল আওতার : ৩/৫৭ হাদীস নং ৬৮১ (দারু ইবনিল কাইয়িম, রিয়াদ)

৭ ফাতহুল বারী : ২/২৩২ হা. নং ৭৪৬ সংশ্লিষ্ট الصَّلَاةُ فِي الْإِمَامِ إِلَى الْبَصَرِ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

وَلَا بِأَسْرِ بِلَمَحِ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. نَعَمْ الْأَوَّلَى تَرْكُ
ذَلِكَ. وَفِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ. (১)

অর্থাৎ ঘাড় ঘুরানো ছাড়া নামাযে চোখের পাতা এদিক ওদিক ফেরানো কোনো সমস্যার কারণ নয়। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে) এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতেন, অবশ্য পিছন দিকে ঘাড় ঘুরাতেন না। হ্যাঁ, উত্তম হলো এমনটা না করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এমন করাটা ছিলো এর বৈধতা বুঝানোর জন্য।

১ মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ : ৩/৫৯ হাদীস নং ৯৮২ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩০ তম পাঠ: (ফরয নামায বাদ সম্মিলিত মুনাজাত করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

ফরজ নামাজ শেষে সম্মিলিত মোনাজাত করা একেবাহে ভুয়া। নবী ও তার সাহাবীদের সুনাত নয় বরং তা বেদাআত। সূরা বাকারার ৪৫ ও ১৫৩ নং আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। হাজার হাজার হাদীস আছে নামাজের মধ্যে দোয়া বাহিরে নয়। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪৭ পৃঃ ৭৯৪ নং হাদীস।

জবাব:

এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

এক: ফরয নামায পরবর্তী সম্মিলিতভাবে দুআ করা।

দুই: নামাযের বাহিরে অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে দুআ করা।

আমরা দু'টি বিষয় নিয়েই সংক্ষিপ্তাকারে এখানে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত আমাদের এ কথা বোধগম্য নয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর মুনাজাত করার সাথে সূরা বাকারার ৪৫ নং ও ১৫৩ নং আয়াত অস্বীকার করার কী সম্পর্ক?

সূরা বাকারার ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. (২)

অর্থাৎ ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো।

আর সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. (৩)

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

২ সূরা বাকারার : আয়াত নং ৪৫

৩ প্রাণ্ড : আয়াত নং ১৫৩

এ হলো সূরা বাকারার দু'টি আয়াত। সম্ভবত তারা এ ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হয়ে সূরা বাকারার উক্ত দু'টি আয়াত অস্বীকার করার কথা বলেছে যে, এতে আল্লাহ তাআলা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার কথা বলেছেন। আর দুআ যেহেতু নামাযের অংশ নয়; বরং বাহিরের জিনিস তাই এভাবে দুআ করায় উক্ত আয়াতের বিধান তথা নামাযের মাধ্যমে দুআ করার বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে।

কিন্তু এটা যে কতো বড় ভ্রান্তি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না! কেননা, ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার সাথে হাত উঠিয়ে নামাযের বাহিরে দুআ করার মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। এছাড়াও অসংখ্য সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম নামাযের বাহিরেও এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে দুআ করেছেন। আর ফরয নামাযের পর যেহেতু দুআ কবুল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে বিধায় তখন দুআ করাটা হাদীসবিরোধী কর্ম ও বিদআত বলে পরিগণিত হবে না। কেননা, বেদআত বলা হয়, যা **فعلی** (কর্মবিষয়ক) ও **قولی** (উক্তিমূলক) কোনো হাদীস দ্বারাই কিংবা বলা যায়, কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত নয়, অথচ ইবাদাত মনে করে তার উপর আমল করা হয়। ফরয নামাযের পর দুআ করা কর্মবিষয়ক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হলেও উক্তিমূলক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটাকে বিদআত বলার অবকাশ নেই। এমনকি লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন বড় আলেম মুবারকপুরী সাহেবও (যিনি কট্টর আহলে হাদীস বলে পরিচিত) এ বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়েছে এবং ফরয নামাযের পর এ মুনাজাতকে বৈধ আখ্যা দিয়েছেন।

এখন আমরা এ সংক্রান্ত তথা ফরয নামাযের পর দুআ, নামাযের বাহিরে দুআ, সম্মিলিত দুআ, দুআয় দু'হাত উঠানো ইত্যাদি সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ ও প্রমাণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করবো। যাতে প্রমাণিত হয় যে, এ দুআ ও মুনাজাত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রথমত আমরা কুরআন থেকে দেখবো যে, কুরআনে নামায পরবর্তী দু'আ করার কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় কিনা? তো আমরা সূরা ইনশিরাহতে দেখলাম, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামায পরবর্তী দু'আয় মশগুল হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. (১)

অর্থাৎ সুতরাং আপনি যখন (নামায থেকে) অবসর হবে তখন (দুআর জন্য) পরিশ্রম করুন এবং আপনার রবের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করুন।

এ আয়াতদ্বয়ের একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে থেকে উম্মাতের শ্রেষ্ঠ দুই মুফাসিসর হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর তাফসীর মতে এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামায পরবর্তী দুআ করতে বলেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলেন:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ.... وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ بَعْدَ فَرَغِكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ جَالِسٌ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ يَعْني فِي الدُّعَاءِ. (২)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, (আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো) যখন আপনি ফরয নামাযসমূহ থেকে অবসর হবেন..... ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বর্ণিত আছে ‘পরিশ্রম করুন এবং আপনার রবের প্রতি মনোনিবেশ করুন’ (সূরা ইনশিরাহ : আয়াত নং ৭ ও ৮) অর্থাৎ নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন আপনি বসে থাকেন। ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে আলী বিন তালহা রহ. বর্ণনা করতঃ বলেন ‘সুতরাং আপনি যখন নামায থেকে ফারেগ হন তখন পরিশ্রম ও চেষ্টা করুন’ (সূরা ইনশিরাহ: ৭) অর্থাৎ দু’আর জন্য।

এ আয়াত ও তার সহীহ তাফসীর থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হলো যে, ফরয নামাযের পর দুআ করা যায়; বরং এর প্রতি গুরুত্বারোপও করা হয়েছে। তাই এ দুআ কিছুতেই বিদআত হতে পারে না। সুতরাং যারা বলে দুআ শুধু নামাযের ভিতরে, বাহিরে কোনো দুআ নেই তারা মূলত কুরআনের এ আয়াত ও তাফসীর সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন।

১ সূরা ইনশিরাহ : আয়াত নং ৭ ও ৮

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৪৩৩ (দারু তাইবা, রিয়াদ)

এখন দেখুন ফরয নামায পরবর্তী দুআ করা ও নামাযের বাহিরেও দুআ করা ও হাত উঠানো সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

সুনানে তিরমিযীতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّقْفِيُّ الْمُرُوزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ. (১)

অর্থাৎ আবু উমামা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দুআ সর্বাধিক কবুলযোগ্য? তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝামাঝি সময়ে এবং ফরয নামাযের পরের দুআ।

ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (২)

অর্থাৎ এটা হাসান হাদীস।

এছাড়া শাইখ আলবানীও এটিকে হাসান বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে (৩) حسن লিখে বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এটা দলীল ও প্রমাণযোগ্য একটি হাদীস। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পর দুআ করা বিদআত নয়।।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

১ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৫৫১ হাদীস নং ৩৪৯৯ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (৪)

অর্থাৎ মুগীরা বিন শুবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ দুআ পড়তেন- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ‘তাইতা ওয়ালা মু‘তিআ লিমা মানা‘তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদি মিনকাল জাদু’।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (৫)

অর্থাৎ সাওবান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন স্বীয় নামায শেষে ফিরে বসতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার পড়ে এ দুআ পড়তেন- ‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা যালজালালি ওয়াল ইকরাম’।

মুসনাদে আবী ইয়ালাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ حَفِظْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَانَ يَقُولُهُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (৬)

৪ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৭২ হাদীস নং ৮৪৪ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৫ সহীহ মুসলিম : পৃ. নং ২৩৫ হাদীস নং ৫৯১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৬ মুসনাদে আবী ইয়ালা : ২/৩৬৩ হাদীস নং ১১১৮ (দারুল মামুন, দামেশক)

অর্থাৎ আবু হারুন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললাম আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনো জিনিস তথা দুআ ইয়াদ রেখেছেন, যা তিনি সালাম ফিরানোর পর বলতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআ বলতেন 'সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'।

আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন:

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (১)

অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম আবু ইয়াল্লা রহ. (স্বীয় মুসনাদে) বর্ণনা করেন এবং এর সব রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

এসব ছাড়াও হাদীস গ্রন্থাদিতে আরো অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, দুআ শুধু নামাযের ভিতরেই নয়; বরং ভিতর-বাহির উভয় স্থানেই রয়েছে। তাই শুধু নামাযের ভিতরের দুআকে স্বীকার করে নামায পরবর্তী দুআসমূহ অস্বীকার করা মূলত হাদীসের একাংশ মানা ও আরেক অংশ না মানার মতো, যা সত্যিকার মুসলিমের পরিচায়ক নয়।

মজার ব্যাপার হলো, এ লা-মাযহাবীরা প্রতিটি কথায় যেখানে ইমাম বুখারী রহ. এর নাম উচ্চারণ করে ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায় তিনি কিন্তু স্বীয় সহীহ বুখারীতে সালাম পরবর্তী দুআ ও যিকরের একটি অধ্যায় এনেছেন, যার শিরোনাম হলো- (২) باب الذكر بعد الصلاة অর্থাৎ নামায পরবর্তী যিকর ও দুআ সংক্রান্ত অধ্যায়। প্রমাণিত হলো নামাযের বাহিরেও দুআ আছে।

ইমাম বুখারী রহ. এর আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَعَمَ أَنَّ سَمِعَهُ مِنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

১ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/৩৪৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৭১ অধ্যায় নং ১৫৫ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

وَسَلَّمَ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبْنِي أَيُّمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَذِيتُهُ أَوْ شَتْمَتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ. (৩)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দু'হাত উত্তোলন করে এ দুআ করতে দেখেছেন, (এর দু'টি পরের বর্ণনায় اللَّهُم্ম অর্থাৎ 'হে আল্লাহ!' কথাটি অতিরিক্ত এসেছে) আমি তো মানুষই, তাই আমাকে আপনি মানবসুলভ (ভুল-ত্রুটির কারণে) ভৎসনা করবেন না। আমি যদি আপনার কোনো মুমিন বান্দাকে কষ্ট বা গালি দিয়ে থাকি এজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।

লা-মাযহাবীদের বড় ইমাম শাইখ আলবানী এ হাদীসটিকে صحيح (অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা আদাবুল মুফরাদের উক্ত হাদীসটির সাথে উল্লেখ করা আছে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

وهو صحيح الإسناد. (৫)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

সুনানে তিরমিযীতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ
مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ
يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. (৬)

অর্থাৎ সালমান ফারসী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লাজুক, দয়ালু। যখন বান্দা তার নিকট দু'হাত উত্তোলন করে তখন তিনি খালী

৩ আল আদাবুল মুফরাদ : পৃ. ৩১৫ হাদীস নং ৬১০ (মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ)

৪ প্রাগুক্ত

৫ ফাতহুল বারী : ১১/১৪২ হাদীস নং ৬৩৪১ সংশ্লিষ্ট (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

৬ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৫৫৯ হাদীস নং ৩৫৫৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটা একক সূত্রে বর্ণিত হাসান হাদীস।

ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত) বললেও শাইখ আলবানী এটাকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে (১) صحيح লিখে বুঝানো হয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

(২) وسنده جيد.

অর্থাৎ এর সনদ ভালো ও উত্তম।

ইমাম বুখারী রহ. এর জুযউ রাফইল ইয়াদাইনে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا يَدَيْهِ حَتَّى بَدَا ضَبْعَاهُ يَدْعُو بِهِنَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (৩)

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দু'হাত উত্তোলন করতে দেখেছি, এমনকি (হাত উঠাতে উঠাতে) স্বীয় দু'বগল উন্মোচন করতঃ দু'হাত উঠিয়ে উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর জন্য দুআ করলেন।

শাইখ বদীউদ্দীন রাশেদী হাদীসটির তালীকে বলেন:

(৪) رجاله كلهم موثقون.

অর্থাৎ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সিকা তথা নির্ভরযোগ্য।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিতে গিয়ে বলেন:

(৫) ومن الأحاديث الصحيحة.

১ প্রাণ্ড

২ ফাতহুল বারী : ১১/১৪৩ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

৩ জুযউ রাফইল ইয়াদাইন : পৃ. নং ১৪৩ হাদীস নং ১৫৭ (দারুল ইবনি হযম, বৈরুত)

৪ প্রাণ্ড (তালীক)

৫ ফাতহুল বারী : ১১/১৪২ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

এসকল হাদীস থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, দুআয় হাত উঠানো বিদআত নয়; বরং দুআর অন্যতম একটি আদব। এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যা আদাবুল মুফরাদ, জুয'উ রাফ'ইল ইয়াদাইন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও আ. রায়যাক-সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন, তাফসীর এবং সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দুআ শুধু নামাযের ভিতরে না; বরং বাহিরেও আছে এবং ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দুআ করতে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং এটাকে বিদআত বলার কোনো অবকাশ নেই।

স্বয়ং লা-মাযহাবীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বড় আলেম আল্লামা আ. রহমান মুবারকপুরী রহ. স্বীয় বিখ্যাত তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলেন:

قُلْتُ: الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ جَائِزٌ.
لَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (৬)

অর্থাৎ আমি বলি যে, আমার নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, নামাযের পর দুআয় দু'হাত উত্তোলন করা বৈধ। যদি কেউ তা করে তাতে ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই।

মোটকথা, বিভিন্ন হাদীসের সমষ্টিতে এ বিষয়টি প্রমাণ হয় যে, ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা যাবে, একে বিদআত বলা যাবে না। তবে ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দুআ করার প্রচলন যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম এবং তাবেয়ীন রহ. এর যুগে ছিলো না বিধায় এটাকে সুন্নাত বলারও অবকাশ নেই। অন্যান্য যেকোনো সময় যেমন দুআ করা জায়েয তেমনি ফরয নামাযের পরও দুআ করা জায়েয। কিন্তু এটাকে জরুরী মনে করা কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ভাবা ও যারা দুআ করে না তাদেরকে

৬ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহু জামি তিরমিযী : ২/২০২ হাদীস নং ২৯৯ সংশ্লিষ্ট আলোচনার শেষাংশ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

গালি-গালাজ ও কটাক্ষ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনটা করলে তখন এ দুআ করাটা সবার নিকটই বিদআত বলে পরিগণিত হবে।

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হলো- ফরয নামাযের পর ইমাম মুক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে দুআ করা বিদআত না হলেও পছন্দনীয় নয়। এজন্য আমি নিজে এ জাতীয় দুআ করি না বা এতে শরীক হই না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সোনালী যুগে এর কোনোই প্রচলন ছিলো না। আবার যারা সুন্নাত কিংবা আবশ্যক মনে না করে দুআ করে তাদেরকে আমি ভৎসনাও করি না। যেহেতু মৌখিক হলেও এর স্বপক্ষে কিছু হাদীস পাওয়া যায়। বিদআত তো বলা হয়, শরীয়তে যে আমলের কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এ দুআকে বিদআতও বলা যায় না এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতও বলা মুশকিল; বরং এটা বৈধ ও মুবাহ একটি আমল। বেশীর চেয়ে বেশী উত্তম বা মুস্তাহাব বলা যায়, যেমনটি অনেক আলেম মনে করেন।

৩১ তম পাঠ:

(নামাযে ইমামের ভুল হলে ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা ও
হাততালি দেয়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সমাজে প্রচলন আছে নামাজে ভুল হলে তাকবীর দেওয়া হয়, তা ভুয়া পদ্ধতি। অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে নামাযে ভুল হলে পুরুষেরা সোবহানাল্লাহ এবং মেয়েরা হাত-তালী দিবে। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৩৩৩ পৃঃ ১১৩০ নং হাদীস।

জবাব:

প্রথমত: এ প্রচলনটি হানাফী উলামায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়; বরং এটা হলো সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাবশতঃ একটি কাজ, যা ‘বাংলাদেশের হুজুরদের কাছে প্রতিষ্ঠিত’ বলে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে। হানাফীদের কোনো কিতাবে লিখা নেই যে, নামাযে ভুল হলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে হবে। আমরাও বরং এ কথা বলি যে, নামাযে ভুল হলে পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে এবং মেয়েরা হাতে হাত মারবে।

দ্বিতীয়ত: অভিযোগটিতে বলা হয়েছে যে, মেয়েরা হাতে তালি দিবে। কিন্তু এটা একটি ভুল অর্থ। কেননা, হাদীসে মেয়েদের জন্য تَصْفِيْق (তাসফীক) শব্দ এসেছে, যার শাব্দিক অর্থ হাততালি হলেও মুহাদিসীনে কিরাম এখানে অর্থ করেছেন হাতে হাত মারা। তা এভাবে যে, ডান হাতের দু’আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জিতে হালকা আওয়াযে আঘাত করা। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে।

এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস দেখুন-

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ
وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. (১)

১ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ২৩৬ হাদীস নং ১২০৩ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নামাযে ভুল হলে লুকমা ও স্মরণ করানোর নিয়ম হলো) পুরুষদের জন্য ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা আর মেয়েদের জন্য হাতে হাত মারা।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ..... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ! مَنْ رَأَاهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُّفَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (১)

অর্থাৎ সাহল বিন সাদ সাঈদী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ইমামতি ও ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ঘটনা) বর্ণিত যে,..... এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপার কী? আমি তোমাদের হাতে হাত মারতে দেখলাম যে! (শোনো,) নামাযে কারো কিছু ঘটলে (পুরুষরা) ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে। ‘সুবহানাল্লাহ’ বললেই তার (লোকমার) প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। হাতে হাত মারা তো নারীদের কাজ।

সুনানে আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: قَوْلُهُ: التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ - تَضْرِبُ بِأَصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى. (২)

অর্থাৎ ইসা বিন আইয়ুব রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, স্ত্রীলোকদের জন্য হাতে হাত মেরে শব্দ করার পদ্ধতি এই যে, তারা ডান হাতের আঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের তালুতে মারবে।

এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

১ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ১৪৫ হাদীস নং ৬৮৪

২ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১২০ হাদীস নং ৯৪৮ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

শাইখ আলবানীও এটাকে সহীহ বলেছেন, যা হাদীসটির শুরুতে (৩) صحيح লিখে বুঝানো হয়েছে।

এসকল হাদীস থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রমাণ হয় যে, নামাযে কোনো সমস্যা কিংবা ভুল ইত্যাদি হলে পুরুষদের করণীয় হলো, 'সুবহানাল্লাহ' বলা। আর মেয়েদের কণ্ঠস্বরও যেহেতু সতরের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তারা মুখে শব্দ না করে হাতের আঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করে আওয়ায করবে। আর আমাদের জানামতে এ মাসআলা নিয়ে কারো কোনো মতভেদ নেই

৩২ তম পাঠ:

(নামাযে দুইবার সালাম ফিরানোর মাধ্যমে
সাহ্ সিজদা করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সমাজে প্রচলন আছে যে, ইমামের ভুল হলে শুধু একদিকে সালাম ফিরিয়ে একটা সিজদা দিয়ে দরুদ দোয়ামাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরায় তা ভুয়া পদ্ধতি। নামাজে ভুল হলে বৈঠকের সব দোয়া পড়ে দুটি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে। অসংখ্যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৪৫ পৃঃ ৭৯১ নং হাদীস।

জবাব:

আমাদের নিকট সিজদায়ে সাহ্‌র নিয়ম হলো- শেষ বৈঠকে বসে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এরপর দুটি সিজদা দিবে এবং সিজদা থেকে উঠে তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাবে।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এক: সালাম দুই স্থানে হবে। বৈঠকে বসে সাহ্‌ সিজদার জন্য একবার সালাম ফিরাবে আর প্রথম সালাম ও সিজদায় সাহ্‌ শেষে তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে নামায শেষ করার জন্য একবার সালাম ফিরাবে। দুই: তাশাহুদও দু'বার পড়া হবে। সিজাদায়ে সাহ্‌র পূর্বে একবার এবং সিজদায়ে সাহ্‌র পরে একবার। আর এসবগুলোই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالُوا:

قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বিকালের এক সালাতে (আসরের নামাযে) ইমামতি করলেন। আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমাদের নিয়ে তিনি (ভুলে) দু'রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন।(নামাযে রাকাত সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়টি সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম কর্তৃক অবগত হলে) এরপর তিনি এগিয়ে এসে নামাযের বাদ পড়া অংশ আদায় করলেন। তারপর (যথারীতি বৈঠক করে) সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইবনে সীরীন রহ.-কে (যিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী ও হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী) জিজ্ঞাসা করতো, পরে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরিয়েছিলেন? তখন ইবনে সীরীন রহ. বলতেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, তারপর (অর্থাৎ দু'সিজদা শেষে) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দ্বিতীয়বার) সালাম ফিরিয়েছিলেন।

এ হাদীস থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, সিজদায়ে সাহতে মোট দুইবার সালাম ফিরাবে। একবার সিজদায়ে সাহ করার পূর্বে। আর দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহ করার পর অর্থাৎ নামাযের শেষ সালাম।

উল্লেখ্য যে, এটা ঐসময়ের ঘটনা যখন নামাযের মাঝে কথা বলা জায়েয ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাকআত নামায পড়ে কথা বলে নামাযে ভুল হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে ঐ অবস্থায়ই নামাযে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করেন এবং ভুলের জন্য সাহু সিজদা দেন।

সুনানে আবু দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَّكَتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلَّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা সুত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাকআত না চার রাকআত পড়েছো, এ ব্যাপারে সন্দিহান হবে আর তোমার অধিক ধারণা চার রাকআতের প্রতি হবে তখন তুমি (শেষ বৈঠকে প্রথমে) তাশাহহুদ পড়বে। এরপর বসা অবস্থায়ই শেষ সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। এরপর পুনরায় তাশাহহুদ (ও দুআ-দরুদ) পাঠ করে শেষ সালাম ফিরাবে।

এ হাদীসটির সনদে কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা হাসানের স্তরের চেয়ে নিম্নমানের হবে না। আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এ হাদীসটির সনদের উপর এক দীর্ঘ আলোচনা করে শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে:

وبالجملة فالحديث حسن. (২)

অর্থাৎ মোটকথা হাদীসটি হাসান।

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

১ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ১২৮ হাদীস নং ১০২৮ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ ইলাউস সুনান : ৭/১৬৩ হাদীস নং ১৮৭৭ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. (৩)

অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদা) মুসল্লীদের নিয়ে নামায পড়ানোকালে (একটি) ভুল করলেন। তখন (শেষ বৈঠকে) দু'টি সিজদায়ে সাহু দিলেন। এরপর (পুনরায়) তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. (৪)

অর্থাৎ এটা এককভাবে বর্ণিত হাসান হাদীস।

ইমাম হাকিম রহ. এ হাদীসটিই সামান্য শব্দ কমবেশ করে বর্ণনা করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ. (৫)

অর্থাৎ এটা ইমাম বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ হাদীস।

হাফেয যাহাবী রহ.ও ইমাম হাকিম রহ. এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন:

عَلَى شَرْطِهِمَا. (৬)

অর্থাৎ হ্যাঁ, এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

উল্লেখ্য যে, সিজদায়ে সাহুর পূর্বে তাশাহহুদ পড়া নিয়ে কারো কোনো ইখতিলাফ নেই। ইখতিলাফ হলো সিজদায়ে সাহু পরবর্তী তাশাহহুদ পড়া নিয়ে। আমরা বলি যে, সিজদায়ে সাহু দেয়ার পরও তাশাহহুদ পড়তে হবে।

৩ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৮৬ হাদীস নং ৩৯৫ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৪ প্রাগুক্ত

৫ মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৪৬৯ হাদীস নং ১২০৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৬ প্রাগুক্ত (তালখীস)

এরপর দরুদ, দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে। এ হাদীসটি সিজদায়ে সাহ পরবর্তী তাশাহহুদ পড়ার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ أَوْ يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ
يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا. (১) وفي رواية
الطحاوى زيادة "وَيُسَلِّمُ". (২)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভুল (এর নমুনা) হলো, যখন বসার পরিবর্তে দাঁড়াবে কিংবা দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসবে বা (চার/তিন রাকআত নামাযের) দুই রাকআতে সালাম ফিরাবে, তখন সে (বৈঠকে বসে তাশাহহুদ পড়ে) স্বীয় নামাযের শেষে বসা অবস্থায়ই দু'টি সিজদা দিবে, যার পর (আবার) তাশাহহুদ পড়বে। তাহাবীর বর্ণনায় এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, 'এবং (তাশাহহুদ পরবর্তী) সালাম ফিরাবে'।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

ورجاله أشهر من أن يثنى عليهم غير خصيف وهو حسن الحديث إذا
روى عنه ثقة... فالأثر حسن جيد. (৩)

অর্থাৎ এর সব রাবীই প্রশংসার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শুধু খাসীফ ব্যতীত। আর তার থেকে নির্ভরযোগ্য কোনো রাবী হাদীস বর্ণনা করলে তিনি হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী হিসেবে বিবেচিত হন (যার বর্ণিত হাদীস হাসান তথা প্রমাণযোগ্য বলে বিবেচিত)। সুতরাং হাদীসটি হাসান ও ভালো তথা উত্তম সনদে বর্ণিত।

১ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ২/৩১২ হাদীস নং ৩৪৯১ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

২ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ১/৪৪১ হাদীস নং ২৫৬৫ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৩ ইলাউস সুনান : ৭/১৬৪ হা. নং ১৮৭৮ সংশ্লিষ্ট (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

এ সংক্রান্ত আরো একাধিক হাদীস ও বহু আসার বর্ণিত হয়েছে, যা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আ. রায়যাক, সুনানে বাইহাকী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুল আসার সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থাদিতে এসেছে। এসব বর্ণনা ও রিওয়াযাত থেকে এ কথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সিজদায়ে সাহুতে সালাম দু'বার হবে। একবার সিজদায়ে সাহুর পূর্বে। আর দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ পরবর্তী অর্থাৎ নামাযের শেষ সালাম। তদ্রূপ তাশাহুদও দু'বার পড়তে হবে। একবার সিজদায়ে সাহুর পূর্বে। আর দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহুর পর যখন তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরানো হয়।

৩৩ তম পাঠ:

(জুমুআর খুতবা চলাকালীন মসজিদে এলে
নামায না পড়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে নামাজ না পরে বসে। এটা ভুল পদ্ধতি। অনেক সহীহ হাদীস আছে খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ আসলে দুরাকাআত নামাজ পরে বসতে হবে।

(বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৯০ পৃঃ ৮৮৩, ৮৮৪ নং হাদীস)।

জবাব:

পূর্বে গত হয়েছে যে, এক সময় নামাযে সালাম দেয়া ও তার উত্তর দেয়া, কথা বলা, এদিক ওদিক তাকানো অনেক কিছুই বৈধ ছিলো। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এসব রহিত হয়ে যায় এবং নামাযে স্থির থাকার আদেশ অবতীর্ণ হয়। খুতবার বিষয়টি ঠিক অনেকটা এরকমই যে, প্রথমত খুতবা চলাকালীন কথাবার্তা, সালাম আদান-প্রদান, নামায আদায় করা ইত্যাদি জায়েয ছিলো। পরবর্তীতে সবই রহিত হয়ে যায় এবং খুতবা চলাকালীন অন্যকিছু করা থেকে বিরত থেকে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার নির্দেশ দেয়া হয়।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا^(১)

অর্থাৎ আর যখন (নামায ও খুতবায়) কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো।

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি নামায ও জুমুআর খুতবার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। বিজ্ঞ মুফাসসিরীনে কিরাম এমনটিই বলেছেন। সুতরাং জুমুআর খুতবা ও নামাযে কুরআন পড়া অবস্থায় সব কাজ বন্ধ রেখে তা শ্রবণ করা ও চুপ থাকাই হলো কুরআনী নির্দেশ, এর অন্যথা করা যাবে না।

খুতবার সময় সব ধরনের কাজ থেকে বিরত থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে থেকে এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ
لَغَوْتَ. (২)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম খুতবা প্রদানকালীন তুমি যখন তোমার সঙ্গী (মুসল্লী) ভাইকে বলবে, ‘চুপ করুন’ তখন তুমি (তার মতোই) ভুল করলে।

এ হাদীসে খুতবা শোনার অসীম গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মন্দ ও শরীয়াহবিরোধী কাজ থেকে বাধাপ্রদান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান, যা নফল নামায ও নফল ইবাদাত থেকে অনেক উর্দ্বের ও উত্তম আমল। খুতবা চলাকালীন কথা বলা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তথাপি কেউ যদি কোনো মুসল্লীকে খুতবার সময় কথা বলতে দেখে ‘ভাই চুপ করুন’ বলে তাহলে সেও শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী। কারণ, খুতবা চলাকালীন সব ধরনের আমল থেকে বিরত থেকে মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করাই শরীয়তের আদেশ। তাই এমতাবস্থায় ‘নাহি আনিল মুনকার’ তথা অসৎ কাজে বাধাদানও শরীয়ত সমর্থন করে না। সুতরাং এ হাদীস অত্যন্ত স্পষ্ট যে, খুতবার সময় নাহি আনিল মুনকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও করা যাবে না।

এ থেকে খুতবার সময় নফল নামায না পড়ার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। যেহেতু নাহি আনিল মুনকার প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয ও ঈমানী দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও যেখানে তা নিষিদ্ধ সেথায় নফল নামায পড়ার অবকাশ থাকে কোথায়; বিবেকবান পাঠক মাত্রই তা উপলব্ধি করবেন।

সুনানে কুবরা বাইহাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْبَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
السُّكْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمُضٍ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُرُوجُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلصَّلَاةِ يَغْنِي يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমআর দিন জুমআর নামাযের জন্য ইমামের বের হওয়া তথা মিম্বারে বসা নামায বন্ধ করে দেয় এবং তার কথা তথা খুতবা (মানুষের) কথাবার্তাকে নিষেধ করে দেয়।

এ হাদীসটির সবগুলো বর্ণনাকারীই সিকা তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

সুনানে বাইহাকীর মুহাক্কিক আল্লামা ইসলাম মানসূর আ. হামীদ বলেন:

هذا إسناد رجاله ثقات. (২)

অর্থাৎ এটা এমন একটি সনদ, যার সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

এরপর তিনি ইমাম বাইহাকী রহ. কর্তৃক এ হাদীসটির সনদের উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন:

والحق أنه حديث مستقل الإسناد وليس فيه ما يחדشه أصلاً. (৩)

অর্থাৎ বাস্তব কথা হলো, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক সনদে বর্ণিত একটি হাদীস। আর এতে হাদীসকে ত্রুটিপূর্ণ করে এমন কোনো সমস্যা একেবারেই নেই।

এ হাদীসেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন নামাযের জন্য স্বীয় রুম থেকে বের হবে তখন থেকে সব ধরনের নামায পড়া নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, خروج الإمام তথা ‘ইমামের বের হওয়া’ বিশেষ একটি

১ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ৩/৫৫০-৫৫১ হাদীস নং ৫৬৮৭ (দারুল হাদীস, কায়রো)

২ প্রাগুক্ত (তালীক)

৩ প্রাগুক্ত (তালীক)

পরিভাষা। এর দ্বারা জুমআর দিন খুতবার জন্য ইমামের বের হওয়াকে বুঝায়। পূর্বের মসজিদগুলোতে মিহরাবের সাথে ইমামের জন্য আলাদা একটি কক্ষ থাকতো। ইমাম সাহেব সুনাত ইত্যাদি পড়ে তথ্যই অবস্থান করতেন। যখন নামাযের সময় এবং জুমআর দিন খুতবার সময় হতো তখনই ইমাম সাহেব স্বীয় কক্ষ থেকে বের হয়ে মুসল্লীদের সামনে আসতেন।

মু'জামে তাবরানীর উদ্ধৃতিতে মাজমাউয যাওয়ায়েদে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ

أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ.⁽⁸⁾

অর্থাৎ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যখন ইমাম মিম্বারে থাকাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে তখন (তার) কোনো নামায ও কথা বলার অনুমতি নেই, যতক্ষণ না ইমাম (নামায থেকে) অবসর হয়।

এ হাদীসটিতে ايوب بن نُهَيْك (আইয়ুব বিন নুহাইক) নামক একজন রাবী

আছে, যাকে ইমাম আবু হাতেম রহ.-সহ অনেকেই দুর্বল রাবী বললেও ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর স্বীকৃতি দিয়ে স্বীয় আস সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ রাবীটি কিছুটা বিতর্কিত। এমতাবস্থায় তার হাদীস হাসান তথা প্রমাণযোগ্য হওয়ার দাবি রাখে। আর যদি হাদীসটিকে যঈফও বলা হয় তথাপি এর সমর্থনে আরো একাধিক হাদীস থাকায় তা হাসান লিগাইরিহী বলে গণ্য হবে, যা মুহাদিসীনে কিরামের নিকট প্রমাণযোগ্য।

এ সংক্রান্ত আরো মারফূ হাদীস রয়েছে। সময় ও স্থান সংকুলান না হওয়ায় সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

এখন আমরা এখানে কতিপয় আসার তথা সাহাবা ও তাবয়ীনের ফতোয়া ও কর্মপন্থা উল্লেখ করছি, যা বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় করবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের বর্ণিত হয়েছে:

8 মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/৪০৭ হাদীস নং ৩১২০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)- উল্লেখ্য, এ হাদীসটি বর্তমান প্রকাশিত তাবরানীতে নেই। সম্ভবত তা তাবরানীর হারিয়ে যাওয়া অংশে ছিলো।

حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا
كَانَا يَكْرَهُانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ. (১)

অর্থাৎ আতা রহ. সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা ও ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তাঁরা (জুমআর দিন) ইমাম বের হওয়ার পর নামায ও কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। (অর্থাৎ তখন কোনো ধরনের নামায বা কথা বলার অবকাশ আছে বলে মনে করতেন না।)

এ সনদে হাজ্জাজ বিন আরতাত নামক একজন রাবী আছেন, যার ব্যাপারে পূর্বে একাধিকবার গত হয়েছে যে, তিনি হাসানুল হাদীস (যার বর্ণিত হাদীস হাসান হয়) পর্যায়ের রাবী। আর বাকী সবাই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হাদীসটি হাসান।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে আরো বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ
بْنِ مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: أَذْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ. فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ. (২)

অর্থাৎ সালামা বিন আবু মালেক কুরাযী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগ পেয়েছি। সে সময় জুমআর দিন ইমাম (তথা উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) যখন বের হতেন তখন আমরা নামায পড়া ছেড়ে দিতাম। আর (ইমাম) যখন কথা তথা খুতবা বলা শুরু করতেন তখন আমরা কথাবার্তা বলাও ছেড়ে দিতাম।

এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এর সনদ সহীহ। দেখুন তাকরীবুত তাহযীব।^(৩)

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৭২ হাদীস নং ৫২১৮ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ প্রাগুক্ত : ৪/১০৩ হাদীস নং ৫৩৩৯

এ হাদীস থেকে এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, জুমআর দিন ইমাম বের হলে নামায না পড়ার মাসআলাটি শুধু এক দু'জন সাহাবীর আমল ও ফতোয়া নয়; বরং ব্যাপকভাবে এ বিধানটি চালু ছিলো যে, জুমআর দিন ইমাম মিস্বারে থাকা অবস্থায় কোনো নামায পড়া যাবে না।

পাঠক, আপনি নিজেই ভাবুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বাস্তবিকই ইমামের খুতবা পাঠদানকালে নামায পড়ার আদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সাহাবায়ে কিরামের এ দুঃসাহস কোথা থেকে হবে যে, তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অমান্য করবেন? এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন এটা মেনে নেয়া হবে যে, এ বিধানটি ইসলামের প্রথমদিকে ছিলো যখন খুতবার সময় শুধু নামাযই নয়; বরং কথা বলাও বৈধ ছিলো। পরবর্তীতে তা সব রহিত হয়ে যায়।

এর প্রমাণ হলো উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সংঘটিত ঘটনা।

মুসনাদে আবী ইয়ালাতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ أَوْ كَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَبِيٌّ. فَظَنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ. فَلَمَّا انْقَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَبِيُّ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ أَبِيُّ أَطْعَمَ أَبِيًّا. (8)

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক জুমআয়) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (মসজিদে) প্রবেশ

৩ তাকরীবুত তাহযীব : পৃ. নং ২৯০ জীবনী নং ৩১৩৮, পৃ. নং ৫৯১ জীবনী নং ৭৫৫৯, পৃ. নং ৬০২ জীবনী নং ৭৭৩৭, পৃ. নং ১৩৪ জীবনী নং ৮৪৫- (দারুল রশীদ, হালব) শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা কত্বক তাহকীককৃত

৪ মুসনাদে আবী ইয়ালা : ৩/৩৩৫ হাদীস নং ১৭৯৯ (দারুল মামুন লিভুরাস, দামেশক)

করলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এরপর উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (এসে) তাঁর পাশে বসলে তিনি তাকে কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন বা কোনো একটি কথা বললেন। তখন উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তার জবাব দিলেন না। ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ভাবলেন, এটা কোনো রাগবশতঃ হবে হয়তো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায থেকে অবসর হলেন তখন ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বললেন, হে উবাই! আমার জবাব দিতে আপনাকে কিসে বাধা দিলো? তিনি বললেন, আপনি তো (খুতবার সময় কথা বলায় যেনো) আমাদের সাথে জুমআয় উপস্থিতই ছিলেন না। তিনি বললেন, কেনো? (আমি তো উপস্থিত ছিলামই) উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, (কেননা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুতবা প্রদানকালে আপনি কথা বলছিলেন। (অথচ এসময় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।) এরপর ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উবাই সত্য বলেছে, উবাই এর কথা মেনে নাও।

এ হাদীসটির সব রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য বিধায় এটার সনদ বিশুদ্ধ।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

وإسناده صحيح. (১)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু প্রথমে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এরপর তথা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। এ কারণে খুতবার সময় কথাবার্তা না বলার বিধান তাঁর জানা ছিলো না। তিনি পূর্বের মতো এখনও কথাবার্তা বলা জায়েয ভেবেছিলেন। পরবর্তীতে উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্ত ঘটনায় তিনি বুঝতে পারলেন, সে বিধান রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন থেকে খুতবার সময় আর কথা বলার অবকাশ নেই।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَهَيْكٍ عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ
كَانَ حَسَنًا؟ (২)

অর্থাৎ সাময়িক রহ. সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকজন তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো, যে ইমামের খুতবাকালীন সময়ে নামায পড়ে। তখন ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা বললেন, তোমরা ভেবে দেখো তো, যদি মুসল্লীদের সকলেই তা শুরু করে দেয় তাহলে কি তা সুন্দর হবে?

এ হাদীসের সবগুলো রাবীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যেমনটি আসামায়ে রিজাল গ্রন্থাদি থেকে জানা গিয়েছে। সুতরাং এর সনদ সহীহ হবে।

এ হাদীসে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু জুমআর খুতবা প্রদানকালে কোনো ধরনের নামায না পড়ার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে সুন্দর একটি যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, খুতবার সময় নামায পড়ার বিধান থাকলে যদি কখনো সব মুসল্লীই নামায পড়া শুরু করে দেয় তাহলে চিন্তা করুন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? এদিকে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের উদ্দেশ্য করে খুতবা দিচ্ছেন আর ওদিকে মুসল্লীরা সব নামাযে ব্যস্ত! শরীয়তে এমন অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।

মোটকথা খুতবা চলাকালীন মুসল্লীদের কাজ একটাই তা হলো খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা আর গুনতে না পেলে চুপ থাকা। এ সময় কথাবার্তা বা নামায পড়ার কোনো বিধান নেই। ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بُجَاهِدٍ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنََّّهُمْ كَرِهُوا
الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (৩)

২ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ৩/২৪৫ হাদীস নং ৫৫১৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৭১ হাদীস নং ৫২১০ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

অর্থাৎ মুজাহিদ রহ., আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আতা রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, জুমআর দিন ইমাম খুতবা প্রদানকালে তাঁরা নামায পড়া পছন্দ করতেন না।

মুসান্নাফে আ. রাযযাক ও ইবনে আবী শাইবাতে সহীহ ও হাসান সনদে আরো অনেক আসার তথা সাহাবা ও তাবেরীনের ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা খুতবার সময় নামায পড়াকে বৈধ মনে করতেন না। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ., গুরাইহ রহ., উরওয়া রহ., ইবনে শিহাব যুহরী রহ., সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রহ.-সহ আরো অনেকে।

বাকী যেসব হাদীসে খুতবার সময় কেউ আসলে তৎক্ষণাৎ দু'রাকাআত নামায পড়তে বলা হয়েছে, সেসব হাদীসের একাধিক জবাব দেয়া হয়েছে।

এক: এ বিধানটি প্রথমে ছিলো, পরবর্তীতে খুতবার সময় কথা বলা, নামায পড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমনটি পূর্বের উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ঘটনা থেকে আঁচ পাওয়া যায়। আর এটা হতেই পারে যে, প্রথমে একরকম বিধান থাকলেও পরবর্তীতে তা রহিত করে অন্যরকম বিধান চালু করা হবে।

দুই: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার সময় আগত সে ব্যক্তিকে যখন নামায পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন তখন কিছু সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা পড়া বন্ধ রেখেছিলেন, যা অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়। দেখুন: সুনানে দারা কুতনী^(১) ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা^(২)।

এতে প্রমাণিত হলো যে, খুতবা চলাকালীন নামায পড়া যাবে না। পড়তে হলে ইমামের খুতবা বন্ধ করতে হবে। যেমন মুসান্নাফে আ. রাযযাকে একটি বর্ণনায় ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, খুতবার সময় এ দু'রাকাআত নামায শুধু তারই পড়ার অবকাশ আছে, যার জন্য ইমাম খুতবা পড়া বন্ধ করে তাকে নামায পড়তে আদেশ দিবে।^(৩)

১ সুনানে দারা কুতনী : ২/১১ হা. নং ১৬০২-১৬০৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৭০ হা. নং ৫২০৬ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৩ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৩/২৪৪ হা. নং ৫৫১৩ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

তিন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত তখনও খুতবা শুরুই করেননি; বরং মিম্বারে বসেছিলেন মাত্র খুতবার দেয়ার উদ্দেশ্যে। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে নাসায়ীর সুনানে কুবরাতে।^(৪)

সুতরাং অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত **يخطب** অর্থ হবে খুতবা দেয়ার ইচ্ছা করছিলেন। অর্থাৎ তিনি মিম্বারে বসেছিলেন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে, তখনও খুতবা শুরু করেননি। আরবী ভাষায় এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মোটকথা, খুতবা চলাকালীন খুতবা শোনা ও চুপ থাকা আবশ্যিক, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস ও আসারেও এর পক্ষে মযবুত প্রমাণ পাওয়া যায়। এর বিপরীতে খুতবার সময় নামায পড়ার হাদীসগুলো দ্ব্যর্থবোধক নয়; বরং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর এর জবাবও আমরা সংক্ষিপ্তাকারে পূর্বে উল্লেখ করেছি। শেষ এ কথা বলে বিষয়টির ইতি টানছি যে, খুতবার সময় খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা ওয়াজিব। আর নামায পড়াটা হলো নফল। সুতরাং ওয়াজিব ছেড়ে নফলে মগ্ন হওয়া শরীয়ত ও বিবেক কোনোটিই সমর্থন করে না।

৪ সুনানে কুবরা, নাসায়ী : ২/২৭৬ হা. নং ১৭১৭ (মুআসাসসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৩৪ তম পাঠ

(জুমআর নামাযে তিন খুতবা দেয়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

জুমআর তিনটা খুতবা দেওয়া হয় তার কোন প্রমাণ হাদীসে নাই। অনেক সহীহ হাদীসে আছে জুমআর খুতবা দুটা দিতে হবে।

বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ১৯০ পৃঃ ৮৮১ নং হাদীস।

জবাব:

আমাদের ঠিক জানা নেই পৃথিবীর কোথাও জুমআর নামাযে তিনটি খুতবা দেয়া হয় কি না। হাদীস এবং ফিকহের কিতাবগুলোতে স্পষ্টভাবে দুটি খুতবার কথা এসেছে। আমাদের জানা মতে এতে কারো মতভেদ নেই।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا. (১)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ (বিন উমার) রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জুমআর দিন) দুটি খুতবা দিতেন, দু'খুতবার মাঝে একবার বসতেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. (২)

১ সহীহ বুখারী : পৃ. নং ১৮৫ হাদীস নং ৯২৮ (বাইতুল আফকার, বৈরুত)

২ সহীহ মুসলিম : পৃ. নং ৩৩৩ হাদীস নং ৮৬১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিন (প্রথম) খুতবা দাঁড়িয়ে দিয়ে (একবার) বসতেন। এরপর (দ্বিতীয় খুতবার জন্য) পুনরায় দাঁড়াতেন। ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, যেভাবে লোকেরা এখন করে।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সুপ্রাচীন গ্রন্থ বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে আল্লামা কাসানী রহ. খুতবার সুন্নাত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

وَأَمَّا سُنَنُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً خَفِيفَةً يَفْتَتِحُ فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْظُ وَيَذْكُرُ وَيُقْرَأُ سُورَةً ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى يَحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (৩)

অর্থাৎ খুতবার সুন্নাতসমূহের বর্ণনা: একটি সুন্নাত হলো, দু'খুতবা দেয়া, যা হাসান বিন যিয়াদ রহ. সূত্রে আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিয়ম হলো খুতবা ছোট করে দেয়া। হামদ দ্বারা খুতবা শুরু করবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাত দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়বে। ওয়ায ও নসীহত করবে এবং একটি সূরা পড়বে। এরপর সামান্য সময় বসবে। এরপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ দ্বারা দ্বিতীয় খুতবা শুরু করবে। আল্লাহর প্রশংসা করতঃ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিবে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করবে এবং মুমিন নর-নারীর জন্য দুআ করবে।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, জুমআর নামাযে তিন খুতবা দেয়া হানাফী উলামায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়। আর জুমআর নামাযে তিন খুতবা কারা কোন দেশে দেয়- তা আমাদের জানা নেই।

আমাদের ধারণা জুমআর দিন নামাযের পূর্বে অনেক মসজিদেই কিছু দীনী কথাবার্তা হয়, সম্ভবত নাদান লা-মাযহাবীরা এ বয়ানকেই খুতবা ভেবে বসেছে। আর এ ভ্রান্ত ধারণায় আছে যে, বাংলাদেশের হুজুররা জুমআর নামাযে তিন খুতবা দেয়। কিন্তু এটা যে কতো বড় ভুল ও ভ্রান্তি-তা বিবেকবান পাঠক মাত্রই অবগত হওয়ার কথা!

প্রথমত: খুতবা আরবীতে হয় আর জুমাআপূর্ব বয়ান নিজ এলাকা বা দেশের ভাষায় হয়। উল্লেখ্য, লা-মাযহাবীরা মনে করে খুতবা বাংলায় দিলেও হবে। কিন্তু এটা ভুল একটি মতবাদ ও স্পষ্ট ভ্রান্তি। কেননা, খুতবা হলো এমন একটি যিকির, যা দু'রাকআত নামাযের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ যোহরের নামাযের দু'রাকআত জুমআ হিসেবে পড়া হয় আর দু'রাকআত নামাযের পরিবর্তে খুতবা পড়া হয়। এমনটিই বর্ণিত আছে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে।^১ আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নামাযে বাংলা বা অনারবী কোনো ভাষা ব্যবহারের অনুমতি নেই বিধায় নামাযের পরিবর্তে প্রদত্ত খুতবায়ও আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে না। খুতবা হয় একমাত্র আরবীতেই, অনারবী ভাষায় নয়।

সালমান ফারসী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ অনেক সাহাবীই ফারসী ভাষা জানতেন। তথাপি পারস্য বিজয়কালে তথায় জুমআর খুতবা সে দেশের ভাষা হিসেবে কখনো ফার্সীতে দেননি; বরং আরবীতেই খুতবা দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, দীনী দাওয়াত ও সাধারণ ওয়ায-নসীহতে তাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন। বুঝা গেলো, জুমআর খুতবা ও সাধারণ বয়ান এক জিনিস নয়।

দ্বিতীয়ত: বয়ান বসে দেয়া হয় অথচ খুতবা পড়তে হয় দাঁড়িয়ে।

তৃতীয়ত: খুতবার সময় কথাবার্তা বলা নিষেধ, কিন্তু সাধারণ বয়ানের সময় তা নিষিদ্ধ নয়।

এরকম আরো অনেক পার্থক্য আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুতবা ও সাধারণ বয়ান এক নয়। তাই এ কথা বলা ভুল যে, বাংলাদেশে তিন খুতবা দেয়া হয়; বরং বলতে হবে বাংলাদেশে দু'টি খুতবাই হয়। আর খুতবার পূর্বে নিজ ভাষায় কিছু দীনী কথা বলা হয়, যাকে বয়ান বা ওয়ায বলে।

৩৫ তম পাঠ: (জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

সমাজের হুজুররা জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না দলিল ছাড়া।
জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে।
বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৪০০ পৃঃ ১২৫৪ নং হাদীস ।

জবাব:

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া সম্বন্ধে হানাফী উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তা কিরাত হিসাবে পড়া যাবে না। অবশ্য দুআর পূর্বের হামদ ও সানা হিসাবে পড়া যাবে। যেহেতু সূরা ফাতিহার দু'টি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কিরাত, যা সাধারণ নামাযে পড়া হয়। আর এ সূরায় যেহেতু আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা রয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে সানা বা প্রশংসাবাণীও বলা যায়। যেরকমভাবে সূরা ফালাক, নাস এক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন তা কুরআনের সূরা, তেমনি তার দ্বারা জিন-ভূত ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে তা একটি দুআ। এ কারণেই নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয হয়) ও হায়েয-নেফাসওয়ালী নারী সূরা ফালাক, নাস কুরআনের আয়াত ও কিরাত হিসাবে পড়তে পারবে না। কিন্তু দুআ হিসেবে পড়তে পারবে। এতে প্রতিভাত হয় যে, কিছু কিছু সূরার দু'টি দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে:

وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي
الْمُحِيطِ وَالتَّجْنِيسِ وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِيهَا بِنْيَةِ الدُّعَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ قَرَأَهَا
بِنْيَةِ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا تَحِلُّ الدُّعَاءِ دُونَ الْقِرَاءَةِ. (২)

অর্থাৎ মুসান্নিফ তথা লিখক (জানাযার নামাযে) কিরাত পড়ার কথা বলেননি। কেননা, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। আল মুহীত ও আত-তাজনীস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, যদি কেউ জানাযার নামাযে দুআর নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি তা কিরাতের নিয়তে পড়ে তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, জানাযার নামায তো দুআর স্থান, কিরাত পড়ার স্থান নয়।

এ পর্যায়ে আমরা কতিপয় হাদীস ও আসার উল্লেখ করবো, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, জানাযার নামায মূলত দুআ, অন্যান্য সাধারণ নামাযের মতো রুকু-সিজদাবিশিষ্ট কোনো নামায নয় এটা যে, তাতে কিরাত পড়তে হবে। আর এটাও প্রমাণ হবে যে, ফাতিহা বা নির্দিষ্টভাবে কোনোকিছু পড়া তাতে আবশ্যিক নয়।

সুনানে আবু দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. (১)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমরা মাইয়েতের জানাযার নামায পড়বে তখন তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দুআ করো।

হাদীসটি ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. স্বীয় সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণনা করে একে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (২)

শাইখ আলবানী এ হাদীসটির ব্যাপারে বলেন:

حسن. (৩)

১ সুনানে আবু দাউদ : পৃ. নং ৩৬১ হাদীস নং ৩১৯৯ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ বুলুগুল মারাম : পৃ. নং ২১৩ হা. নং ৫১৭ (দারুল আতা, রিয়াদ)

অর্থাৎ হাসান বা উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, জানাযার নামাযে দুআই হলো মূল উদ্দেশ্য। আর এটা সবার জানা যে, দুআর অন্যতম দু'টি আদব ও নিয়ম হলো, প্রথমে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করা এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা তারপর দুআ করা।

যেমন সুনানে তিরমিযীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَلْ هَذَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِيْغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (8)

অর্থাৎ ফুযালা বিন উবাইদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ না পড়ে দুআ করতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ লোক তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। এরপর তাকে ডেকে তাকে বা অন্যকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে (দুআ করতে চায় সে যেনো) তখন প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পড়ে তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করে এরপর তার যা মনে চায় দুআ করে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন এটা হাসান, সহীহ হাদীস।

৩ সুনানে আবু দাউদ (আলবানীর হুকুম লাগানোযুক্ত) : পৃ. নং ৩৬১ হাদীস নং ৩১৯৯ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৪ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ৫৪৩ হাদীস নং ৩৪৭৭ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

শাইখ আলবানীও এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।^(১)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, দুআর পূর্বে হামদ ও দরুদ পড়া দুআর অন্যতম দু'টি আদব। আর জানাযার নামাযও যেহেতু মাইয়েতের জন্য দুআ তাই এতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। এজন্য জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও সানা পড়া হয়। চাই 'সুবহানাকাল্লাহুমা.....' বলার মাধ্যমে হোক কিংবা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন.....' বলার মাধ্যমে।

মোটকথা, আল্লাহর স্তুতিমূলক কিছু পড়া চাই, তবে এতে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়াটাই শর্ত নয়। আর দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়া হয়। আর তৃতীয় তাকবীরের জানাযা নামাযের মূল উদ্দেশ্য মাইয়েতের জন্য দুআ করা হয়। আর চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে মাইয়েতের জন্য দুআপর্ব শেষ করা হয়।

এ পর্যায়ে আমরা দেখবো, জানাযার নামাযে নির্দিষ্টভাবে কোনো দুআ, হামদ ও দরুদ পড়া আবশ্যিক করে দেয়া হয়নি; বরং এতে যেকোনো দুআ, হামদ ও দরুদ পড়া যেতে পারে।

যেমন সুনানে ইবনে মাজাহতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَّا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ؛ يَغْنِي لَمْ يُؤَقَّتْ. (২)

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের জন্য অন্য কিছুতে এমন সুযোগ রাখেননি, যা রেখেছেন জানাযার নামাযে। অর্থাৎ তাঁরা এতে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেননি (যা পড়াটা আবশ্যিক)।

১ প্রাণ্ডজ

২ সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃ. নং ১৬৫ হাদীস নং ১৫০১ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

এ হাদীসটির সনদ হাসান ও প্রমাণযোগ্য।

আল্লামা আহমাদ শাকের রহ. মুসনাদে আহমাদের তালীকে এ হাদীসটি সনদের মান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

إسناده حسن. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটির সনদকে কেউ কেউ যঈফ বলতে চেয়েছেন। কেননা, এতে হাজ্জাজ বিন আরতাত নামক একজন রাবী আছে, যে যঈফ। কিন্তু বাস্তবতা হলো হাজ্জাজ সবার মতেই যঈফ নয়; বরং তার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য আছে। তাকে একেবারে যঈফ বলে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। ইনসাফের কথা হলো, ইনি হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী, যার বর্ণিত হাদীস হাসান হয়। আল্লামা যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। এর আলোচনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার বর্ণিত হাদীস হাসান বলে বিবেচিত হয়।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যিক নয়। কারণ, জানাযার নামাযে কোনো কিছুকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, এটা পড়তেই হবে। তাই নির্দিষ্টাকারে সূরা ফাতিহা পড়াকে আবশ্যিক মনে করা স্পষ্ট ভ্রান্তি। তবে সানার পরিবর্তে হামদ (প্রশংসাবাণী) হিসেবে সূরা ফাতিহা পড়তে কোনো সমস্যা নেই।

মুআত্তা মালেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وَضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمَدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

৩ মুসনাদে আহমাদ : ১১/৫৫৭ হাদীস নং ১৪৭৮২ আহমাদ শাকের রহ. কর্তৃক তাহকীককৃত- (দারুল হাদীস, কায়রো)

وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا
فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. (১)

অর্থাৎ আবু সাঈদ মাকবুরী রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে জানাযার নামায পড়তে হয়? তখন আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে তা বর্ণনা করছি। আমি মাইয়েতের পরিবারবর্গের সাথে জানাযা অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যাই। যখন জানাযা (মাটিতে) রাখা হয় তখন (নামাযের উদ্দেশ্যে) তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর নবীর উপর দরুদ পাঠ করি। এরপর মাইয়েতের জন্য এ বলে দুআ করি, আল্লাহুমা আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা.....।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীসটির সব রাবীই সিকা তথা নির্ভরযোগ্য ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হওয়ায় এর সনদ অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের সহীহ।

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যিক নয়; বরং প্রশংসামূলক যে কোনো দুআই যথেষ্ট। চাই তা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে হোক বা সানার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোনো প্রশংসামূলক দুআর মাধ্যমে।

মুআত্তা মালেকে আরেকটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَازَةِ. (২)

অর্থাৎ নাকে রহ. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা জানাযার নামাযে কোনো কীরাত (সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা) পড়তেন না।

এ হাদীসটির সনদও সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ; বরং সনদের জগতে এটা সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদগুলোর অন্যতম একটি।

১ মুআত্তা মালেক : ২/৩১৯-৩২০ হাদীস নং ৭৭৫ (মুআসসাসাতু যাইদ বিন সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত, আবুধাবী)

২ প্রাগুক্ত : ২/৩২০ হাদীস নং ৭৭৭

এ থেকেও প্রমাণ হয় যে, জানাযার নামাযে কোনো সূরা কিরাত স্বরূপ পড়া যাবে না। এজন্য যেসব হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা এসেছে বুঝতে হবে তা কিরাত হিসাবে নয়; বরং প্রশংসামূলক দুআ ও বাণী হিসেবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ. (৩)

অর্থাৎ আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. সূত্রে মুহাম্মাদ বিন সারীন রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি জানাযার নামাযে কিরাত পড়তেন না।

এ হাদীসটির রাবীত্রয় কোনো ধরনের মতভেদ ছাড়াই নির্ভরযোগ্য ও অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের সিকা। বিধায় এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْأَوَّلَى الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلَاثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ وَالرَّابِعَةُ سَلَامٌ تُسَلَّمُ. (৪)

অর্থাৎ ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম তাকবীর আল্লাহর সানা তথা প্রশংসা করা, দ্বিতীয় তাকবীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ, তৃতীয় তাকবীর মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীর সালাম, যদ্বারা তুমি সালাম ফিরাবে।

এ হাদীসটিরও সবগুলো রাবী বিনা মতভেদে সিকা ও হাদীসের ইমাম। সুতরাং এ সনদটিও নির্বিধায় সহীহ ও বিশুদ্ধ।

এ সংক্রান্ত আরো প্রচুর হাদীস ও আসার পাওয়া যায়, যা তাহাবী, আল আওসাত, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আ. রায়যাক, আল আসার-সহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে।

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৭/২৫৮ হাদীস নং ১১৫২৩ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৪ কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ : ২/৭১ হাদীস নং ২৩৮ আবুল অফা আফগানী কর্তৃক তাসহীহ ও তাহকীককৃত- (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আল্লামা আইনী রহ. বলেন:

وَقَالَ ابْنُ بَطَالٍ: وَمَنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُنْكَرُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمَنْ التَّابِعِينَ: عَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذَرِ: وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: قِرَاءَةُ الْقَاتِحَةِ لَيْسَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي بِلَدِنَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. (১)

অর্থাৎ ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, আর যারা জানাযার নামাযে কিরাত পড়তেন না; বরং তা প্রত্যাখ্যান করতেন তাদের মধ্য হতে অন্যতম হলেন, উমার বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী বিন আবু তালেব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং তাবেরীদের মধ্য হতে আতা রহ., তাউস রহ., সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ., মুহাম্মাদ বিন সারীন রহ., ইবনে জুবাইর রহ., শাবী রহ. ও হাকাম রহ.। ইবনে মুনযির রহ. বলেন, মুজাহিদ রহ., হাম্মাদ রহ. ও সুফইয়ান সাওরী রহ. এ মতই পোষণ করেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমাদের শহর তথা মদীনা শরীফে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রচলন নেই।

১ আল বিনায়া : ৩/২৫১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৩৬ তম পাঠ:

(তারাবীহ নামাযের রাকআত সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

তারাবীর নামাজ ২০ রাকআত মর্মে হাদীসটি ভুয়া। রাসূল (সাঃ) এবং তার সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। তারাবীর নামাজ ৮ রাকআত তা অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৩০৯ পৃঃ ১০৮১ নং হাদীস।

জবাব:

তারাবীহ এমন একটি নামায, যা শুধু রমযান মাসেই পড়া হয়, অন্য মাসে নয়। আর তাহাজ্জুদ নামায সারা বছরই পড়া যায়। সুতরাং যে নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বছর আদায় করেছেন তা তারাবীহ নামায হতে পারে না; বরং তাকে তাহাজ্জুদ নামায বলে। অথচ লা-মাযহাবীরা এ তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যার প্রমাণ দেয়।

সহীহ বুখারীতে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. (২)

অর্থাৎ আবু সালামা বিন আ. রহমান রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায কেমন ছিলো? তিনি বললেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ও অন্যান্য মাসে এগারো রাকআতের বেশী (রাতের নফল) নামায পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা নিয়ে প্রশ্ন করো না। এরপর আবার চার রাকআত পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না। এরপর তিন রাকআত (বিতর নামায) পড়তেন।

এ হাদীস থেকে তারাবীহ নামায প্রমাণিত হয় না; বরং এটা তাহাজ্জুদ নামায বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত: তারাবীহ নামায শুধু রমযান মাসে পড়া হয়, অথচ উক্ত হাদীসে সারা বছর রাতের নামাযের কথা বলা হয়েছে, যা একমাত্র তাহাজ্জুদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বছর তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।

দ্বিতীয়ত: তারাবীহ নামায দু'রাকআত করে পড়া হয়। অথচ উক্ত হাদীসে চার রাকআত করে পড়ার কথা এসেছে।

তৃতীয়ত: আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা এর বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ নামায খুব দীর্ঘায়িত হতো। অথচ তারাবীহ নামায স্বাভাবিক নিয়মে পড়া হয়। একমাত্র তাহাজ্জুদ হলেই এরকম দীর্ঘ নামায হতে পারে।

চতুর্থত: তারাবীহ নামায পড়া হয় শুরু রাতে। অথচ এ হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, এটা শেষরাতের নামায ছিলো। যেহেতু তিনি এ আট রাকআত নামাযের পর আরো তিন রাকআত নামায পড়েছেন, যা ছিলো বিতরের নামায। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর নামায শেষরাতে পড়তেন। আর তার পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।

বুঝা গেলো, আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা এর উক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদের আলোচনা এসেছে, তারাবীহ নামাযের কথা এতে উল্লেখ নেই।

এখন আমরা বিশ রাকআত তারাবীহ নামাযের পক্ষে কতিপয় হাদীস ও আসার উল্লেখ করছি, যার দ্বারা বিশ রাকআতের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সুনানে বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بَعِثَرِينَ رُكْعَةً وَالْوُتْرَ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (১)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে জামাত ছাড়াই বিশ রাকআত (তারাবীহ) ও বিতর পড়তেন। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, এ হাদীসটি আবু শাইবা ইবরাহীম বিন উসমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ রাবী।

এ সনদে আবু শাইবা ইবরাহীম বিন উসমান নামক একজন রাবী আছে, যিনি যঈফ। বিধায় এ হাদীসটির সনদ যঈফ। তবে এর সনদ যঈফ হলেও এ হাদীসানুসারে আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, বিশ রাকআত তারাবীহ নামায মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে এবং সাহাবাযুগ থেকেই মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শহরে বিশ রাকআত তারাবীহর ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় এ ধরনের যঈফ হাদীসকে بالقبول متلقى (মুতালাক্কা বিল কবুল) তথা ব্যাকপভাবে উম্মাহর নিকট সমাদৃত হাদীস বলে। আর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ জাতীয় হাদীস অনুপাতে আমল করা ওয়াজিব ও আবশ্যিক। আর তা সহীহ হাদীস তো দূরের কথা; বরং মুতাওয়াতির (অকাট্যভাবে প্রমাণিত) হাদীসকে পর্যন্ত রহিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই উক্ত হাদীসের সনদ যঈফ হলেও হাদীসটি মুতালাক্কা বিল কবুল হওয়ায় তা অনেক সহীহ হাদীস থেকেও বহু শক্তিশালী।

এ ব্যাপারে আল্লামা যারকাশী রহ. স্বীয় আন নুকাতে বলেন:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ إِذَا تَلَقَّيْتُهُ الْأُمَّةَ بِالْقَبُولِ عَمَلٌ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ حَتَّى إِنَّهُ

يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَقْطُوعَ. (১)

১ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৬৯৮ হাদীস নং ৪৬১৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ যঈফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর নিকট সমাদৃত হবে তখন বিশুদ্ধ মতানুসারে তদানুযায়ীই আমল করতে হবে। এমনকি তা মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা অকাট্য প্রমাণকেও রহিত করার ক্ষমতা রাখে।

লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন ইমাম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়া রহ. এ ধরনেরই একটি যঈফ হাদীসের প্রামাণ্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

فَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِاتِّصَالِ الْعَمَلِ بِهِ فِي سَائِرِ الْأُمُصَارِ وَالْأَعْصَارِ
مِنْ غَيْرِ انْكَارِ كَافٍ فِي الْعَمَلِ بِهِ. (২)

অর্থাৎ এ হাদীসটি যদিও (সনদের বিচারে) প্রমাণিত না তথাপি সব যুগে ও সব শহরে এ অনুপাতে কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন আমলের ধারাবাহিকতা এ হাদীস অনুসারে আমল করার জন্য যথেষ্ট।

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, হাদীস যঈফ হলেই তা পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না; বরং উম্মাহর মাঝে সে হাদীস অনুপাতে ব্যাপকভাবে আমল জারি থাকলে তা অনেক বিশুদ্ধ হাদীসের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে যায়। আমাদের আলোচ্য হাদীসটির ঠিক একই অবস্থা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও উম্মাহর অধিকাংশ উলামা যেহেতু বিশ রাকআতের বিষয়টি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শহরে সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে এ বিশ রাকআতই চালু রয়েছে। এমনকি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদীনায় আজ পর্যন্ত বিশ রাকআত তারাবীহই চলে আসছে বিধায় উক্ত হাদীসটি মুতালাক্কা বিল কবুল (ব্যাপকভাবে সমাদৃত) হাদীস বলে বিবেচিত এবং অন্যান্য যেকোনো সহীহ হাদীসের বিপরীত হলেও তা অগ্রগণ্য ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. অধিকাংশ উলামার মাযহাব বর্ণনা করতঃ বলেন:

قَالَ أَبُو عِيسَى.... وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ

১ আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ : ১/৩৯০ (আযওয়াউস সালাফ, রিয়াদ)-

النوع الثالث: في معرفة الضعيف

২ আর রুহ : পৃ. নং ২১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً. (৩)

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন..... আর (উম্মাহর) অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত বিশ রাকআত তারাবীহ'র মত গ্রহণ করেছেন। আর এটাই সুফইয়ান সাওরী রহ., ইবনে মুবারক রহ. ও শাফেয়ী রহ. এর মত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমাদের শহর মক্কা নগরীতে আমি (লোকদেরকে) এমনই পেয়েছি। তারা বিশ রাকআত (তারাবীহ) নামায আদায় করতেন।

লা-মাযহাবীদের সবচে আস্থাভাজন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,
وَإِنْ كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ فَالْقِيَامُ بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ. وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ. (৪)

অর্থাৎ আর যদি মুসল্লীরা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতে সামর্থবান না হয় তাহলে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াই উত্তম। আর এ অনুযায়ীই অধিকাংশ মুসলমানের আমল চলে আসছে।

এসব বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, বিশ রাকআত তারাবীহ নামাযের মারফু হাদীসটি যঈফ হলেও ব্যাপকভাবে উলামায়ে উম্মাহ তা গ্রহণ করায় তা 'হাদীসে মুতালাক্কা বিল কবুল' এর স্তরে পৌঁছে গেছে বিধায় এ হাদীস অনুপাতেই এখন আমল করতে হবে। সনদের বিচারে যঈফ হলেও প্রামাণ্যতা ও আমলযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই প্রাধান্য পাবে।

এখন আমরা কতিপয় আসারে সাহাবা ও তাবেয়ীন উল্লেখ করছি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সোনালী যুগ থেকেই বিশ রাকআতের আমল চলে আসছে।

সুনানে বাইহাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَجْوَيه الدِّينَوْرِيُّ
بِالدَّامَغَانِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ

৩ সুনানে তিরমিযী : পৃ. নং ১৫১ হাদীস নং ৮০৬ সংশ্লিষ্ট (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

৪ মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া : ১১/৪৯৫-৪৯৬ (দারুল হাদীস, কায়রো)

الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَأُونَ بِالْمَثْنِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عَصِيَّتِهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ. (১)

অর্থাৎ সায়েব বিন ইয়াযীদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকআত তারাযীহ পড়তেন। রাবী বলেন, তারা (ইমামগণ তারাযীহ'র নামাযে) কয়েকশ আয়াত পড়তেন। আর উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগে মুসল্লীরা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে থাকতেন।

এ হাদীসটির সনদের সবগুলো রাবী সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

এছাড়াও এ হাদীসটিকে ইমাম নববী রহ. আল খুলাসাতে, হাফেয ইবনুল ইরাকী রহ. শরহুত তাকরীবে, ও হাফেয সুয়ূতী রহ. স্বীয় আল মাসাবীহতে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। (৩)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

جَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوُتْرِ. (৪)

অর্থাৎ আতা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে তথা সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীনকে বিতরসহ তেইশ রাকআত তারাযীহ পড়তে দেখেছি।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

১ সুনানে কুবরা, বাইহাকী: ২/৬৯৮-৬৯৯ হা. নং ৪৬১৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ: নং ২৮৯ হাদীস নং ৭৭৭ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ আত-তালীকুল হাসান মাআ আসারিস সুনান : পৃ. নং ২৯০ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/২২৪ হাদীস নং ৭৭৭০ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

واسناده حسن.

অর্থাৎ এর সনদ হাসান। আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৯১ হা. নং ৭৮১ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

সুনানে বাইহাকীতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

وَأَبَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَبَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَبَا أَبُو الْحَصِيبِ قَالَ: كَانَ يَوْمَنَا سُؤْيُ
بْنُ غَفْلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رُكْعَةً. (৫)

অর্থাৎ আবুল খাসীব রহ. বর্ণনা করেন যে, সুওয়াইদ বিন গাফালা রহ. (যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুসলমান হওয়া বিখ্যাত তাবেয়ী) রমযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে ইমামতি করতেন। তাতে তিনি (চার রাকআত পরপর) পাঁচবার বিশ্রাম নিয়ে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। (উল্লেখ্য যে, এটা ছিলো সাহাবাযুগের ঘটনা)।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده حسن. (৬)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান (উত্তম সনদে বর্ণিত)।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي
رَمَضَانَ عِشْرِينَ رُكْعَةً وَيَقْرَأُ بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رُكْعَةٍ. (৭)

অর্থাৎ নাফে বিন উমার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আবী মুলাইকা রহ. আমাদেরকে নিয়ে রমযানে বিশ রাকআত তারাবীহ নামায পড়াতেন। আর এক রাকআতেই সূরা ফাতির (এর মতো বড় বড় সূরা) দ্বারা পড়াতেন।

এ হাদীসটির রাবীদ্বয় দু'জনই সিকা ও নির্ভরযোগ্য বিধায় এর সনদ সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে বলেন:

৫ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৬৯৯ হাদীস নং ৪৬১৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৬ আসারুস সুনান: পৃ. নং ২৯২ হাদীস নং ৭৮২ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/২২৩-২২৪ হাদীস নং ৭৭৬৫ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

(১) إسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাত্তে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي

بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. (২)

অর্থাৎ সাঈদ বিন উবাইদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, আলী বিন রাবীআ রহ. তাদেরকে নিয়ে রমযান মাসে পাঁচ তারবীহা তথা বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন এবং সাথে তিন রাকআত বিতরও পড়াতেন। (উল্লেখ্য যে, এক তারবীহাতে চার রাকআত তারাবীহ হয়।)

এ হাদীসটিরও সনদের সবগুলো রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নিমবী রহ. স্বীয় আসারুস সুনানে এ হাদীস সম্বন্ধে বলেন:

(৩) إسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

মুআত্তা মালেকে শক্তিশালী মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رُكْعَةً. (৪)

অর্থাৎ ইয়াযীদ বিন রুমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগে লোকেরা (সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীন) রমযান মাসে (বিতরের নামাযসহ মোট) তেইশ রাকআত নামায পড়তেন। অর্থাৎ বিশ রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বিতর।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের রাবীদ্বয় সিকা তথা নির্ভরযোগ্য হলেও তা মুরসাল হাদীস। মুরসাল হাদীসের স্বপক্ষে অন্যান্য বর্ণনা থাকলে তা সকল উলামার মতেই শক্তিশালী হয়ে প্রমাণযোগ্য হয়ে যায়। এটার স্বপক্ষে যেহেতু অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় বিধায় এটা সাধারণ মুরসাল নয়; বরং প্রমাণযোগ্য মুরসাল।

১ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৯২ হাদীস নং ৭৮৩ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/২২৪ হাদীস নং ৭৭৭২ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

৩ আসারুস সুনান : পৃ. নং ২৯২ হাদীস নং ৭৮৪ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ মুআত্তা মালেক : ২/১৫৯ হাদীস নং ৩৮০ (মুআসসাসাতু যায়িদ বিন সুলতান, আবুধাবী)

এজন্যই আল্লামা নিমবী রহ. এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

وإسناده مرسل قوى.

অর্থাৎ এর সনদ শক্তিশালী মুরসাল। আসারুস সুনান: পৃ. নং ২৯১ হা. নং ৭৭৮
(আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

এভাবে বিশ রাকআত তারাবীহ সংক্রান্ত আরো প্রচুর হাদীস পাওয়া যায়, যার সবগুলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত হাদীস ও আসারই বিশ রাকআত তারাবীহ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও উম্মাহর চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার ধারাবাহিক আমল ও সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা তথা ঐক্যমতপোষণ মযবুত দু'টি দলীল, যা অখণ্ডযোগ্য ও বিনাধিধায় আমলযোগ্য। মক্কা-মদীনায় আজ পর্যন্ত বিশ রাকআত তারাবীহ চালু আছে। কোনো ইতিহাসেই নেই যে, কোনো যুগে মক্কা-মদীনায় শুধু আট রাকআত তারাবীহ পড়া হয়েছে। সুতরাং হাদীস, আসার, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও উম্মাহর নিরবচ্ছিন্নধারায় চলে আসা ধারাবাহিক আমল দ্বারা প্রমাণিত বিশ রাকআত তারাবীহ আমরা তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত আট রাকআতের হাদীসের দোহাই দিয়ে কিভাবে ছাড়তে পারি? এটা বরং সম্পূর্ণ নতুন এক ফিতনা, যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বিধায় সকল মুসলিমকে এদের নিত্যনতুন নবআবিষ্কৃত ফিতনার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

৩৭ তম পাঠ:

(তারাবীহ তাড়াতাড়ি পড়া, কুরআন খতম করা ও
দুআ পড়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

তারাবীর নামাজ তারাতাড়ি পড়া এবং খতম তারাবী পড়া কোন দলীল নাই। চার রাকাত পর পর যে দোয়াটি পড়া হয় তাও ভুয়া। পৃথিবীর কোন জাল যঈফ এবং মওজু হাদীসে খুজে পাওয়া যায় না, সহীহ হাদীস তো দূরের কথা। ফরয নামাজ শেষে যে দোয়াগুলো পড়া হয় তাই পড়তে হবে।

জবাব:

মদ, মাখরাজ ও তাজবীদ ঠিক রেখে যদি একটু দ্রুত কুরআন পড়া হয় তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য মদ, মাখরাজ ঠিক না থাকলে দ্রুত কুরআন পড়া বৈধ হবে না। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে তিন ধরনের কারীই ছিলো। কিছু ছিলেন দ্রুত কিরাত পাঠকারী, কিছু মধ্যমগতিতে পাঠকারী আর কতিপয় ধীরগতিতে পাঠকারী।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرْآنٍ يَقْرَأُونَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ. (১)

অর্থাৎ আবু উসমান মাহদী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু তিনজন কারীকে রমযানে (তারাবীহ'র ইমামতির সময়) কিরাত পড়তে নির্দেশ দান করেছেন। সুতরাং এদের মধ্য থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন কারীকে (প্রত্যেক রাকআতে) ত্রিশ আয়াত করে পড়ার এবং মধ্যমগতিসম্পন্ন কারীকে পঁচিশ আয়াত করে পড়ার আর ধীরগতিসম্পন্ন কারীকে বিশ আয়াত করে পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

১ মুসান্নাফে আ. রায়যাক : ৪/২৬১ হাদীস নং ৭৭৩২ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

এ হাদীসটির চারজন বর্ণনাকারীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। তন্মধ্যে থেকে আ. রায়যাক রহ. ও সুফইয়ান সাওরী রহ. হাদীসের জগতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও স্বীকৃত ইমাম। আর তৃতীয় রাবী হলেন আসেম আহওয়াল রহ.। তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার ব্যাপারে বলেন, (২) ثقة तथा নির্ভরযোগ্য। আর চতুর্থ রাবী আবু উসমান নাহদী রহ.। তিনিও নির্ভরযোগ্য। হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, (৩) ثقة ثبت عابد, সুদৃঢ়, নির্ভরযোগ্য ও ইবাদাতগুয়ার। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, এ সনদটি অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের সহীহ।

হাদীস ও আসারে সাহাবা ও তাবেরীন থেকে খতম তারাযীহ পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা কতিপয় হাদীস ও আসার উল্লেখ করছি।

সুনানে কুবরা, বাইহাকীতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا عَنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْظِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنُوا أَوْ قَدْ أَصَابُوا. وَلَمْ يَكُرْ ذَلِكَ لَهُمْ. (৪)

অর্থাৎ সালাবা বিন আবু মালেক রহ. বর্ণনা করেন যে, রমযানের একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা মসজিদের এককোণে নামায পড়ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কী করছে? একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এরা এসব লোক, যাদের কাছে

২ তাকরীবুত তাহযীব : পৃ. নং ২৮৫ জীবনী নং ৩০৬০ (দারুল রশীদ, হালব)

৩ প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং ৩৫১ জীবনী নং ৪০১৭

৪ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ২/৬৯৭ হাদীস নং ৪৬১১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

(পূর্ণ) কুরআন ইয়াদ নেই। তাই উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (তারাবীহ নামাযে) কিরাত পড়ছেন আর তারা তাঁর সাথে মিলে জামাতে নামায পড়ছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভালো করেছে বা বললেন, ঠিক কাজই করেছে। আর এ কাজ তাদের জন্য মাকরুহ তথা অপছন্দ করলেন না।

এ হাদীসটি মুরসাল হলেও তা হাসান তথা প্রমাণযোগ্য।

ইমাম বাইহাকী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هذا مرسل حسن. (১)

অর্থাৎ এটা হাসান মুরসাল।

এ হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও তারাবীহতে কুরআন খতম করা হতো। কেননা, যারা উবাই রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর পিছনে তারাবীহ পড়তেন তারা যে কুরআন একেবারেই জানতেন না- ব্যাপারটি তেমন নয়। যেহেতু সব সাহাবীই কমবেশী কুরআন মুখস্ত রাখতেন। এটা অসম্ভব একটা বিষয় যে, রাসূলের সাহাবী হয়েও কুরআনের কোনো অংশ ইয়াদ করেননি। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, সাহাবীগণ সবাই হাফেযে কুরআন ছিলেন না। উক্ত হাদীসে ‘তাদের কাছে কুরআন ইয়াদ নেই’ কথাটির অর্থ হলো তাদের পূর্ণ কুরআন ইয়াদ নেই। অর্থাৎ তারা পূর্ণ কুরআনের হাফেয ছিলেন না। বিধায় তারাবীহ নামাযে পূর্ণ কুরআন শোনার আশায় তারা সাহাবীদের মধ্যে সবচে বড় হাফেয উবাই বিন কাব রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর পিছনে ইজ্জিদা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে যেহেতু সমর্থন করেছেন সুতরাং তা মারফু হাদীসের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে তারাবীহ’র একটি সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ তারাবীহ নামাযে কুরআন খতম করা সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত।

মোটকথা উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হলো যে, যারা হাফেয না তারা তারাবীহ নামায কোনো হাফেযের পিছনে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে পড়বে।

ইমাম বাইহাকী রহ. উক্ত হাদীসের পূর্বে শিরোনাম বেঁধেছেন এভাবে:

بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونُ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ. (২)

অর্থাৎ অধ্যায়: যারা বলে যে, তারা বীহ নামায ঐসকল লোকের জন্য (কোনো হাফেযের ইমামতিতে) জামাতে পড়া উত্তম, যারা কুরআনের হাফেয নয়।

এরপর ইমাম বাইহাকী রহ. উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন, যে হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয়, সোনালী সে যুগ থেকেই তারা বীহ নামাযে কুরআন খতম করার ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

এছাড়াও পাঠের শুরুতে মুসান্নাফে আ. রাযযাকে বর্ণিত হাদীস থেকেও তারা বীহতে কুরআন খতম করা প্রমাণিত হয়। কেননা, উক্ত হাদীসে তারা বীহ'র প্রত্যেক রাকআতে কমপক্ষে বিশ আয়াত করে পড়ার নির্দেশ দেয় হয়েছিলো। আর তারা বীহ'র প্রত্যেক রাকআতে বিশ আয়াত করে পড়লে একমাসে প্রায় দুই খতম কুরআন পড়া হয়। বেশী পড়লে তো আরো বেশী হবে।

মুআত্তা মালেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَذْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفْرَةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ. فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. (৩)

অর্থাৎ আরাজ রহ. বলেন, আমি লোকদের তথা সাহাবা এবং তাবেয়ীনকে রমযান মাসে কাফেরদের লানত করতে দেখেছি। তিনি বলেন, কারী (ইমাম) সাহেব তারা বীহ'র প্রথম আট রাকআতেই সূরা বাকারা পড়ে ফেলতেন। এরপর যখন বারো রাকআতে দাঁড়াতে তখন লোকজন লক্ষ্য করতো যে, ইমাম কিরাত অল্প করে পড়ছে।

এ হাদীসটির দু'জন রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারে আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (৪)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

২ প্রাগুক্ত : অধ্যায় নং ৫৮৮

৩ মুআত্তা মালেক : ২/১৫৯-১৬০ হাদীস নং ৩৮১ (মুআসসাসাতু যায়িদ বিন সুলতান, আবুধাবী

৪ আসারুস সুনান: পৃ. নং ২৮৮ হাদীস নং ৭৭৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

এ হাদীস থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রমযানে একাধিকবার কুরআন খতম করা হতো। সূরা বাকারা হলো আড়াই পারার মতো প্রায়। সুতরাং আট রাকআতে সূরা বাকারা শেষ করলে হয় আড়াই পারা। আর পরবর্তী রাকআতগুলোতে কিরাত অল্প করে পড়লেও প্রতিদিন বিশ রাকআত তারাবীহতে প্রায় তিন থেকে চার পারা বা আরো বেশী পড়া হয় বলে অনুমান করা যায়। এতে এক রমযানেই তিন, চার খতম কুরআন পড়া সাব্যস্ত হয়।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُجَلِّزٍ يَقُومُ

بِالْحَيِّ فِي رَمَضَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ سَبْعٍ. (১)

অর্থাৎ ইমরান বিন হুদাইর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু মিজলায রহ. রমযান মাসে নিজ এলাকায় তারাবীহ পড়াতেন। আর এতে প্রত্যেক সাতদিনে এক খতম কুরআন পড়তেন। অর্থাৎ রমযানে চার খতম কুরআন পড়তেন।

এ হাদীসটির রাবী দু'জনই সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আ. অহাব সাকাফী রহ. এর ব্যাপারে বলেন:

ثقة. (২)

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী।

আর ইমরান বিন হুদাইর রহ. এর ব্যাপারে বলেন:

ثقة ثقة. (৩)

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, নির্ভরযোগ্য (মানে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী)।

সুতরাং এ সনদটি সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৫/২২২ হাদীস নং ৭৭৫৯, (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

২ তাকরীবুত তাহযীব : পৃ. নং ৩৬৮ জীবনী নং ৪২৬১ (দারুল রশীদ, হালব)

৩ প্রাগুক্ত : পৃ. নং ৪২৯ জীবনী নং ৫১৪৮

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمُ الْيُسْرَ فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرْآنَ خَتْمَةً وَإِنْ كَانَ قِرَاءَتُهُ بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَةً وَنِصْفٌ فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ. (৪)

অর্থাৎ হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে লোকদের নিয়ে ইমামতি করে সে যেনো তাদের জন্য সহজপন্থা অবলম্বন করে। সুতরাং সে যদি ধীরগতিতে পাঠকারী হয় তাহলে যেনো এক খতম করে। আর যদি মাঝামাঝি (গতির) কিরাত হয় তাহলে দেড় খতম আর দ্রুতগতিতে পাঠকারী হলে দুই খতম করা উচিত।

এ হাদীসটির রাবীগুলোও নির্ভরযোগ্য। বিধায় এর সনদ সহীহ।

উপরোল্লিখিত হাদীস ও আসার থেকে তারাবীহ নামাযে কুরআন খতম করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বরং বুঝা যায় যে, এক রমযানে দুই, তিন ও চার খতম পর্যন্ত কুরআন পড়া হতো। আর সর্বনিম্ন কমপক্ষে এক খতম পড়া হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকেই এ ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সুতরাং এটা অস্বীকার করা অজ্ঞতা ও বোকামি বৈ কিছু নয়।

তারাবীহ নামাযে চার রাকআত পরপর যে দুআ পড়া হয় তা হানাফী উলামায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয়। আমি এ দুআটির অস্তিত্ব প্রায় শতাধিক হাদীসের গ্রন্থ ও হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাবগুলোতে বহু তালাশ করেও খুঁজে পাইনি। বুঝা যায়, এটা আমলযোগ্য নয়। সম্ভবত বেদআতীরা এ দুআটির প্রচলন ঘটিয়েছে, যা আজ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের হক্কানী উলামায়ে কিরাম এটা সমর্থন করেন না। তারাবীহ'র চার রাকআত পরপর কিছু সময় বিশ্রাম নেয়াই মূল উদ্দেশ্য। এসময়ে কোনো নির্দিষ্টকরণ ছাড়া যেকোনো মাসনূন দুআ ও ইস্তিগফার ও দরুদ পড়া যেতে পারে।

৩৮ তম পাঠ: (রমযানে রোযার নিয়ত ও ইফতারের দুআ সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

রমযান মাসে রোযার নিয়ত ও ইফতারের দোয়া পড়া হয় তাও ভুয়া। কোন সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শুধু বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করতে হবে। খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে।

জবাব:

রমযানে রোযার নিয়ত করা হয়, পড়া হয় না। নিয়ত মূলত অন্তরের কাজ হলেও নিয়তের দৃঢ়তা ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কখনো মনে মনে নিয়তের সাথে সাথে মুখেও তা উচ্চারণ করা হয়। মূল নিয়ত অন্তরেরটাই, মুখের উচ্চারণ অন্তরের নিয়তকে প্রকাশ করে মাত্র। তাই এটাকে নিয়ত বলা যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১২ নং পাঠে দ্রষ্টব্য।

রোযার ইফতারের কোনো দুআ সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় এ কথা ও দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। বরং হাসান ও সহীহ সূত্রে ইফতার সংক্রান্ত তিনটি দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে হাদীসগুলো উল্লেখ করা হলো।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي زُهْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عليه وسلم إِذَا صَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُئِمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ
أَفْطَرْتُ. (১)

অর্থাৎ আবু যুহরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোযা রেখে ইফতার করতেন তখন এ দুআ পড়তেন, ‘আল্লাহ্ম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু’।

১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৬/৩২৯-৩৩০ হাদীস নং ৯৮৩৭ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

এ হাদীসের সনদ মুরসাল হলেও হাসান, যা প্রমাণযোগ্য।

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাদীসটির তালীকে বলেন:

هذا مرسل بإسناد حسن. (২)

অর্থাৎ এটা হাসান সনদে মুরসাল একটি হাদীস।

এরপর তিনি আরো তিনজন সাহাবী থেকে হাদীসটি যঈফ সনদে উল্লেখ করে বলেন:

والمرسل وحده كافٍ. (৩)

অর্থাৎ শুধু মুরসাল হাদীসটিই (প্রামাণ্যের জন্য) যথেষ্ট।

মুত্তাদরাকে হাকিমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَطِيبُ بِمَرَوْ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْمُقَنِّعُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (৪)

অর্থাৎ মারওয়ান বিন সালেম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে দেখেছি তিনি দাঁড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে মুষ্টির বাইরের অতিরিক্ত দাঁড়িগুলো ছেঁটে ফেলেন। আর তিনি রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন, ‘যাহাবাযযমাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ’।

ইমাম হাকিম রহ. বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. (৫)

অর্থাৎ এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস।

২ প্রাগুক্ত (তালীক)

৩ প্রাগুক্ত

৪ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৫৮৪ হাদীস নং ১৫৩৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৫ প্রাগুক্ত

হাফেয যাহাবী রহ. তালখীসে বলেন:

على شرط البخارى. (১)

অর্থাৎ ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন:

إسناده حسن. (২)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ زَيْتًا ثُمَّ قَالَ: أَفْطَرُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ. (৩)

অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাদ বিন উবাদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট (ইফতারের উদ্দেশ্যে রুটির সহিত) তেল খেলেন। অন্য বর্ণনায় আছে কিশমিশ খেলেন। এরপর বললেন, ‘আফতারা ইনদাকুমুস সাইমুন ওয়া আকাল তাআমাকুমুল আবরারু ওয়া তানাজযালাত আলাইকুমুল মালাইকা’।

হাদীস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখে এমন ব্যক্তি মাত্রই বুঝবে যে, এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। যেহেতু সব রাবীগণই হাদীসের ইমাম ও স্বীকৃত ব্যক্তি।

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন:

وهذا إسناده عالٍ في الصحة. (৪)

অর্থাৎ বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সনদ।

১ প্রাগুক্ত (তালখীস)

২ সুনানে দারা কুতনী : ৩/১৫৬ হাদীস নং ২২৭৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৩ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৪/৩১১ হাদীস নং ৭৯০৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (তালীক) : ৬/৩৩৯ হাদীস নং ৯৮৩৮ (দারুল কিবলা, জেদ্দা)

উপরোল্লিখিত তিনটি প্রমাণযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইফতারের আগে-পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা আলাদা দুআ বর্ণিত আছে। সুতরাং ইফতারের শুরুতে বিসমিল্লাহ'র সহিত প্রথম দু'টি দুআ বা যেকোনো একটি এবং ইফতার শেষে এ তৃতীয় হাদীসে বর্ণিত দুআটি পড়া সুন্নাত। তাই যারা মনে করে, ইফতারের আগে-পরে সहीহ সূত্রে কোনো দুআ পাওয়া যায় না তারা অজ্ঞতার জগতে বাস করছে। আল্লাহ সবাইকে বুঝ দান করুন।

৩৯ তম পাঠ:

(ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দেয়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

ঈদাইনের নামাজ সমাজে ৬ তাকবীরে পড়া হয়। এটিও ভুয়া পদ্ধতি। কোনো সহীহ বা জঈফ কোনো মারফু হাদীস নাই। কয়েকটি আসার বর্ণিত হয়েছে তা সবগুলি যঈফ। ১৫২টি সহীহ হাদীস আছে ঈদাইনের নামাজে ১২তাকবীর দিতে হবে। তিরমিযি, মিনা প্রঃ ২১৭ পৃঃ ৫০৩ নং হাদীস।

জবাব:

ঈদের দুই রাকআত নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ও তাবেরীনের আমল ও ফতোয়ায় প্রমাণিত। লা-মাযহাবীদের মজ্জাগত একটি কুঅভ্যাস হলো, নিজ মতের বিপরীত যতো সহীহ হাদীসই থাকুক না কেনো- তা তাদের নিকট যঈফ হয়ে যাবে। যেনো এরা যঈফ হাদীস বানানোর ঠিকাদার। প্রমাণবিহীন বা ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে সহীহ ও হাসান হাদীসকে যঈফ বানানো এদের সাধারণ একটি বদ অভ্যাস, যা থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঈদের নামাযে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলে সানা পড়বে। তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে। এরপর সূরা, কিরাত পড়ে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। তাহলে প্রথম রাকআতে রুকু পর্যন্ত মোট পাঁচটি তাকবীর হলো। তন্মধ্যে একটি তাহরিমার, একটি রুকুর আর তিনটি অতিরিক্ত। আর রুকুর তাকবীর হিসাব না করলে প্রথম রাকআতে পরপর মোট চারটি তাকবীর হয়। প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে যথারীতি সূরা, কিরাত সমাপ্ত করে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকু করবে। তাহলে দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ মোট চারটি তাকবীর পরপর বলা হয়। সুতরাং দুই রাকআতে মোট তাকবীর সংখ্যা হলো নয়টি। আর তাকবীরে তাহরিমা হিসাব না করলে হয় আটটি। আর শুধু এক রাকআত হিসেবে তাকবীর সংখ্যা হয় চারটি করে। সর্বাবস্থায়ই অতিরিক্ত তাকবীর ঐ ছয়টিই থাকে।

উপরের এ হিসাব এজন্য দেয়া হলো যে, হাদীসে চার, আট ও নয় তিনটি সংখ্যাই এসেছে। তাই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝানোর দরকার ছিলো। এখন আমরা ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করছি।

সুনানে আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ -الْمَعْنَى قَرِيبٌ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرُهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ. (১)

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর শাগরিদ আবু আয়েশা রহ. বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বিন আস (একবার) আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, জানাযার তাকবীরের মতো (প্রত্যেক রাকআতে) চারটি করে তাকবীর বলতেন। তখন হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবু মূসা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যখন আমি বসরার গভর্নর ছিলাম তখন এভাবেই আমি তাকবীর বলতাম। আবু আয়েশা রহ. বললেন, আমি এ ঘটনার সময় সাঈদ বিন আসের নিকট উপস্থিত ছিলাম।

নির্ভরযোগ্য ইমামদের মতানুসারে এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত ও প্রমাণযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম মুনযিরী রহ. উভয়ে এ হাদীসটির ব্যাপারে নিরব থাকা এর প্রমাণযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে।

১ সুনানে আবু দাউদ : পৃষ্ঠা নং ১৪০ হাদীস নং ১১৫৩ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

লা-মাযহাবীরদের বড় ইমাম ও মান্যবর শাইখ আলবানী বলেন:

(১) حسن صحيح.

অর্থাৎ উত্তম সনদে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

(২) إسناده حسن.

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

এ হাদীসের একজন রাবী আবু আয়েশাকে কেউ কেউ মাজহুল বললেও তাদের দাবিটি সঠিক নয়। কেননা, মাজহুল বলে, যার থেকে কমপক্ষে দু'জন বর্ণনাকারীও পাওয়া যায় না। অথচ আবু আয়েশা থেকে ইমাম মাকহুল রহ. ও খালেদ বিন মাদান রহ. নামক দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছে। এ কারণেই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাকে (৩) مقبول (গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত) রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আ. রহমান বিন সাওবান রহ. (অর্থাৎ আ. রহমান বিন সাবেত বিন সাওবান) নামক রাবীকে কেউ কেউ যঈফ বললেও ইনসাফগার ইমামগণ তাকে সিকা তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন:

(৪) ليس به باس.

অর্থাৎ তার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই।

ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. সিকা রাবীদের ক্ষেত্রেও এরকম বাক্য বলেন। মানে তিনি এ জাতীয় বাক্য বলে সিকা রাবী বুঝিয়ে থাকেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযে চারটি করে দু'রাকআতে মোট আটটি তাকবীর বলতেন। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরিমা বাদে রুকূর তাকবীরসহ চারটি এবং দ্বিতীয় রাকআতেও রুকূর তাকবীরসহ চারটি মোট আটটি তাকবীর। আর তাকবীরে তাহরিমা হিসাব করলে মোট নয়টি তাকবীর হয়।

১ প্রাপ্ত

২ আসারুস সুনান : পৃষ্ঠা নং ৩৬৫, হাদীস নং ৯৯৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৩ তাকবীরুত তাহযীব : পৃষ্ঠা নং ৬৫৪ জীবনী নং ৮২০২ (দারুন্ন রশীদ, হালব)

৪ তাহযীবুল কামাল : ১৭/১৫ জীবনী নং ৩৭৭৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

শরহু মাআনিল আসারে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنِي الْوَضِيعُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي
بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ
قَالَ: لَا تَنْسَوُا كَتِّبِيرَ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ. (٥)

অর্থাৎ কাসেম আবু আ. রহমান রহ. বর্ণনা করেন, আমাকে জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায পড়ালেন। তাতে তিনি চারটি চারটি করে (দু'রাকআতে মোট আটটি) তাকবীর বললেন। নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসে বললেন, ভুলে যেও না, জানাযার তাকবীরের মতো (চারটি করে তাকবীর হবে)। বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

এ হাদীসটির সনদ প্রমাণযোগ্য।

ইমাম তাহাবী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

هذا حديث حسن الإسناد. (٦)

অর্থাৎ এটা উত্তম সনদে বর্ণিত একটি হাদীস।

এ হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাকআতে চারটি করে তাকবীর হবে। প্রথম রাকআতে রুকূর তাকবীরসহ চারটি এবং দ্বিতীয় রাকআতেও রুকূর তাকবীরসহ চারটি, উভয় রাকআতে মোট আটটি তাকবীর হয়। আর তাকবীরে তাহরিমা হিসাব করলে মোট নয়টি তাকবীর হয়। এর সমর্থনে হাদীস দেখুন।

শরহু মাআনিল আসারে মুকারিব সনদে বর্ণিত হয়েছে:

يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
الْوَاسِطِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ حُذَيْفَةَ

৫ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ৪/৩৪৫ হাদীস নং ৭২৭৩ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৬ প্রাগুক্ত

وَأَبِي مُوسَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ. (১)

অর্থাৎ মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বার্তাবাহক তাদের দু'জন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের নামাযে তাকবীরে তাহরিমা (গণ্য করা) ছাড়াই চারটি, চারটি করে (মোট আটটি) তাকবীর বলতেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

إسناده مقارب إلا أنه منقطع كما ترى. (২)

অর্থাৎ এর সনদ মুকারিব অর্থাৎ হাসানের কাছাকাছি একটা স্তর। অবশ্য এটা সূত্রবিচ্ছিন্ন, যেমনটি তুমি দেখতে পাচ্ছে।

আমি বলবো, এটা সূত্রবিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, সনদে رسول حذيفة و أبي (তাদের দু'জন থেকে) শব্দটি মুসী এর পরে কোনো কোনো নুসখায় عنهما (তাদের দু'জন থেকে) শব্দটি নেই, যার কারণে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, উক্ত হাদীসের সনদটি সূত্রবিচ্ছিন্ন। কিন্তু হিন্দুস্থানী নুসখায় (৩) عنهما শব্দটি পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে, যার অর্থ হয় হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মূসা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বার্তাবাহক তাঁদের দু'জন থেকে বর্ণনা করেন। সুতরাং এতে আর সনদগত সূত্রবিচ্ছিন্নতা থাকে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, হাদীসটির সনদ মুকারিবই নয়; বরং সরাসরি হাসান।

উল্লেখ্য যে, হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মূসা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সে বার্তাবাহকের নাম হলো আবু আয়েশা রহ., যা অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

মুসান্নাফে আ. রায়যাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

১ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ৪/৩৪৬ হাদীস নং ৭২৭৫ (আলামুল কুতুব, বৈরুত)

২ ইলাউস সুনান : ৮/১৩০ হাদীস নং ২১২৮ (ইদারাতুল কুরআন, করাচী)

৩ শরহু মাআনিল আসার, তাহাবী : ২/৩৭১ (আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ
وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ. (৪)

অর্থাৎ আলকামা রহ. ও আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু দুই ঈদের নামাযে নয়টি নয়টি করে তাকবীর বলতেন। (প্রথম রাকআতে) কিরাতের পূর্বে চারটি তাকবীর (অর্থাৎ একটি তাকবীরে তাহরিমা ও তিনটি অতিরিক্ত)। এরপর (পঞ্চম) তাকবীর বলে রুকু করতেন। আর দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে কিরাত পড়তেন। যখন পড়া শেষ করতেন তখন চারটি তাকবীর বলে তারপর রুকু করতেন (অর্থাৎ তিনটি অতিরিক্ত এবং চতুর্থটি রুকুর তাকবীর)।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح. (৫)

অর্থাৎ হাদীসটিকে ইমাম আ. রাযযাক রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (৬)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. (৭)

অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম আ. রাযযাক রহ. স্বীয় মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

৪ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৩/২৯৩ হাদীস নং ৫৬৮৬ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

৫ আদিরায়্যা : ১/২২০ হাদীস নং ২৮৬ (দারুল মারিফা, বৈরুত)

৬ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৩৬৬ হাদীস নং ৯৯৮ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৭ ইলাউস সুনান : ৮/১৩১ হাদীস নং ২১৩০ (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا:
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى فَسَأَلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ
عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا
وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا. حَتَّى قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ
فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ. (১)

অর্থাৎ আলকামা রহ. ও আসওয়াদ রহ. সূত্রে বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বসাবস্থায় ছিলেন। তাঁর পাশে ছিলেন হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু। সাঈদ ইবনুল আস এদের দু'জনকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীর বলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ইনি বলতে লাগলেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন আর তিনি বলতে লাগলেন, একে জিজ্ঞাসা করুন। তখন হুযাইফা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, একে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করুন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে (আব্দুল্লাহ) ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, প্রথমে চারটি তাকবীর বলবে। এরপর কিরাত পড়বে। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কিরাত পড়বে। এরপর কিরাত পড়ার পর চারটি তাকবীর বলবে। (সুতরাং উভয় রাকআতে মোট নয়টি তাকবীর হলো, যার ছয়টিই অতিরিক্ত)।

আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (২)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

মূলত এ হাদীসটির সবগুলো রাবীই হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও উঁচু পর্যায়ের সিকা।

১ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৩/২৯৩-২৯৪ হাদীস নং ৫৬৮৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

২ আসারুস সুনান : পৃ. নং ৩৬৫ হাদীস নং ৯৯৬ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

উল্লেখ্য যে, এটা বাহ্যত মাওকুফ তথা সাহাবীর হাদীস হলেও বাস্তবিক তা মারফু তথা রাসূলের হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

এ ব্যাপারে আল্লামা নিমবী রহ. বলেন:

قلت: هذا الموقوف في حكم المرفوع. لأن مثل هذا لا يكون من جهة الرأي والقياس. وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة على ذلك لعدم إنكارهم عليه. (৩)

অর্থাৎ আমি বলি, এ মাওকুফ হাদীসটি মারফু হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, (ইবাদাত সংক্রান্ত) এ ধরনের বিধান অনুমান ও কিয়াস করার মাধ্যমে বলা যায় না। আর সাহাবীদের একটি অংশ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্ত কথার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে তাঁর কথাকে (মৌনভাবে) সমর্থন করেছেন।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَالْيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً. (৪)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন হারেস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা-কে প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি বসরায় (থাকাকালীন) ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর বলতেন এবং (উভয় রাকআতে) কিরাত মিলিয়ে পড়তেন। (অর্থাৎ উভয় রাকআতের কিরাতের মাঝে অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন না। অতিরিক্ত তাকবীর প্রথম রাকআতে কিরাতের পূর্বে

৩ আত-তালীকুল হাসান মাআ আসারিস সুনান : পৃষ্ঠা নং ৩৬৫ (আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)

৪ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৩/২৯৪-২৯৫ হাদীস নং ৫৬৮৯ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

তিনটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতে পর তিনটি।) রাবী বলেন, আমি মুগীরা বিন শুবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে অনুরূপ করতে দেখেছি। তারপর আমি (ইসামাঈল বিন আবু অলীদ) খালেদ হাযযা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে তা করতেন? তখন তিনি আমাদের ব্যাখ্যা দিলেন হুবহু ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর অনুরূপ, যা মামার রহ. ও সুফইয়ান সাওরী রহ. এর বর্ণনায় আছে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন;

(১) إسناده صحيح.

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

আল্লামা নিমবী রহ.ও তা নকল করে সমর্থন করেছেন।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন:

(২) بإسناد صحيح.

অর্থাৎ সহীহ সনদে (এটা বর্ণিত)।

এভাবে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সংক্রান্ত আরো অসংখ্য হাদীস ও আসার রয়েছে, যার অধিকাংশই সহীহ ও হাসান সনদে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আ. রাযযাক, শরহু মাআনিল আসার, সুনানে বাইহাকী-সহ বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি ইতিপূর্বে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর নিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে আমি সনদের মান বর্ণনাসহ প্রায় ছত্রিশটি হাদীস ও আসার উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করেছিলাম যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও আমল হওয়ার পাশাপাশি তা বিজ্ঞ ও মুজতাহিদ সাহাবা, তাবেয়ীনের বিশাল একটি জামাতেরও আমল ও মাযহাব।

সেসকল সাহাবীগণের অন্যতম হলেন, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা

১ আদিরায়ী : ১/২২০ হাদীস নং ২৮৬ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

২ ইলাউস সুনান : ৮/১৩১ হাদীস নং ২১৩০ (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী)

আনহুমা, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, হুযাইফা বিন ইয়ামান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, মুগীরা বিন শুব্বা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু মাসউদ আনসারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ বিন কায়েস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-সহ প্রমুখ।

তদ্রূপ তাবেয়ীদের মধ্য থেকে আলকামা রহ., আসওয়াদ রহ., সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ., ইবনে সীরীন রহ., মাসরুক রহ., হাসান বসরী রহ., ইমাম বাকের আবু জাফর রহ., ইবরাহীম নাখয়ী রহ., আবু কিলাবা রহ., মুসাইয়িব বিন রাফে রহ., শাবী রহ. অন্যতম। এছাড়াও ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যতো শাগরিদ আছে সবাই এ মতই পোষণ করতেন

মোটকথা, ঈদের নামায অতিরিক্ত ছয় তাকবীরে পড়ার বিষয়টি সহীহ হাদীস ও সাহাবা, তাবেয়ীন এর আসার দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং সাহাবাযুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নধারায় চলে আসা আমলের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এটা কোনো খড়-কুটো নয় যে, যঈফ হাদীস বলে এক ফুঁ দিলেই তা সব উড়ে যাবে; বরং সহীহ হাদীস ও নিরবচ্ছিন্ন আমলের সুদৃঢ় রশিতে বাঁধা এর ভিত্তি।

মোটকথা, প্রশ্নে যে দাবি করা হয়েছে- আমাদের মতের পক্ষে কোনো মারফু হাদীস নাই, না সহীহ আর না যঈফ এবং কিছু আসার থাকলেও তার সবগুলো যঈফ- তা জলজ্যান্ত একটি মিথ্যা ও চরম নিকৃষ্টতম অপবাদ। যার সামান্য হাদীসের জ্ঞান আছে সেও জানে যে, এ মতের পক্ষের হাদীস ও আসার সহীহ সূত্রেই প্রমাণিত। এমনকি লা-মায়হাবীদের গুরু শাইখ আলবানী পর্যন্ত এ পরম সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনিও এ সংক্রান্ত মারফু হাদীসকে হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ইমাম এ বিষয়টিকে মেনে নিয়েছেন ও তদানুযায়ী আমল করাকে সুন্নাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মজার ব্যাপার হলো, বারো তাকবীর সংক্রান্ত সবচে ভালো ও উত্তম হাদীস মনে করা হয় যে হাদীসটিকে, যা ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন সেটাই স্বয়ং যঈফ। তাহলে বাকী হাদীসগুলোর কী অবস্থা তা বলাই বাহুল্য। আমরা এর সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক বর্ণিত সে হাদীসটি হলো:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (১)

অর্থাৎ কাসীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা থেকে, তিনি দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে কিরাতে পূর্বে সাত তাকবীর বলতেন এবং শেষের রাকআতে কিরাতে পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন।

এরপর ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন:

وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (২)

অর্থাৎ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ভালো সনদের হাদীস এটি।

কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসটিকে হাসান মানতেও রাযী নন, সহীহ তো দূরে থাক। বরং তাঁরা এ হাদীসকে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, এ হাদীসটির একজন রাবী হলেন কাসীর বিন আব্দুল্লাহ। আর মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন। যেমন ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন, সে দুর্বল বর্ণনাকারী। অন্য বর্ণনায় বলেন, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, সে মিথ্যুক রাবী। ইমাম নাসায়ী রহ. ও ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, সে পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, সে প্রত্যাখ্যাত রাবী। এভাবে সব ইমামই তার সমালোচনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন: তাহযীবুল কামাল।^(৩)

বারো তাকবীরের সবচেয়ে ভালো হাদীসটিরই এ অবস্থা! তাহলে চিন্তা করে দেখুন বাকী হাদীসগুলোর কী অবস্থা হবে? আমার লিখিত সে প্রবন্ধটিতে আমি

১ সুনানে তিরমিযী : পৃষ্ঠা নং ১০৯ হাদীস নং ৫৩৬ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাগুক্ত

৩ তাহযীবুল কামাল : ২৪/১৩৭-১৩৯ জীবনী নং ৪৯৪৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তাদের পক্ষের পনেরোটি হাদীস এনে প্রত্যেকটির দুর্বলতা তুলে ধরে এ কথা প্রমাণ করেছি যে, বারো তাকবীরের তুলনায় ছয় তাকবীরের হাদীসগুলো অনেক বেশী শক্তিশালী ও প্রমাণযোগ্য।

আর প্রশ্নে ১৫২টি যে হাদীসের কথা বলা হয়েছে তা মৌলিক হিসেবে নয়; বরং সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে। এরকম হিসাব করলে ছয় তাকবীরের হাদীসও কয়েক শত হয়ে যাবে। আল্লাহ সবাইকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৪০ তম পাঠ: (আধা সা' গম দিয়ে সাদকাতুল ফিতর দেয়া সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

বাংলাদেশে অর্ধছা ফেতরা এবং টাকা দিয়ে ফিৎরা দেয়ার যে নিয়ম আছে তা একেবারেই ভুয়া। দুইটি অপরাধ করা হয়। হাজার হাজার সহীহ হাদীস আছে এক “ছা” ফিৎরা দিতে হবে এবং প্রধান খাদ্য যেটা তাই দিতে হবে। তিরমিযী, মিনা প্রঃ ২১৭ পৃঃ ৫০৩ নং হাদীস।

জবাব:

পাঠক, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন লা-মাযহাবী এ সম্প্রদায়টি নিজেদের মতের বিপরীত প্রায় প্রতিটি মতকেই ভুয়া বলে আসছে। মূলত শব্দটি যেমন বিশ্রী তার চেয়ে তাদের বাচন ও প্রকাশভঙ্গি আরো বেশী নিকৃষ্ট। তাদের বিপরীত মতটি সহীহ হাদীস ও উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন আমলের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলেও চোখ বন্ধ করে তারা তা ভুয়া বলে মন্তব্য করে বসবে। আমরা ছোটকালে ফারসী সাহিত্যের কালজয়ী গ্রন্থ গুলিস্তাঁতে একটি আরবী প্রবাদ বাক্য পড়েছিলাম-

كل اناء يترشح بما فيه.

অর্থাৎ প্রত্যেক পাত্র তার ভিতরের নির্যাসই নির্গত করে।

এজন্য দেখবেন, বখাটে ও দুষ্ট লোকদের ভালো ও মিষ্টি কথা বা নীতিবাক্য শোনালেও আপনাকে সে কটু বাক্য গুলিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে ভালো একজন মানুষকে যদি আপনি গালিও দেন তাহলে সে কিন্তু আপনাকে গালি দিতে পারবে না। বেশীর চেয়ে বেশী শান্তভাবে ভদ্রভাষায় তার প্রতিবাদ করবে। উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যটি বাস্তব জীবনে এভাবেই সত্যায়িত হয়। যারা প্রতিটি কথায় ও নিজ মতের বিপরীত প্রতিটি মাসআলায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ না করে শুধু ‘ভুয়া’ এর বুলিই আওড়ায়, তারা কতোটুকু সত্যসন্ধানী হতে পারে- তা বিবেকবান পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন। এটা কি উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যের আওতায় পড়ে না? পাঠক, আপনিই সিদ্ধান্ত নিন।

আধা সা' গম দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা সংক্রান্ত একাধিক সহীহ ও হাসান সনদে মারফু হাদীস রয়েছে। এছাড়াও এর পক্ষে অনেকগুলো আসারে সাহাবা ও তাবয়ীনও বিদ্যমান, যার প্রামাণ্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এখন আমরা আধা সা' গম দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা সংক্রান্ত কতিপয় প্রমাণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করছি।

মুসনাদে আহমাদে হাসান সনদে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ. (১)

অর্থাৎ আসমা বিনতে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের ব্যবহৃত বর্তমানের মুদের হিসেবে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে দুই মুদ তথা আধা সা' গম দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। (উল্লেখ্য যে, চার মুদে এক সা' হয়। সুতরাং দুই মুদে হবে আধা সা'।)

আল্লামা গুয়াইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমাদের তালীকে বলেন:

حديث صحيح وهذا إسناده حسن. (২)

অর্থাৎ সহীহ হাদীস, অবশ্য এর সনদ হাসান।

কাযী আহমাদ শাকের রহ. বলেন:

إسناده حسن. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ হাসান।

আল্লামা হাইসামী রহ. তাবরানীর উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

رجاله رجال الصحيح. (১)

১ মুসনাদে আহমাদ : ৪৪/৫০১ হাদীস নং ২৬৯৩৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

২ প্রাগুক্ত (তালীক)

৩ মুসনাদে আহমাদ (তালীক) : ১৮/৩৭০ হাদীস নং ২৬৮১৫ (দারুল হাদীস, কায়রো)

অর্থাৎ এর রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী।

ইমাম হাকিম রহ. ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস সামান্য শব্দ কমবেশীর সহিত বর্ণনা করে বলেন:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. (২)

অর্থাৎ বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটা সহীহ হাদীস।

হাফেয যাহাবী রহ.ও তা সমর্থন করে বলেন:

على شرطهما. (৩)

অর্থাৎ (হ্যাঁ) এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তানুপাতে সহীহ।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আধা সা' গম দ্বারা সদকাতুল ফিতর দেয়ার প্রচলন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেই বিদ্যমান ছিলো।

মুত্তাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে:

كانوا يخرجون زكاة الفطر

অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম) সাদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। এ বর্ণনায় অবশ্য আধা সা' এর কথা উল্লেখ নেই। তথাপি মুসনাদে আহমাদের পূর্বোক্ত বর্ণনাটিই মাসআলা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মুসান্নাফে আ. রাযযাকে শক্তিশালী সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. (৪)

১ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৩/২৩২ হাদীস নং ৪৪৪১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২ মুত্তাদরাকে হাকিম : ১/৫৭১ হাদীস নং ১৪৯৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩ প্রাগুক্ত (তালখীস)

৪ মুসান্নাফে আ. রাযযাক : ৩/৩১৮ হাদীস নং ৫৭৮৫ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন সালাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতরের এক কিংবা দু'দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি এতে ইরশাদ করলেন, তোমরা দু'জনের পক্ষ থেকে এক সা' গম কিংবা ছোট বড় প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' খেজুর বা যব সাদকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করে দাও।

এ হাদীসটির সনদের অবস্থা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা সহীহ। আ. রাযযাক রহ., ইবনে জুরাইজ রহ., ইবনে শিহাব যুহরী রহ. তিনজনই হাদীসশাস্ত্রের স্বীকৃত ও বরণ্য ইমাম। হাদীসের ময়দানে তাঁদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

এ কারণেই বিখ্যাত হাফেযে হাদীস যাইলায়ী রহ. এ হাদীসটির মান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وهذا إسناد صحيح قوى. (৫)

অর্থাৎ এটা শক্তিশালী একটি বিশুদ্ধ সনদ।

অর্থাৎ তিনি শুধু 'বিশুদ্ধ' বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং তার সাথে 'শক্তিশালী' বিশেষণ যুক্ত করেছেন।

এ হাদীসে এক সা' গমে দু'জনের সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিস্কারই বুঝা যায় যে, একজন ব্যক্তির জন্য আধা সা' গম নির্ধারণ করা হয়েছে। আর খেজুর বা যব হলে প্রত্যেকের জন্যই এক সা' দিতে হবে।

সুনানে নাসায়ীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحُسَيْنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَذُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَوْمُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. (১)

অর্থাৎ হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বসরা শহরে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত তথা সাদকাতুল ফিতর আদায় করো। এতে লোকজন (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। তখন তিনি (বিষয়টি বুঝতে পেরে) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছো? তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের দীনী ইলম শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট, বড়, আযাদ, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলা সবার উপর আধা সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব (সাদকাতুল ফিতর দেয়া) ফরয করেছেন।

শাইখ আলবানী রহ. এ হাদীসটির ব্যাপারে বলেন:

صحيح المرفوع. (২)

অর্থাৎ সহীহ মারফু হাদীস।

কাযী আহমাদ শাকের রহ. বলেন:

إسناده صحيح. (৩)

অর্থাৎ এর সনদ সহীহ।

শাইখ শুয়াইব আরনাউত রহ. বলেন:

رجاله ثقات رجال الشيخين. (৪)

অর্থাৎ এর রাবীগণ সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। সবাই বুখারী, মুসলিমের রাবী।

এ হাদীসটির ব্যাপারে কারো কারো অভিযোগ হলো, হাদীসটি মুনকাতি' অর্থাৎ সূত্রবিচ্ছিন্ন। যেহেতু হাসান বসরী রহ. ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সময়ের লোক হলেও পরস্পরে তাদের সাথে নাকি দেখা

১ সুনানে নাসায়ী : পৃষ্ঠা নং ১৮৬ হাদীস নং ১৫৮০ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

২ প্রাপ্ত

৩ মুসনাদে আহমাদ (তালীক) ৩/৪০০ হাদীস নং ৩২৯১ (দারুল হাদীস, কায়রো)

৪ মুসনাদে আহমাদ (তালীক) ৫/৩২৩ হাদীস নং ৩২৯১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

সাক্ষাত হয়নি বিধায় ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাসান বসরী রহ. এর বর্ণিত হাদীস মুনকাতি' তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এ হাদীসটি মুনকাতি' হওয়ায় যঈফ হবে।

আমরা বলবো, তারা হাদীসটিকে মুনকাতি' সাব্যস্ত করে যঈফ প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদীসটি মুনকাতি' নয়। কেননা, মুনকাতি' বলার মূল ভিত্তি হলো, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাসান বসরী রহ. এর সরাসরি কোনো বর্ণনা নেই। অর্থাৎ তাদের পারস্পারিক কোনো দেখা-সাক্ষাতই হয়নি। তাই ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে তার বর্ণনা মুনকাতি' তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মুসনাদে আবী ইয়ালেতে সহীহ সনদে এমন একটি হাদীস পেয়েছি, যাতে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাসান বসরী রহ. কারো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হাদীস শোনা ও বর্ণনা করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ
الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتُ بِهِ مَكَّةَ. (৫)

অর্থাৎ হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম যেমনি আপনি মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

এ হাদীসটির সবগুলো বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

এ বর্ণনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাসান বসরী রহ. এর সাথে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাক্ষাত হয়েছে এবং হাসান বসরী রহ. তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসশাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং সম্যক অবগত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, হাদীসের পরিভাষায়

أخبرني (আমাকে বর্ণনা করেছেন) এমন একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, যা সরাসরি বর্ণনা করাকে বুঝায়। এখানে তৃতীয় কোনো মাধ্যমে বর্ণনা করার কোনো সুযোগই নেই। যদি কোনো রাবী কারো থেকে বাস্তবিকই হাদীস না শুনে থাকে আর বর্ণনা করার সময় أخبرني (আমাকে বর্ণনা করেছেন) বলে তাহলে সে মুহাদ্দিসদের নিকট كذاب তথা মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তার কোনো বর্ণনাই আর প্রমাণযোগ্য থাকে না; বরং আগে-পরের তার সব বর্ণনাই বাতিল হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি عن (যার অর্থ 'থেকে') শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে তাহলে আর তা দ্ব্যর্থবোধক হয় না; বরং সরাসরি শোনা কিংবা তৃতীয় কোনো মাধ্যমে শোনা উভয়টার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু أخبرني বললে একমাত্র সরাসরি শোনাকেই শুধু সাব্যস্ত করে।

মোটকথা, হাসান বসরী রহ. ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে হাদীসটি أخبرني শব্দ দিয়ে বর্ণনা করায় এ কথা অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে যে, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর সাথে হাসান বসরী রহ. এর সাক্ষাত ও সরাসরি বর্ণনা করার বিষয়টি প্রমাণিত। অন্যথায় أخبرني বলায় হাসান বসরী রহ.-কে মিথ্যুক বলা ও তার সব বর্ণনা বাতিল হওয়া আবশ্যিক হয়ে যায়, যা অসম্ভব ও অকল্পনীয় একটি বিষয়।

সুতরাং যখন প্রমাণিত হলো যে, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর সাথে হাসান বসরী রহ. এর সাক্ষাত হয়েছে তখন এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতার যে অভিযোগ করা হয়েছিলো তা দূর হয়ে গেলো এবং হাদীসটি সহীহ বলে সাব্যস্ত হলো। আর যারা ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর সাথে হাসান বসরী রহ. এর সাক্ষাত ও বর্ণনা করাকে অস্বীকার করেছেন তাদের নিকট হয়তো মুসনাদে আবী ইয়াল্লা এর উক্ত হাদীসটি পৌঁছেনি। আর এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় যে, কেউ যতো বড় আলেম ও ইমামই হোক না কেনো তার সব হাদীস জানা থাকা আবশ্যিক নয়; বরং সম্ভবও নয়। তাই তাঁদের উপর আমাদের কোনো আপত্তি ও অভিযোগ নেই। অভিযোগ থাকবে শুধু তাদের জন্য, যারা সত্য জানার পরও বক্রতা দেখাবে ও গোয়ারতুমি করবে। আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত দান করুন। আমীন!

মারাসীলে আবী দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ
الْفِطْرِ بِمَعْنَاهُ (يَعْنِي مُدَّتَيْنِ مِنْ قَمْحٍ).^(১)

অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দিতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এরপর ভিন্ন একটি সনদে বলেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّتَيْنِ مِنْ قَمْحٍ.^(২)

অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আধা সা' (পরিমাণ) গম সাদকাতুল ফিতর (স্বরূপ) নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন:

مسندًا وهذا أصح.^(৩)

অর্থাৎ হাদীসটি মুসনাদ (ধারাবাহিক সনদযুক্ত হাদীস) হিসেবে বর্ণিত হলেও এটা (মুরসাল হাদীস হিসেবেই) অধিক বিশুদ্ধ।

হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মাকদিসী রহ. স্বীয় তানকীহত তাহকীকে বলেন:

وأما حديث سعيد بن المسيب الذي رواه أبو داود فإسناده صحيح

كألشمس لكنه مرسل ومرسل سعيد حجة.^(৪)

১ মারাসীলে আবী দাউদ : পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬ যাকাতুল ফিতর অধ্যায় (দারুল কলাম, বৈরুত)

২ প্রাপ্ত

৩ প্রাপ্ত

৪ তানকীহত তাহকীক ফী আহাদীসিত তা'লীক : ৩/১২৮ হাদীস নং ১৬২৬ সংশ্লিষ্ট, মাসআলা নং ৩৩৪ (আযওয়াউস সালাফ, রিয়াদ)

অর্থাৎ আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. এর হাদীস, যা ইমাম আবু দাউদ রহ. (স্বীয় মারাসীলে) বর্ণনা করেছেন তার সনদ সূর্যের (কিরণের) মতো বিশুদ্ধ, কিন্তু তা মুরসাল। আর (মুহাদিসদের নিকট) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. এর মুরসাল প্রমাণযোগ্য।

আল্লামা ইবনে দাকীক আল ঈদ রহ. বলেন:

فالسند كله رجال الصحيح ومراسيل سعيد اشتهر تقويتها. (১)

অর্থাৎ সুতরাং সনদের সবগুলো রাবী সহীহ হাদীসের রাবী। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. এর মুরসালের দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা সুপ্রসিদ্ধ।

এতো গেলো মারফু হাদীস, যার সবগুলো এখানে উল্লেখই করা হয়নি। এ সংক্রান্ত আরো মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে সহীহ ইবনে খুযাইমা, সুনানে বাইহাকী, সুনানে দারা কুতনী, সুনানে আবু দাউদ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, আ. রায়যাক, তাহাবী, আল আওসাত-সহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসের গ্রন্থাবলীতে।

আর মাওকুফ তথা সাহাবা ও তাবেয়ীনের আসার ও বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা শুরু করলে এতেই বরং একটা রিসালা (ছোট বই) তৈরি হয়ে যাবে। তাই এ সংকীর্ণ স্থানে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। প্রমাণের জন্য তো পূর্বোল্লিখিত মারফু হাদীসসমূহই যথেষ্ট। তারপরও সংক্ষিপ্ত একটা ধারণার জন্য আমরা উদ্ধৃতি সহকারে কতিপয় সাহাবা ও তাবেয়ীনের নাম উল্লেখ করছি, যারা আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়া বৈধ বলতেন।

ইমাম বাইহাকী রহ. সুনানে কুবরাতে বলেন :

وَرَوَيْنَا فِي جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. (২)

১ নাসবুর রায়া : ২/৪২৩ হাদীস নং ৩৬৬৬ শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত- (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

২ সুনানে কুবরা, বাইহাকী : ৪/২৮৫, হাদীস নং ৭৭১৫ সংশ্লিষ্ট (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অর্থাৎ আর আমাদের নিকট আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়ার বৈধতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং এক বর্ণনানুসারে আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা (সহ প্রমুখ সাহাবা) থেকে।

হাফেয যাইলায়ী রহ. বলেন:

قُلْنَا: قَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْجُمُ الْعَفِيرُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. وَلَفْظُ "النَّاسُ" لِلْعُمُومِ فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَا يَضُرُّ مُخَالَفَةُ أَبِي سَعِيدٍ لِدَلِيلِكَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ سَيِّمًا إِذَا كَانَ فِيهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ نَقُولُ: أَرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا. (৩)

অর্থাৎ আমরা বলি, সাহাবীদের বিশাল একটি অংশ মুআবিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-কে সমর্থন ও অনুসরণ করেছেন। তার প্রমাণ, হাদীসে বর্ণিত উক্তিটি- فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. অর্থাৎ এরপর সকল লোক তথা সাহাবা ও তাবেয়ীন তা গ্রহণ করে নিলেন। আর النَّاسُ শব্দটি উম্ম তথা ব্যাপকতা বুঝায়। সুতরাং এতে (সাহাবা ও তাবেয়ীনের) ইজমা সাব্যস্ত হয়। আর আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বক্তব্য “কিন্তু আমি সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণই দিতে থাকবো” বলে (উক্ত ইজমার) বিরোধিতা কোনো সমস্যার কারণ নয়। কেননা, তা (শুধু একজনের বিরোধিতা) ইজমার মধ্য কোনো ত্রুটি ও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। বিশেষত যখন এতে অর্থাৎ আধা সা' গম দ্বারা

৩ নাসবুর রায়া : ২/৪১৮ হাদীস নং ৩৬৪৭ ও ৩৬৪৮ সংশ্লিষ্ট, শাইখ আওয়ামা কর্তৃক তাহকীককৃত- (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

সাদকাতুল ফিতর দেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে চার খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর মত রয়েছে। অথবা (আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্ত কথাটির ব্যাখ্যায়) আমরা বলতে পারি, (সম্ভবত) তিনি আধা সা' এর চেয়ে বেশী তথা এক সা' নফল স্বরূপ দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আধা সা' মূল ওয়াজিব সাদকাতুল ফিতর স্বরূপ আর বাকী আধা সা' নফল সাদকা স্বরূপ।

ইমাম ইবনে বার মালেকী রহ. স্বীয় আত তামহীদে বলেন:

وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَفِي الْأَسَانِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ وَاخْتِلَافٌ. وَكَذَلِكَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عطاءً وَطَاوُسٌ وَجَاهِدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. (১)

অর্থাৎ আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও মুআবিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আধা সা' গম (দিয়ে সাদকাতুল ফিতর) দেয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যদিও এর কিছু সনদে সামান্য দুর্বলতা ও কিছুটা ইখতিলাফ আছে। আর এরূপই বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ., আতা রহ., তাউস রহ., মুজাহিদ রহ., উমার বিন আ. আযীয রহ., সাঈদ বিন জুবাইর রহ., উরওয়া বিন যুবাইর রহ., আবু সালামা বিন আ. রহমান রহ., মুসআব বিন সাদ রহ. এবং প্রমুখ আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে।

ইমাম ইবনে হযম রহ. বলেন,

وصح ايضا عن طاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي والليث و سفيان

১ আত-তামহীদ নিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ : ৪/১৩৭ তাহকীক: মুস্তফা বিন আহমাদ এবং আ. কাবীর- (অযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, মাগরিব)

الثورى. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تَنَاقَضَ هَاهُنَا الْمَالِكِيُّونَ الْمُتَهَوِّلُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَخَالَفُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (وَعُثْمَانَ) وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ صَحِيحٌ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ يَحْتَجُّونَ بِأُضْعَفَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ. (২)

অর্থাৎ আর আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার বৈধতা তাউস রহ., মুজাহিদ রহ., সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ., উরওয়া বিন যুবাইর রহ., আবু সালামা বিন আ. রহমান রহ. ও সাঈদ বিন জুবাইর রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই আওয়ামী রহ., লাইস রহ. ও সুফইয়ান সাওরী রহ. এর মত। আবু মুহাম্মাদ ইবনে হযম রহ. বলেন, মদীনাবাসীদের আমল দ্বারা প্রভাবিত মালেকীরা এক্ষেত্রে স্ববিরোধী কাজ করেছে। তারা (এ মাসআলায়) আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা, আসমা বিনতে আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, ইবনে যুবাইর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা, আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বিরোধিতা করেছে। অথচ এটা (আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়ার মাসআলাটি) তাঁদের সবাই থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত। ব্যতিক্রম শুধু আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর বর্ণনায়। (অর্থাৎ এ দু'জনের বর্ণনায় সনদগত কিছু দুর্বলতা আছে। তথাপি তা কবুলযোগ্য যেমনটি ইমাম ইবনে হযম রহ. এর সামনের উক্তি থেকে বুঝা যায়।) কিন্তু মালেকীরা (নিজেদের মতের পক্ষে) এর চেয়েও দুর্বল সনদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে।

উপরোল্লিখিত এসব বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করা মারফু তথা রাসূলের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ও তাবেরীনের আমল ও ফতোয়া দ্বারাও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং একে হাদীসবিরোধী কিংবা ভুয়া বলা চরম অজ্ঞতা ও গোয়ার্তুমি ছাড়া কিছুই নয়।

হাদীসে এক সা' দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার কথা বর্ণিত হয়েছে তা আমরাও জানি। কিন্তু সাথে এটাও জানা থাকা জরুরী যে, এ এক সা' এর বিধানটি গম ছাড়া রাসূলের যুগে প্রচলিত অন্যান্য চারটি খাদ্যের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। সে চারটি খাদ্য হলো- যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর। এ চারটি খাদ্যই ছিলো তখনকার স্বাভাবিক খাবার। আর এক সা' এর বিধানটি এ চারটি খাদ্যের জন্যই প্রযোজ্য।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّرْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ. (১)

অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ঈদুল ফিতরের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য সাদকাতুল ফিতর স্বরূপ দিতাম। আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমাদের খাদ্য ছিলো- যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর।

সহীহ বুখারীর এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এক সা' দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার বিষয়টি গমের সাথে সম্পৃক্ত নয়। গমের বিধান ভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমরা পূর্বে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছি।

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বেশীর ভাগ মানুষ খেজুর, যব, পনির ও কিশমিশ- এগুলোর উপরই জীবিকা নির্বাহ করতো। তখন আরবে গমের প্রচলন কম ছিলো। আর তাই সব হাদীসেই

গমের দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার কথা বর্ণিত হয়নি। যেগুলোতে গমের আলোচনা এসেছে তাতে গমের জন্য আধা সা' আর অন্যান্য খাদ্যের জন্য এক সা' এর কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং যেসব হাদীসে গমের আলোচনাই নেই; বরং অন্যান্য খাদ্য যথা যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুরের আলোচনা এনে এক সা' পরিমাণ সাদকাতুল ফিতর দেয়ার কথা বলা হয়েছে সেসব হাদীস দ্বারা আধা সা' গমে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার বিপরীত প্রমাণ পেশ করা বোকামী ও জ্ঞানস্বল্পতা বৈ কিছু নয়। বিবেকবান পাঠক মাত্রই বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

বাকী থেকে যায়, শরীয়তে নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যের পরিবর্তে সমমূল্য পরিমাণ টাকা বা অন্যকিছু দিলে সাদকাতুল ফিতর আদায় হবে কিনা? এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা হলো, এক্ষেত্রে যেহেতু খাবার দান করাটাই মৌলিক উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মাধ্যমে গরীব লোকদের অভাব মিটানোই মূল উদ্দেশ্য বিধায় খাবারের পরিবর্তে সমমূল্য পরিমাণের টাকা দিলে এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং টাকা দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো জরুরত পূরণ করার সুযোগ থাকায় অনেকের মতে এটাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

এর স্বপক্ষে আমরা দু'চারটি হাদীস ও আসার থেকে প্রমাণ পেশ করতে পারি।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. (২)

অর্থাৎ নাফে রহ. সূত্রে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব সাদকাতুল ফিতর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম ও তাবেয়ীন রহ.) আধা সা' গমকে এর সমতুল্য বানিয়ে নিলো।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, শরীয়াহ নির্ধারিত যব বা খেজুরই সাদকাতুল ফিতর হিসেবে দেয়া আবশ্যিক নয়; বরং এর সমমূল্যের অন্যকিছু দিলেও আদায় হয়ে যাবে। যেমন এ হাদীসে আধা সা' গমকে এক সা' যব বা খেজুরের সমমূল্যের ধরে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খেজুর বা যব না দিয়ে এর সমমূল্যের বস্তু দিলেও সাদকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যাবে। আর এটা সব সাহাবা ও তাবেয়ীন মেনে নিয়ে তদানুযায়ী আমল করায় তা একপ্রকার ইজমায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে যদিও আধা সা' গমকে এক সা' যব কিংবা খেজুরের সমমূল্যের ধরে সাদকাতুল ফিতর দেয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে আধা সা' গমের দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার বিষয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক সা' যব কিংবা খেজুর যেরকমভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নেসাব ঠিক তেমনি আধা সা' গমও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেসাব। এমন নয় যে, আধা সা' গমের মূল্য এক সা' যব বা খেজুরের সমমূল্যের হলেই কেবল আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়া যায়, অন্যথায় নয়; বরং এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটি নেসাব। সুতরাং আধা সা' গমের দাম যাই হোক না কেনো তা দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যেহেতু গমের প্রচলন কম ছিলো সে কারণে সব হাদীসেই আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করার কথা বর্ণিত হয়নি; বরং কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে বর্ণনাগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এ বর্ণনাগুলো সম্বন্ধে যেহেতু সব সাহাবী অবগত ছিলেন না বিধায় তাঁরা আধা সা' গমকে এক সা' খেজুর কিংবা যবের সমমূল্যের ধরে তা দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়ার অনুমোদন প্রদান করেন। যদিও বাস্তবে আধা সা' গম দ্বারা সাদকাতুল ফিতর দেয়া সংক্রান্ত আলাদা হাদীসই রয়েছে। তবে তাঁদের এ অনুমোদন থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তারা হুবহু এক সা' যব কিংবা খেজুর দেয়াকে আবশ্যিক মনে করতেন না; বরং তার সমমূল্যের যেকোনো কিছু হলেই সাদকাতুল ফিতরের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। অর্থাৎ বস্তু নয়, এখানে মূল্যটাই মূখ্য। তবে শর্ত হলো, হাদীসে যে পাঁচটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর যেকোনো একটির মূল্য ধরতে হবে, এ পাঁচটি খাবার তথা এক সা' যব বা খেজুর বা কিশমিশ বা পনির কিংবা আধা সা' গম এর বাইরে অন্য কোনো খাবারের হিসাব করা যাবে না। কেননা, হাদীসে শুধু এ পাঁচটির কথাই এসেছে।

ইমাম ইবনে হযম রহ. স্বীয় আল মুহাল্লাতে বলেন:

وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِيجَابُ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَوْ قِيَمَتِهِ عَلَى أَهْلِ الدِّيَّوَانِ نِصْفُ دِرْهَمٍ مِنْ طَرِيقٍ وَكَيْعٍ عَنْ قُرَّةِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيْنَا بِذَلِكَ. (১)

অর্থাৎ লোকদের উপর সাদকাতুল ফিতর স্বরূপ আধা সা' গম কিংবা তার মূল্য, যা হিসাব মতে (তখনকার যুগে) আধা দিরহাম দেয়ার আবশ্যকীয়তা উমার বিন আ. আযীয রহ. থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত, যা অকী রহ. এর বর্ণনায় কুররা বিন খালেদ রহ. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট উমার বিন আ. আযীয রহ. এ মর্মে চিঠি লিখে ফরমান জারি করেন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আধা সা' গম দিলে যেমন সাদকাতুল ফিতর আদায় হবে তেমনি তার মূল্য দিলেও সাদকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যাবে। এটা সাহাবা ও তাবেয়ীদের সোনালী যুগেই প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এরকম প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়কে অস্বীকার করে স্বীয় মনমতো এ ব্যাখ্যা দেয়া যে, নিজ দেশের প্রধান খাদ্য দিয়ে সাদকাতুল ফিতর দিতে হবে এটা কি হাদীসের অপব্যখ্যা নয়? তারা কি এমন কোনো হাদীস বা আসার দেখাতে পারবে, যা একথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম রোম, পারস্যে গিয়ে সে দেশের প্রধান খাদ্য এক সা' হিসাব করে সাদকাতুল ফিতর আদায় করেছেন? তারা কখনো তা প্রমাণ করতে পারবে না। এ সবই হলো তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা, যাতে শুধু তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হিদায়াত দান করে সঠিক ও সরল পথে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৪১ তম পাঠ:

(প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে লম্বা টানে তাকবীর বলে দাঁড়ানো সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

১ম ও ৩য় রাকআতে লম্বা টান তাকবীর দিয়ে যে ইমাম উঠে তাও ভুয়া। যেভাবে অন্যান্য তাকবীর দেওয়া হয় সে ভাবেই ১ম ও ৩য় রাকআতে তাকবীর দিয়ে দাঁড়াতে হবে টান দিয়ে নয়। বোঃ ইঃ ফাঃ ২য় খন্ড ৭৮৫ নং হাদীস।

জবাব:

এটাও একটি ভুল উদ্ধৃতি ও মিথ্যা দলীল। কেননা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বাংলা বুখারীর ৭৮৫ নং হাদীসে লম্বা টানে তাকবীর বলে উঠা কিংবা না উঠার কোনো আলোচনাই নেই।

তাতে হাদীসটি এভাবে লিখা আছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

মুহাম্মাদ ইবনে সাব্বাহ রহ..... মালিক ইবন হুয়াইরিস লাইলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী (সাঃ) কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সালাতের বেজোড় রাকআতে (সিজদা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতে না।^(১)

পাঠক, আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, দাবির সাথে প্রদত্ত প্রমাণের মিল কতোটুকু? আর এভাবেই এরা বুখারীর নাম ব্যবহার করে বিভিন্নস্থানে মিথ্যা ও ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। অথচ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দাবির সাথে দলীলের কোনো মিল নেই। তবে আমরা কিন্তু এখানে এ কথা বলছি না

১ সহীহ বুখারী : ২/১৪১ হা. নং ৭৮৫ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।

যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়ানোর সময় লম্বা টান দিয়ে তাকবীর বলতে হবে।

আমরা এ আলোচনাটি এজন্য করলাম যে, লা-মায়হাবীরা প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেদের দাবীর পক্ষে সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি পেশ করে, যাতে সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষ তাদের কথা ও মত সহজেই গ্রহণ করে নেয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তাদের দাবীর সাথে সহীহ বুখারীর প্রদত্ত দলীলের কোনো মিল নেই। ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া, আমীন সশব্দে বলা, রমযানে আট রাকআত তারাবীহ পড়াসহ বিভিন্ন মাসআলায় তারা সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি পেশ করেছে, কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তাদের দাবি অনুপাতে কোনো হাদীস বুখারীতে নেই। এ বিষয়ে তাদের ধুর্তামি প্রমাণ করতেই এ সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করলাম।

প্রথমত: নামাযের প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে লম্বা টান দিয়ে তাকবীর বলে উঠে দাঁড়ানো হানারী উলামায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাসআলা নয় এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থেও এ রকম বলা হয়নি। সুতরাং এটা হানারী মায়হাবের উপর চাপানো একটি অপবাদ।

দ্বিতীয়ত: লম্বা টান দিয়ে তাকবীর বলা ও না বলা নিয়ে যেহেতু হাদীসে কিছু বলা হয়নি তাই এতে পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু নেই। তবে এখানে এটা বুঝা উচিত যে, নামাযের অন্যান্য তাকবীর বলার স্থান অতোটা দীর্ঘ নয় যতোটা দীর্ঘ সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে। আর তাকবীর বলার সুনাত তরীকা হলো- নামাযের এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার পুরা সময়টা জুড়ে তাকবীর বলা। এমন নয় যে, প্রথমে তাকবীর বলে নিবে তারপর সামনের রুকন আদায় করবে। সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে উঠে দাঁড়াতে যেহেতু তুলনামূলক অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটু বেশী সময় লাগে বিধায় এতে ‘আল্লাহ্ আকবার’ এর লামের এক আলিফ মদ একটু দীর্ঘ হলেও অসুবিধার কিছু নেই। হ্যাঁ সীমিতরিজ্জ টান দেয়া, যা কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায়- তা অনুচিত ও বর্জনযোগ্য। ইলমে তাজবীদের নীতি ও কায়দানুসারে ‘আল্লাহ্’ শব্দের লামকে চার আলিফ মদ পর্যন্ত টানা যায়। তাই স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী টান হলেও অসুবিধার কিছু নেই। যদিও স্বাভাবিক টানে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলাটাই উত্তম ও শ্রেয়।

সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় ‘আল্লাহ্ আকবার’ বাক্যটি উঠাকালীন সময়েই যে পড়তে হবে তা কিছু সাহাবীর আমল থেকেও প্রমাণিত। অর্থাৎ দাঁড়ানোর আগেও নয় আবার দাঁড়ানোর পরেও নয়; বরং দাঁড়ানোকালীন সময়ের মাঝেই তাকবীর বলবে।

মুসান্নাফে আ. রাখ্যাকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ. (১)

অর্থাৎ আমার বিন দীনার রহ. (আব্দুল্লাহ) বিন যুবাইর রাখিআল্লাহ্ তাআলা আনহু এর ব্যাপারে বর্ণনা করতঃ বলেন, তিনি (ইবনে যুবাইর রাখিআল্লাহ্ তাআলা আনহু) একমাত্র কিয়ামের জন্য উঠার (সময়ের) মধ্যেই তাকবীর বলতেন। অর্থাৎ এর আগেও নয়, পরেও নয়।

মুসান্নাফে আ. রাখ্যাকে আরেকটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّالِثَةِ..... إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ. قَالَ عَطَاءٌ: تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ. (২)

অর্থাৎ আতা রহ. বর্ণনা করেন যে, তিনি মুআবিয়া রাখিআল্লাহ্ তাআলা আনহু-কে নামাযের তৃতীয় রাকআতে দেখেছেন..... যখন তিনি সিজদা থেকে স্বীয় মাথা উঠালেন তখন দেরি করলেন না। আতা রহ. বলেন, উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তিনি (মুআবিয়া রাখিআল্লাহ্ তাআলা আনহু) কিয়ামের জন্য উঠার সময়ে তাকবীর বলছিলেন। আতা রহ. বলেন, আমি এতে আশ্চর্যবোধ করেছিলাম। পরে আমার কাছে হাদীস পৌছলো যে, বাস্তবে সূনাত এমনই ছিলো।

১ মুসান্নাফে আ. রাখ্যাক : ২/১৭৭ হাদীস নং ২৯৫৭ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)

২ প্রাগুক্ত : হাদীস নং ২৯৬০

এ বর্ণনা দুটির সনদই সহীহ। এর রাবীগণ তথা আ. রাযযাক রহ., ইবনে জুরাইজ রহ., আমর বিন দীনার রহ. ও আতা রহ. সবাই হাদীসশাস্ত্রের ইমাম এবং উঁচুপর্যায়ের সিকা তথা নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং এ সনদ দুটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

এ হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতে বলতে উঠাই সুন্নাত, যা সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। আর এতে যেহেতু অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটু বেশী সময় লাগে বিধায় ‘আল্লাহ্ আকবার’ এর আল্লাহ শব্দের লাম সামান্য একটু লম্বা টান দিয়ে বলাতে কোনো সমস্যা নেই। যদিও সম্ভব হলে স্বাভাবিক টানে বলাই উত্তম।

৪২ তম পাঠ:

(দু'জন মিলে জামাত করাকালীন অন্য কেউ এলে
ইমামের করণীয় সংক্রান্ত)

অভিযোগ:

দুজন মিলে জামাতে নামায পড়ার সময় আর একজন আসলে ইমাম একধাপ এগিয়ে যাওয়া নিয়মটা একেবারেই ভুয়া। রাসূল (সঃ) সহ দুজনে নামায পড়ার সময় এক সাহাবী নামাযের কাতারে এলে তাদের পিছনে সরিয়ে দিলেন।

জবাব:

এটাও একটি হানাফীদের উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগ। কেননা, হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে স্পষ্টাকারে বলা হয়েছে যে, দু'জনে মিলে জামাত করা অবস্থায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এসে ইজ্জিদা করলে ইমাম আপন অবস্থায়ই থাকবে। আর দুই মুক্তাদী পিছে এসে দাঁড়াবে। আর এটাই উত্তম পন্থা। অবশ্য মুক্তাদী স্বস্থানে থেকে ইমামের সামনে এগিয়ে যাওয়ারও একটি মত পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রাদ্দুল মুহতার (যা ফাতাওয়ায়ে শামী নামে পরিচিত) গ্রন্থে আল্লামা শামী রহ. বলেন:

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُقْتَدِي التَّأَخُّرُ إِذَا جَاءَ ثَالِثٌ. فَإِنْ تَأَخَّرَ وَإِلَّا
جَذَبَهُ الثَّالِثُ إِنْ لَمْ يَخْشَ إِفْسَادَ صَلَاتِهِ. فَإِنْ اقْتَدَى عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ يُشِيرُ
إِلَيْهِمَا بِالتَّأَخُّرِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدُمِهِ، لِأَنَّهُ مَتَّبِعٌ وَلِأَنَّ الْإِصْطِفَافَ خَلْفَ
الْإِمَامِ مِنْ فِعْلِ الْمُقْتَدِينَ لَا الْإِمَامِ، فَالْأَوْلَى ثَبَاتُهُ فِي مَكَانِهِ وَتَأَخُّرُ
الْمُقْتَدِي. (১)

অর্থাৎ আর এটা স্পষ্ট যে, (দু'জনে মিলে জামাত করার সময়) তৃতীয় ব্যক্তি আসলে মুক্তাদীর জন্য পিছে সরে যাওয়াই উচিত। যদি (প্রথম) মুক্তাদী পিছনে চলে আসে তাহলে তো ভালো, নচেৎ তৃতীয় ব্যক্তি (অর্থাৎ দ্বিতীয় মুক্তাদী) তাকে টেনে পিছনে নিয়ে আসবে। শর্ত হলো, যদি এতে নামায নষ্ট করার ভয় না করে। (অর্থাৎ টানার কারণে মাসআলা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত হয়তো সে নামাযই ভেঙ্গে ফেলবে।) আর তৃতীয় ব্যক্তি এসে যদি (ইমামের পিছনে না দাঁড়িয়ে) ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় তাহলে ইমাম তাদেরকে পিছনে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিবে। ইমাম নিজে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে এটাই উত্তম। কেননা, ইমাম হলো অনুসরণীয়। ইমামের পিছনে কাতার তৈরি করা বা ঠিক করা মুক্তাদীদের কাজ, ইমামের নয়। সুতরাং ইমাম আপন স্থানে স্থির থাকা আর মুক্তাদীদের পিছনে সরে যাওয়াটাই উত্তম।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন:

وَلَوْ افْتَدَى وَاحِدٌ بِآخَرَ فَجَاءَ ثَالِثٌ يَجْذِبُ الْمُقْتَدِيَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ. وَلَوْ

جَذَبَهُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَا يَضُرُّهُ وَقِيلَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ. (২)

অর্থাৎ যদি কেউ একজনের সাথে (জামাতের উদ্দেশ্যে) ইজ্জিদা করে আর ইতিমধ্যে তৃতীয় একব্যক্তি চলে আসে তাহলে সে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধার পর (প্রথমে ইজ্জিদা করা) মুক্তাদীকে (পিছনে) টেনে আনবে। আর যদি তাকবীরে তাহরিমার পূর্বেই তাকে টেনে আনে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কারো মতে ইমাম নিজেই সামনে এগিয়ে যাবে।

এ থেকে বুঝা যায়, হানাফী মাযহাব মতেও ইমাম আপন স্থানে থাকবে আর মুক্তাদীরা পিছনে সরে আসবে। আর সরে না আসলে পিছনে যাওয়ার জন্য ইশারা করবে। আর এটাই হলো উত্তম। তবে কারো কারো মতে ইমাম নিজেই এগিয়ে যাবে।

মূলত এ সংক্রান্ত দু'ধরনের বর্ণনাই পাওয়া যায়। একটি এসেছে সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদ ইত্যাদির বর্ণনায় যে, ইমাম আপন স্থানে থাকবে আর মুক্তাদীরা পিছে সরে আসবে। আর অন্যটি এসেছে সহীহ ইবনে খুযাইমা ও

আল আওসাতের বর্ণনায় যে, ইমাম সামনে এগিয়ে যাবে। এবার দেখুন বর্ণনা দুটি, যার উভয়টি সহীহ।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

حديث جابر الطويل: وفيه ... ثُمَّ جَثْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.

অর্থাৎ জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর দীর্ঘ হাদীস- যাতে একপর্যায়ে জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন.... এরপর আমি (অযু করে) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বামপাশে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন। এরপর জাব্বার বিন সখর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এসে অযু করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বামপাশে দাঁড়ালেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন।

সহীহ মুসলিম : পৃ. নং ১২০৪ হা. নং ৩০১০ (বাইতুল আফকার, রিয়াদ)

আর সহীহ ইবনে খুযাইমাতে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدِيقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ لِبَعْضٍ حَاجَتِهِ فَصَبَّيْتُ لَهُ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ فَالتَّحَفَ بِإِزَارِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. وَأَتَى آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ. فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. (১)

অর্থাৎ আমার বিন সাঈদ রহ. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা এর নিকট গেলে একটি হাদীসের কিছু উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে অগ্রসর হলাম। এরপর তিনি স্বীয় হাজত পূরণে বের হলেন। আমি তাঁর জন্য অযুর পানি ঢাললে তিনি অযু করলেন। এরপর স্বীয় ইয়ার (লুঙ্গী জাতীয় কাপড়) দ্বারা নিজেকে আবৃত করে নিলেন। এরপর (জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে) আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে রাখলেন। (এরপর) আরেকজন এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে গিয়ে নামায পড়ালেন এবং আমরা তাঁর সাথে নামায পড়লাম।

প্রমাণিত হলো যে, ইমাম স্বস্থানে থাকা ও মুক্তাদীরা পিছিয়ে আসা কিংবা মুক্তাদীরা আপন স্থানে থাকা ও ইমাম সামনে এগিয়ে যাওয়া উভয় পদ্ধতিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কোনোটিকেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই। যদিও হানাফী মাযহাব মতে প্রথম পদ্ধতিই গ্রহণীয় ও উত্তম, যা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন এবং এর দু'টি যৌক্তিক কারণও বর্ণনা করেছেন। আমরাও এ পদ্ধতিকেই সমর্থন করি।

আর উভয় হাদীসের মাঝে এভাবে সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে যে, স্বাভাবিক নিয়ম হলো, ইমাম আপন স্থানেই থাকবে আর মুক্তাদীরা পিছনে চলে আসবে। আর পিছনে না আসলে তখন ইমাম তাদেরকে নামাযে থাকাবস্থায়ই পিছনে সরে যাওয়ার জন্য ইশারা করবে। এরপরও যদি তারা অজ্ঞতাবশত বা অন্য কোনো কারণে আপন স্থানেই অনড় থাকে তখন ইমাম নিজেই সামনে চলে যাবে। তাহলে উভয় হাদীসের উপর আমল করা সম্ভবপর হলো।

মোটকথা, জামাতে নূন্যতম দু'জন লোক হলেই ইমামের জন্য সামনে থাকা ও মুক্তাদীর পিছনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ মুতাওয়াতির একটি সুন্নাত, যা কিছুতেই ছাড়া যাবে না। আর এ অনুসারে আমলের জন্য মুক্তাদীরই অগ্রগামী হওয়া উচিত যখন মুক্তাদী একজন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দুই বা বেশী হয়ে যাবে। এরপরও যদি মুক্তাদীরা মাসআলা জানা না থাকায় বা অন্য কোনো কারণে পিছনে না আসে তখন ইমাম নিজেই স্বপ্রণোদিত হয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়াবে।

উপসংহার

ফেতনা সৃষ্টির জন্য মূলত সহীহ দলীল ও অকাট্য প্রমাণাদির দরকার হয় না; বরং মূর্খতাসূলভ বিবাদ ও অযাচিত হট্টগোলই এর জন্য যথেষ্ট। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশত এতে বুঝে নেয় যে, নিশ্চয়ই এতে কোনো ঝামেলা ও গণ্ডগোল আছে, নতুবা বিবাদ হবে কেনো? আর ফেতনা সৃষ্টিকারীদের এতেই সফলতা, যা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো। আপনি যদি আজ থেকে প্রচার শুরু করেন যে, সূর্য আমাদের কোনো আলো দেয় না; বরং পৃথিবী স্বমহিমায়ই আলোকিত, তাহলে কিছুদিন পরে আপনি এ দাবির সমর্থনে অবশ্যই কিছু লোক পেয়ে যাবেন। আরো কিছুদিন প্রচার-প্রসার করলে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন অসচেতন অনেক মানুষই এ ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে। তবে সচেতন বুদ্ধিমান লোকেরা কিন্তু যেকোনো কথায় বিভ্রান্ত হয় না। তারা কথাটির বাস্তবতা ও প্রমাণসূত্র দেখেন। অভিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ ও মতবিনিময় করেন। এরপর তারা সঠিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

যেকোনো ক্ষেত্রে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় খুবই সহজ। শর্ত হলো, একটু সময় নিয়ে বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতার সহিত বিষয়টি যাচাই করা, পাশাপাশি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কারো সাহায্য নেয়া। এতে মিথ্যা থেকে সত্য, বাতিল থেকে হক অবশ্যই বের হয়ে আসবে। কেননা, বাতিল খুবই দুর্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে সহজেই তা চিহ্নিত ও প্রতিহত করা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভাবই হলো এ সচেতনতার, যদরূপে তারা সহজেই যেকোনো ফিতনার শিকার হয়ে যায়। সচেতনতা থাকলে ফিতনা তাদেরকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারতো না।

আহলে হাদীস নামধারী যে সম্প্রদায়টি আজ সমাজে ফেতনা ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়টি কিন্তু ঠিক এরকমই। প্রামাণ্য ও সহীহ আমলগুলোকে অশুদ্ধ বলে লোকসমাজে ফেতনা ছড়াতে এদের জুড়ি মেলা ভার। ভুল উদ্ধৃতি, অস্পষ্ট প্রমাণ ও মিথ্যা দাবি করে আমাদের সুপ্রমাণিত আমলকে ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলতে এরা খুবই সিদ্ধহস্ত, যার প্রমাণ তাদের প্রচারিত লিফলেটটির ছত্রেছত্রে বিদ্যমান। আমরা তাদের এসব ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো সহীহ ও প্রমাণযোগ্য হাদীসের আলোকে যথার্থভাবে খণ্ডন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি এ সম্প্রদায়টির

উত্থান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ফেতনামূলক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি পেশ করে তাদের আসল চেহারার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছি। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের এহেন অবস্থা অবলোকন করে সতর্ক থাকার প্রয়াস পায়।

আমরা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি এ সমস্ত মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ আমাদের মূল কাজ নয়। আমাদের মূল কাজ ছিলো এর চেয়েও বড় কিছু। মুসলিম উম্মাহ আজ শতাব্দিভক্ত। পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে তারা লাঞ্চিত ও বঞ্চিত। আজ প্রায় শতবছর হতে চললো ‘খিলাফত’ বিলুপ্তির। আমাদের গৌরবগাঁথা সাফল্য ও ঐতিহ্য আজ শুধু ইতিহাসের পাতায়ই সীমাবদ্ধ। চারদিকে আজ শুধু মুসলমানদের রক্তের হোলিখেলা। অথচ আমাদের কি যে দুর্গতি হলো! আজ আমাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে, নামাযে হাত নাভীর নিচে বাঁধবো নাকি বুকের উপর? ইমামের পিছনে কিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়বো কি পড়বো না? ‘আমীন’ জোরে বলবো নাকি আস্তে? এসব কি আমাদের দরকার ছিলো? এসব বিষয়ে তো সহস্রাধিক বছর পূর্বেই সমাধান হয়ে গেছে। উম্মাহ হাজার বছর ধরে তদানুযায়ী আমলও করে আসছে। একটি আমলে একাধিক সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি থাকতেই পারে, যদি তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। এর কোনোটিকেই বাতিল বলার অবকাশ নেই। বেশীর চেয়ে বেশী একটি পন্থা অপরটি থেকে উত্তম হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একটি পন্থা সুন্নাহসম্মত এবং অন্যটি বাতিল এমন দাবি পূর্ববর্তী ইনসাফপ্রিয় উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের কেউই করেননি। স্বয়ং লামাযহাবীদের মান্যবর গুরু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহ., ইমাম ইবনে হযম রহ.-সহ প্রমুখ এ কথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, বিভিন্ন আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক সুন্নাহসম্মত পন্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর কোনোটিই বাতিল নয়; যে পন্থায়ই আমল করা হোক না কেনো- তা সুন্নাহসম্মত আমল বলেই বিবেচিত হবে। যেমন ইকামাত একবার করে বলা ও দু’বার করে বলা, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করা, ‘আমীন’ আস্তে বলা ও জোরে বলা, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা ও বারো তাকবীর বলা ইত্যাদি।^(১)

(১) মাজমুআতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৪/১৩২ সালাতুল ঈদাইন অধ্যায় (দারুল অফা, বৈরুত),
যাদুল মাআদ : ১/২৭৫ (মুআসসাআতুর রিসালা, বৈরুত), আল মুহাল্লা : ৩/২৩৫ মাসআলা নং ৩৫৮
(ইদারাতুত তাবাতিল মুনীরিয়া, কায়রো)

মোটকথা আমাদের পূর্বসূরী আসলাফের মাঝে মতপার্থক্য ছিলো ঠিক, কিন্তু বিরোধ ছিলো না। এ ধরনের মাসআলাগত ইখতিলাফে কেউ কাউকে গোমরাহ, বাতিল বলেননি এবং স্বীয় মতকে প্রমাণ করতে গিয়ে অন্য মতের অসম্মান করেননি। হাদীস ও প্রমাণের আলোকে প্রত্যেকই প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা ও মতকে যথাযথ সম্মান করেছেন।

এর বিপরীত আজকের এ লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টি সকল সীমা ও নীতি উপেক্ষা করে স্বীয় মতের বিপরীত অন্যের মত ও মাযহাবকে -তা যতই বিশুদ্ধ ও প্রমাণভিত্তিক হোক না কেনো- বাতিল ও ভ্রান্ত বলার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের বিরোধিতা করা যেনো তাদের স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ হানাফীদের আমল ও পদ্ধতিগুলো স্বরচিত কোনো কিছু নয়; বরং কুরআন সুন্নাহর আলো থেকেই তা আহরিত। অজ্ঞাত কোনো এক কারণে আজ তারা হানাফীদের সুন্নাহসম্মত ও প্রমাণভিত্তিক আমলগুলোকে বাতিল ও ভুয়া বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আমরা ঠিক জানি না এতে কারা তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে?

বক্ষ্যমান এ বইটিতে আমরা তাদের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো তুলে ধরে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এর যথার্থ খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছি বলে আশা করি। এতে আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টির জালিয়াতি ও ধূর্তামির বিষয়টি পাঠকসমাজের নিকট স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। এ বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিলো শুধুমাত্র হানাফীদের আমলগুলো যে ভিত্তিহীন নয়; বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই প্রমাণিত- শুধু এতোটুকুই প্রমাণ করা। তাই এতে কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে কিছু লেখা হয়নি। পাশাপাশি তাদের আমলগুলোকে সবস্থানেই খণ্ডন করা হয়নি। কেননা, তাদের অনেক আমলও সুন্নাহ অনুযায়ী- যেমনটি আমাদের আমলও। তাই তাদের আমলকে সরাসরি খণ্ডন করা যেনো রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহকেই খণ্ডন করা বলে আমার মনে হয়েছে। এজন্য আমি সে পথে পা বাড়াইনি। যদিও লা-মাযহাবীরা সুন্নাহর প্রতি কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন না করে আমাদের সুন্নাহভিত্তিক আমলগুলোকে নির্দিধায় বাতিল ও ভুয়া বলার দুঃসাহস দেখায়, কিন্তু আমি সে পথের পথিক হতে চাই না। ভুলের জবাব তো আর ভুল দিয়ে হতে পারে না। তাই বলা যায়, এ বইটি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে লিখা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. এর কিছু সুন্নাহকে রক্ষা করার

জন্য, অন্য কিছু সুন্নাহকে খণ্ডন করার জন্য নয়। এ বইটি পড়ে কোনো হানাফী ভাই যদি এতোটুকু বুঝতে পারে যে, আমার নামায, আমল ও ইবাদাত ভিত্তিহীন কোনো বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সুদৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহলে আমি মনে করবো, আমার উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে সফল।

পাশাপাশি আমি এটাও আশা করি যে, ইনসাফপ্রিয় সতানুসন্ধানী কোনো লা-মায়হাবী পাঠকও যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ বইটি অধ্যয়ন করে তাহলে হানাফীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলোর দুর্বলতা ও মিথ্যাচারিতা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে পড়বে এবং সে সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাবে।

সচেতন পাঠকসমাজের এ বিষয়টি অজানা নয় যে, আহলে হাদীস নামধারী এ লা-মায়হাবী সম্প্রদায়টির মূল দাবি ও শ্লোগান হলো কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো কিছু শরীয়তের দলীল নয়। অথচ এ ধরনের অবাস্তব দাবি পূর্বের স্বীকৃত কোনো আলেম বা ফকীহ করেননি। কেননা, এটা কার না অজানা যে, কুরআনের আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা হলো সীমিত। আর কিয়ামত পর্যন্ত মানবজীবনের নিত্যনতুন মাসআলা ও সমস্যা হলো অগণিত। আর এটাও সবার জানা যে, ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। তাহলে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় সীমিত কিছু আয়াত ও হাদীস দিয়ে অগণিত সমস্যার শরয়ী সমাধান কিরূপে সম্ভব?

ফুকাহায়ে কিরামের নিকট এর যথার্থ উত্তর রয়েছে। কেননা, তারা বলে, শুধু কুরআন ও হাদীসের সীমিত অংশের বাহ্যিক পাঠই শরীয়তের দলীল নয়; বরং এর সাথে সাথে তার ভাবার্থ, ইঙ্গিতবহ মর্মাখ, তা থেকে আহরিত নীতিমালা ও বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কিরামের গবেষণা ও ইজতিহাদ নিঃসৃত কিয়াসও শরীয়তের দলীল হিসেবে পরিগণিত। সুতরাং কোনো মাসআলার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলেও তার অন্যান্য পন্থায় এর সমাধান দেয়া সম্ভব। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট পাঠ ছাড়াও অন্যান্য পন্থাগুলোকে শরীয়ত বলে মানলেই ইসলামের পূর্ণতা প্রমাণ হয়, অন্যথায় ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়, যা নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্রোহীদের দাবি। তাহলে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার শ্লোগানের দ্বারা কি নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্রোহীদেরকেই সমর্থন করা হলো না? এক্ষেত্রে লা-মায়হাবীদের কোনোই উত্তর নেই। যেহেতু তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছুকে শরীয়তের

দলীল মনে করে না। তারা তাকলীদকে অস্বীকার করে, মাযহাব মানাকে শিরক ও গোমরাহী বলে। তাহলে কি তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম?

তাদের এসব অবান্তর দাবি ও অযৌক্তিক শ্লোগানের ভিত্তিতে আমরা এখানে কতিপয় প্রশ্ন ও মাসআলা উত্থাপন করছি, যার উত্তর ও সমাধান আমরা লা-মাযহাবীদের নিকট কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই। কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি যে, তারা এসব প্রশ্নের উত্তর কগ্নিনকালেও দিতে পারবে না। কারণ, সব উত্তর পরিস্কারভাবে কুরআন আর সহীহ হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় না; বরং বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কিরামের মূলনীতি অনুসারেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। যাই হোক, আমরা এখন লা-মাযহাবীদের সমীপে এমন কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করছি, যার উত্তর কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে কাম্য।

আহলে হাদীসদের প্রতি লা-জবাব কতিপয় প্রশ্ন:

- ১.সহীহ হাদীস কাকে বলে? এর সংজ্ঞা কী? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন, কোনো ব্যক্তির কথার আলোকে নয়।
- ২.একমাত্র সহীহ হাদীসই মানতে হবে, অন্য কোনো হাদীস মানা যাবে না- এ মর্মে কোনো সহীহ হাদীস থাকলে দেখান।
- ৩.আমরা নিজেদেরকে ‘আহলুস সুন্নাহ’ তথা সুন্নাহর অনুসারী বলি আর আপনারা নিজেদেরকে ‘আহলুল হাদীস’ তথা হাদীসের অনুসারী বলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেছেন, হাদীস অনুসরণের কথা নয়। যেমন বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতোদিন তোমরা এ দু’টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততোদিন পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ হবে না। এক হলো, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন। আর দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। অন্য এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের উপর আমার এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহ মেনে চলা আবশ্যিক। এরকম আরো একাধিক হাদীসে সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, কোথাও শুধু হাদীস কিংবা সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলা হয়নি। এখন আমাদেরকে এমন একটা সহীহ হাদীস দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. শুধু হাদীস বা সহীহ হাদীস মানার কথা বলেছেন।
- ৪.বিগততম মতানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন তাবেয়ী, যিনি সাহাবী দর্শনে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ইলম, আমল ও তাকওয়ার দীক্ষা এসেছে সাহাবা ও অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় সে যুগটি ছিলো ন্যায় ও কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত সোনালী যুগ। আর এর পরবর্তী থেকেই মিথ্যা, থিয়ানত ও ফেতনার আধিক্য শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

এখন আমাদেরকে এমন একটি সহীহ হাদীস দেখান, যাতে রাসূলুল্লাহ সা. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদকে শিরক বলেছেন আর অনেক পরবর্তী যুগে জন্ম নেয়া আপনাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম ইবনুল কায়িম জাওযীয়া রহ. এবং শাইখ আলবানী রহ. এর তাকলীদকে ঈমানের অংশ ও ফরয বলেছেন।

৫. তাকলীদ যদি শিরক হয় তাহলে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা ও মিসরবাসী সাহাবা ও তাবেয়ীনের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী? মক্কাবাসীগণ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর, মদীনাবাসীগণ যায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এবং মিসরবাসীগণ আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু এর তাকলীদ করতেন। তাহলে যেসকল সাহাবী ও তাবেয়ী তাকলীদ করতেন তারা সবাই কি মুশরিকদের অন্তর্গত হয়ে গেছেন? এদের ব্যাপারে আপনাদের ফতোয়া কী- সহীহ হাদীসের আলোকে বলুন?

৬. আপনাদের আহলে হাদীস সংগঠনের লিখিত তাফসীর-উসূলে তাফসীর, হাদীস-উসূলে হাদীস, ফিকহ-উসূলে ফিকহ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাব আছে কি? থাকলে সেগুলোর নাম, পরিচিতি, প্রকাশসাল-সহ সব উল্লেখ করুন।

আপনারা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইমাম ইবনুল কায়িম জাওযী রহ.-কে মানেন এবং অনুসরণ করেন। তাদের লিখিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাঁরা আপনাদের আহলে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের। আপনারা একমাত্র তাফসীরে ইবনে কাসীরকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেন, অথচ ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তাহলে আপনারা কাদের কিতাব পড়ে মাযহাবীদের গালি দেন?

৭. আপনাদের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ করা যেহেতু শিরক তাহলে এ পর্যন্ত যতো বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন করেছেন, মুফাসসিরগণ তাফসীর লিখেছেন তাদের অধিকাংশই তো কোনো না কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন তাহলে তারা সবাই কি মুশরিক হয়ে গেছেন? আপনাদের দাবি অনুপাতে তারা যদি মাযহাব গ্রহণ করার কারণে সত্যি-সত্যিই ঈমানহারা হয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে আপনারা তাদের

কিতাব থেকে হাদীসের দলীল পেশ করে থাকেন? কিভাবে তাদের উপর ভিত্তি করে কোনো হাদীসকে সহীহ, কোনো হাদীসকে যঈফ বলেন? এতে কি মুশরিক ও বেঈমানদের কিতাব দ্বারা দলীল দেয়া হয় না?

৮. বুখারী শরীফের সব হাদীস কি আপনাদের নিকট আমলযোগ্য? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে নিম্নোক্ত এসব হাদীসের উপর কিভাবে আমল করবেন?

* বুখারী শরীফের ১৩০৭ থেকে ১৩১১ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে কাউকে জানাযা নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ আপনারা এর উপর আমল করেন না!

* বুখারী শরীফের ২২৪ হাদীসে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা এসেছে। তাহলে আপনারা বসে পেশাব করেন কেনো?

* বুখারী শরীফের ৫২৫৯ থেকে ৫২৬১ নং হাদীসগুলোতে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হওয়ার কথা এসেছে। তাহলে আপনারা তিন তালাকে এক তালাক হওয়ার কথা বলেন কেনো?

* বুখারী শরীফের ৬২৬৫ নং হাদীসে দুই হাতে মুসাফাহার কথা এসেছে। তাহলে আপনারা এক হাতে মুসাফাহা করেন কেনো?

৯. আপনারা শুধু বুখারী শরীফই মানতে চান তাহলে বুখারী শরীফের সব হাদীস মিলিয়েই না হয় দুই রাকআত নামায আদায়ের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি পেশ করুন।

১০ আপনারা যেহেতু একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসই মানেন, অন্য কিছু নয় তাহলে ইজমা ও কিয়াসের আশ্রয় নেয়া ছাড়া সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্টভাষ্য থেকে নিম্নোক্ত আধুনিক মাসআলাগুলোর শরয়ী সমাধান দান করুন।

* চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েয আছে কিনা?

* ডেসটিনি ২০০০ লিঃ জায়েয হবে কিনা?

* প্রাইজবন্ড কেনা জায়েয হবে কিনা?

* প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ও লভ্যাংশ জায়েয হবে কিনা?

* প্লাষ্টিক সার্জারী করা জায়েয হবে কিনা?

* বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কিনা?

* বীমা-ইন্সুরেন্স করা জায়েয হবে কিনা?

* ট্রেডমার্ক বেচাকেনা জায়েয হবে কিনা?

- * বিমানে নামায পড়া জায়েয হবে কিনা?
- * দেশী-বিদেশী নোট পরস্পরে কমবেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কিনা?
- * ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা জায়েয হবে কিনা?
- * টিভি দেখা জায়েয হবে কিনা?

ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের আশ্রয় না নিয়ে যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এর উত্তর না দিতে পারেন তাহলে আল্লাহর বাণী ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে দীন কিভাবে পূর্ণাঙ্গ হলো তা শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ দীর্ঘ চার বছর বাদ বইটির প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ছাড়া এটা সম্ভব ছিলো না। তাই সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। বইটি লিখা শুরু করেছিলাম লা-মায়হাবী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত একটি লিফলেটের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে। প্রথমে সংক্ষিপ্তকারে ৪২টি প্রশ্নের হাদীসভিত্তিক প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি জবাবপত্র লিখলেও পরবর্তীতে এটাকেই বিস্তারিতাকারে হাদীসের মান নির্ণয়সহ প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বই লিখে ফেললাম, যা এখন আপনার হাতে। এতে আমি শুধু লিফলেটে থাকা অভিযোগগুলোর সঠিক জবাব ও যথার্থ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি এবং পুরা আলোচনাকে হাদীসের আঙ্গিকে করার প্রয়াস চালিয়েছি।

আমি যেহেতু আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে এটা লিখিনি তাই এতে বিপক্ষ মতের খণ্ডন ও দুর্বলতা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা করিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো হানাফীদের উপর হাদীস না মানার; বিশেষ করে সহীহ হাদীস না মেনে যঈফ হাদীস অনুসারে আমল করার যে অভিযোগ করা হয়েছে তা শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা। এজন্য লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এটা রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত একটি গ্রন্থ, যাতে রয়েছে হানাফী মায়হাবের আমলগুলোর স্বপক্ষে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হাদীসসমূহের আলোকে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত।

বইটি পাঠ করলে আশা করি একজন নিরপেক্ষ পাঠক খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, হানাফী মায়হাবের আমলগুলো শিকড়বিহীন কোনো বিষয় নয়, যা এক ধাক্কা দিলেই নড়ে যাবে; বরং এর পিছনে রয়েছে কুরআন, সহীহ হাদীস, সুন্নাহ ও সাহাবীদের আমল ও ফতোয়ার সুদৃঢ় সাপোর্ট ও সমর্থন। তাই

এসব আমলকে ভুয়া বলার দুঃসাহস দেখানো নিজেকেই ভুয়া বলে আত্মপ্রকাশ করার নামান্তর। কারণ, কুরআন-সুন্নাহর মযবুত প্রমাণের আলোয় আলোকিত ও প্রতিষ্ঠিত আমলকে একমাত্র তারাই ভুয়া বলতে পারে, যারা সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথের পথিক নয়।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, যেনো তিনি এ বই দ্বারা আমাদের হাদীসপাগল অবুঝ ভাইদের সুমতি দান করেন, হাদীস ও সুন্নাহর মর্যাদা বুঝে তার যথাযথ সম্মান করার তাওফীক দান করেন এবং বিভ্রান্ত ও বিপথগামী শাইখদের সাহচর্য বর্জন করে হক্কানী উলামায়ে কিরামের সংস্পর্শে এনে হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করেন!

হে আল্লাহ, আমাদের ও সকল মুসলিমের ভুলত্রুটি ও পাপ মার্জনা করুন এবং সদাসর্বদা ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ এর উপর অটল রাখুন! আমীন!!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

গ্রন্থপঞ্জি

ক্র: নং	কিতাবের নাম	মাকতাবার নাম
০১	আল-কুরআনুল কারীম	
০২	সহীহ বুখারী	আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ
০৩	সহীহ বুখারী	দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদীআরব
০৪	সহীহ বুখারী	বাইতুল আফকার, রিয়াদ, সৌদীআরব
০৫	সহীহ বুখারী (বাংলা)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ
০৬	সহীহ মুসলিম	আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ
০৭	সহীহ মুসলিম	কদীমী কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান
০৮	সহীহ মুসলিম	বাইতুল আফকার রিয়াদ, সৌদীআরব
০৯	সহীহ ইবনে খুযাইমা	আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন
১০	সহীহ ইবনে হিব্বান	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১১	মুআত্তা মালেক	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
১২	মুআত্তা মালেক	মুআসসাসাতু যায়িদ বিন সুলতান, আবুধাবী, আরব আমিরাত
১৩	মুআত্তা মালেক	আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী, পাকিস্তান

১৪	মুস্তাদরাকে হাকিম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত লেবানন
১৫	জামে তিরমিযী	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
১৬	জামে তিরমিযী	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
১৭	জামে তিরমিযী	বাইতুল আফকার, রিয়াদ, সৌদীআরব
১৮	সুনানে আবু দাউদ	আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ
১৯	সুনানে আবু দাউদ	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
২০	সুনানে আবু দাউদ	বাইতুল আফকার, রিয়াদ, সৌদীআরব
২১	সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইবনি হযম, বৈরুত, লেবানন
২২	সুনানে আবু দাউদ	দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন
২৩	সুনানে নাসায়ী	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
২৪	সুনানে নাসায়ী	বাইতুল আফকার, রিয়াদ, সৌদীআরব
২৫	সুনানে ইবনে মাজাহ	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
২৬	সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
২৭	সুনানে ইবনে মাজাহ	বাইতুল আফকার, রিয়াদ, সৌদীআরব
২৮	মুআত্তা মুহাম্মাদ	আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী, পাকিস্তান
২৯	শরহু মাআনিল আসার	আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ

৩০	শরহু মাআনিল আসার	আলামুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন
৩১	কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
৩২	কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ	ইহইয়াউল মাআরিফিনুমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত
৩৩	মুস্তাখরাজু আবী আওয়ানা	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন
৩৪	মুসনাদুল ইমামিল আ'যম	আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী, পাকিস্তান
৩৫	মুসনাদে আহমাদ	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
৩৬	মুসনাদে আহমাদ	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন।
৩৭	মুসনাদে আবী ইয়ালা	দারুল মামুন, দামেশক, সিরিয়া
৩৮	মুসনাদে আবী ইয়ালা	দারুল সাকাফাতিল আরাবিয়া, বৈরুত, লেবানন
৩৯	মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ	মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, মিশর
৪০	সুনানে দারেমী	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৪১	সুনানে দারেমী	দারুল মুগনী, রিয়াদ, সৌদীআরব
৪২	সুনানে দারা কুতনী	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
৪৩	সুনানে দারা কুতনী	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৪৪	মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা	দারুল কিবলা, জেদা, সৌদীআরব
৪৫	মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক	আল মাজলিসুল ইলমী, ভারত
৪৬	মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক	আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন

৪৭	সুনানে কুবরা, বাইহাকী	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
৪৮	সুনানে কুবরা, বাইহাকী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
৪৯	মুসনাদে বাযযার	মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা, সৌদীআরব
৫০	মু'জামে কাবীর, তাবরানী	মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা, সৌদীআরব
৫১	মু'জামে কাবীর, তাবরানী	মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো, মিশর
৫২	মু'জামে আওসাত, তাবরানী	দারুল হারামাইন, কায়রো, মিশর
৫৩	আল আওসাত, ইবনে মুনযির	দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সৌদীআরব
৫৪	আল আওসাত, ইবনে মুনযির	দারুল ফালাহ, ফাইয়ুম, মিসর
৫৫	আল আদাবুল মুফরাদ	মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সৌদীআরব
৫৬	আদ দুআ	দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন
৫৭	মারাসীলে আবু দাউদ	দারুল কলম, বৈরুত, লেবানন
৫৮	জুযউ রাফইল ইয়াদাইন	দারু ইবনি হযম, বৈরুত, লেবানন
৫৯	ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা	দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, সৌদীআরব
৬০	জামেউল আহাদীস	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৬১	ইলাউস সুনান	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৬২	ইলাউস সুনান	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান

৬৩	আসারুস সুনান	আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী পাকিস্তান
৬৪	মাজমাউয যাওয়ায়েদ	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৬৫	বুলুগুল মারাম	দারুল আতা, রিয়াদ, সৌদী আরব
৬৬	সহীহ আবু দাউদ	মুআসসাসাতু গিরাস, কুয়েত
৬৭	সহীহ নাসায়ী	মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সৌদী আরব
৬৮	তাফসীরে ইবনে কাসীর	দারু তাইবা, রিয়াদ, সৌদী আরব
৬৯	তাফসীরে তাবারী	মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, মিশর
৭০	তাফসীরে তাবারী	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
৭১	তাফসীরে মাযহারী	যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ভারত
৭২	তাফসীরে রুহুল মা'আনী	আল মাকতাবাতুত তওফীকিয়া, কায়রো, মিশর
৭৩	ফাতহুল বারী	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন
৭৪	ফাতহুল বারী	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৭৫	উমদাতুল কারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
৭৬	উমদাতুল কারী	যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ভারত
৭৭	হাদইয়ুস সারী	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন
৭৮	ফাতহুল মুলহিম	মাকতাবাতু দারিল উলূম করাচী, পাকিস্তান
৭৯	বায়লুল মাজহুদ	দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন

৮০	তুহফাতুল আহওয়াযী	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
৮১	মাজারিফুস সুনান	এইচ, এম সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান
৮২	আত-তামহীদ	অযারাতু উম্মিল আওকাফ ওয়াশ গুউনিল ইসলামিয়া, মাগরিব
৮৩	নুখাবুল আখবার আলা শরহি মাআনিল আসার	অযারাতুল আওকাফ ওয়াশ গুউনিল ইসলামিয়া, কাতার
৮৪	আল জাওহারুল্লাকী মা'আল বাইহাকী	মাজলিসু দায়িরাতিল মাজারিফিনিয়ামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত
৮৫	আল মিরকাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত লেবানন
৮৬	আল ফাতহুল মুবীন বি- শরহিল আরবাইন	দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, সৌদীআরব
৮৭	নাইলুল আওতার	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
৮৮	নাইলুল আওতার	দারুল ইবনিল কাইয়িম, রিয়াদ, সৌদীআরব
৮৯	তানকীহত তাহকীক ফী আহাদীসিত তালীক	আযওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, সৌদীআরব
৯০	আত তালীক আলাল বাইহাকী	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
৯১	আত তালীক আলা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা	দারুল কিবলা, জেদ্দা, সৌদীআরব
৯২	আত তালীকুল হাসান আলা আসারিস সুনান	আল মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী, পাকিস্তান
৯৩	আত তালীক আলা দারা কুতনী	মু'আসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন

৯৪	আত তালীক আলা মুসনাদে আহমাদ	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
৯৫	আত তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুআত্তা মুহাম্মাদ	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
৯৬	আত তালীক আলা মুসনাদে আহমাদ	মু'আসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
৯৭	আত তালীক আলা নাসবির রায়া	ওয়াকফ ও ইসলাম বিভাগীয় মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব
৯৮	আত তালীক আলা ইলাইস সুনান	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান
৯৯	নাসবুর রায়া	মাকতাবাতু দারিল ইমান, সাহারানপুর, ভারত
১০০	নাসবুর রায়া	মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবানন
১০১	আদ দিরায়া	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন
১০২	আদিরায়া মাআল হিদায়া	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
১০৩	নাতাইজুল আফকার	দারু ইবনি কাসীর, দামেশক, সিরিয়া
১০৪	আত তারীফ ওয়াল ইখবার বিতাখরীজি আহাদীসিল ইখতিয়ার	উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, সৌদিআরব
১০৫	নাইলুল আওতার বিতাখরীজি আহাদীসি কিতাবিল আযকার	দারু ইবনি হযম, বৈরুত, লেবানন
১০৬	তালখীসে হাবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১০৭	মুখতাসারু খিলাফিয়াতিল বাইহাকী	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদিআরব

১০৮	আত তালখীস মাআল মুস্তাদরাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১০৯	ইলালু দারা কুতনী	দারু তাইবা, রিয়াদ, সৌদীআরব
১১০	আল কামেল ইবনে আদী	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
১১১	তাহযীবুল কামাল	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১১২	তাহযীবুত তাহযীব	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১১৩	তাকরীবুত তাহযীব	দারুল রশীদ, হালব, সিরিয়া
১১৪	মীযানুল ইতিদাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১১৫	তায়কিরাতুল হুফফায়	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১১৬	কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা	দারু ইবনি হযম, বৈরুত, লেবানন
১১৭	আল মাওয়ূআতুল কুবরা, মুল্লা আলী কারী	দারুল আমানা/ মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১১৮	কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১১৯	তানযীহুশ শারীয়াতিল মারফূআ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১২০	আল ফাওয়ায়িদুল মাজমূআ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২১	আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ	আযওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, সৌদীআরব
১২২	শরহ নুখবাতিল ফিকার	নাদিয়াতুল কুরআন লাইব্রেরী, ঢাকা, বাংলাদেশ
১২৩	যফরুল আমানী শরহ	মাকতাবাতু মাতবাআতিল

	মুখতাসারিল জরজানী	ইসলামিয়া
১২৪	আল কাশেফ	দারুল কিবলা, জেদা, সৌদীআরব
১২৫	যাদুল মাআদ	মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১২৬	আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১২৭	মাজমূআতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া	দারুল অফা, কায়রো, মিশর
১২৮	মাজমূআতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া	দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর
১২৯	আল মুহাল্লা	দারুল তুরাস, কায়রো, মিশর
১৩০	আল মুহাল্লা	ইদারাতুত তাবাআতিল মুনীরিয়া, কায়রো, মিসর
১৩১	মাসাইলু আহমাদ ওয়া ইসহাক	উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদীআরব
১৩২	শরহ মুখতাসারিত তাহাবী	দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৩৩	ফাতহুল কাদীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৩৪	ফাতহুল কাদীর	মাকতাবাতু যাকারিয়া, দেওবন্দ, ভারত
১৩৫	আল বিনায়া	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
১৩৬	আল বিনায়া	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
১৩৭	রদুল মুহতার	দারুল আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন

১৩৮	রদুল মুহতার	যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ভারত
১৩৯	বাদাইউস সানায়ে	মাকতাবাতু যাকারিয়া, দেওবন্দ ভারত
১৪০	বাদাইউস সানায়ে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৪১	আল বাহরুর রায়েক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৪২	আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া	মাকতাবাতু যাকারিয়া, দেওবন্দ ভারত
১৪৩	তাকরীরাতুর রাফেয়ী আলাশ শামী	যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ভারত
১৪৪	জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী	দারুল ইবনিল জাওয়া, দাম্মাম, সৌদীআরব
১৪৫	তুহফাতুত তালাবা ফী তাহকীকি মাসহির রাকাবা	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান
১৪৬	লিসানুল আরব	দারুল তাওফীকিয়া লিতুরাস, কায়রো, মিশর
১৪৭	আল মানজিদ	দারুল মাশরিক, বৈরুত, লেবানন
১৪৮	আর রুহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৫০	আর রাওয়ুল বাসিম	দারুল আলামিল ফাওয়ায়েদ, মক্কা, সৌদীআরব
১৫১	আদ দেওবন্দিয়া	দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, করাচী, পাকিস্তান
১৫২	আহলে হাদীস আওর ইংরেজ	লেখক : মাওলানা বশীর আহমাদ দা. বা.

১৫৩	ফিরকায়ে আহলে হাদীসে পাক ও হিন্দ	লেখক : মাওলানা ইলিয়াস গুসমান দা. বা.
১৫৪	মুকাদ্দামাতু নযীর আহমাদ	লেখক : নযীর আহমাদ কাশ্মীরী
১৫৬	আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ	লেখক : মুহাম্মাদ শাহ শাহজাহানপুরী
১৫৭	আল হায়াত বা'দাল মামাত	লেখক : মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী
১৫৮	অহদাতুল উম্মাহ	লেখক : মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক দা. বা.
১৫৯	তাম্বীহুয যাল্লীন	লেখক : মাওলানা আব্দুল খালেক
১৬০	তরজমানে ওহাবিয়্যাহ	লেখক : নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান
১৬১	উলামায়ে আহনাফ আওর তাহরীকে মুজাহিদ্দীন	আল-মাকতাবাতুল কামেলা

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

- ঐতিহাসিক প্রমানাদির আলোকে আহলে হাদীসের পরিচয় তুলে ধরা হল।
- হানাফী মাযহাবের আমল; বিশেষত নামাযের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অভিযোগ দালীলিকভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।
- দেড় শতাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সামনে রেখে পাঁচ বৎসরের লাগাতার পরিশ্রমে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।
- উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিনির্ভর গ্রন্থগুলোর পরিবর্তে মূল গ্রন্থ যাচাই করে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।
- সামান্য দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদে এ গ্রন্থে উল্লেখিত প্রায় সকল হাদীসই সহীহ ও হাসান তথা প্রমাণযোগ্য।
- নির্ভরযোগ্য স্বীকৃত ইমাম ও মুহাক্কিকদের সিদ্ধান্ত কিংবা সরাসরি 'দিরাসাতুল আসানীদ' এর মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেকটি হাদীসের মান তথা শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে।
- পক্ষের বা বিপক্ষের গবেষক উলামায়ে কিরামের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে তার পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয়েছে।
- সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি হাদীসে হরকত ও এর পাশাপাশি তার অনুবাদও সংযুক্ত করা হয়েছে।
- হাদীসভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনা-নুসারে তথ্যবহুল ফিকহী আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে।
- অশোভনীয় বাক্য, প্রমাণহীন ভুল ব্যাখ্যা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে সম্পূর্ণ ইনসাফ ও গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

